বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

একত্রিংশ খণ্ড	শীত সংখ্যা	পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

সম্পাদক
নূরুর রহমান খান

সহযোগী সম্পাদক
প্রদীপ কুমার রায়

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ
সম্পাদক	:	অধ্যাপক নূরুর রহমান খান
সদস্য	:	অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
		অধ্যাপক মাহফুজা খানম
		অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
		অধ্যাপক হাবিবা খাতুন
		অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
মুদ্রণ	:	ক্রিডেন্স প্রিন্টিং প্রেস ১৭, বিজয়নগর, ঢাকা

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal) edited by Professor Nurur Rahman Khan, published by the General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-7168940

Price : Tk. 200.00
US$ 10.00

সূচিপত্র

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ
শামীম আরা ১৫৯

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: অন্তেবাসী নারীর জীবনালেখ্য
তাশরিক-ই-হাবিব ১৮৩

সামাজিক জীবনে বৃহদ্ধর্মপুরাণের ভূমিকা
বিথীকা বণিক ২১৫

আবুল মনসুর আহমদের সংস্কৃতিচিন্তা ও বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য
মো: চেঙ্গীশ খান ২৪৩

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের *সুশীলার উপাখ্যান*-এ চিত্রিত উনিশ শতকের সমাজজীবন
জোবায়ের মোহাম্মদ ফারুক ২৭৩

ক্ষমতার দর্শন: রাসেলীয় ভাবনার মূল্যায়ন
সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার ২৯৩

বাংলাদেশের একটি গ্রাম: প্রসঙ্গ জাতিবর্ণ ব্যবস্থা
শিপ্রা সরকার ৩০৭

উচ্চশিক্ষায় নারীর অবস্থা ও অবস্থানের একটি বিশ্লেষণ: পরিপ্রেক্ষিত
ব্রিটিশ-ভারত ও বাংলাদেশ
আছমা বিন্‌তে ইকবাল ৩৪৫

সরকার ঘোড়াঘাটের তিন গম্বুজ মসজিদ: গঠনশৈলী ও উৎস পর্যালোচনা
এ টি এম রফিকুল ইসলাম ৩৬৯

লেখকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখক-কে/-দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধ বিষয়ক সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ১) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষতঃ বাংলার মুসলমানদের নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু ইউরোপীয় নামের ক্ষেত্রে প্রথমে পদবি ব্যবহার করা হবে।

৭. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই: *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা: *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূল পাঠে বিদেশী শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। বিদেশী শব্দ বাংলা বর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপনরীতি হবে বর্ণানুক্রমিক। গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে গ্রন্থপঞ্জিতে সকলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।

১০. প্রবন্ধের একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

শামীম আরা*

সারসংক্ষেপ

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জাতিসত্তা বিদ্বেষী আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন তাঁর কবিতায়। এ কারণে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের মহিমা ও মর্যাদাকে তিনি সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। বাঙালির অস্তিত্বের লড়াইয়ে '৭১-এর পঁচিশে মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে আপামর বাঙালি অস্ত্রহাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই দুঃসহ কালরাত্রির অভিজ্ঞতা ও আন্তরচেতনাকে জাগ্রত করেছেন কবি তাঁর কবিতায়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ-সমাজ-সমকাল এবং আন্তর্জাতিকতা স্থান পেয়েছে। তিনি মূলত রোমান্টিক কবি কিন্তু বাস্তবতার তিক্ততা কবিকে আকস্মিকভাবে সচকিত করেছে। ফলে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা স্মৃতিগুলোকে কবি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। কবির এই ধারার কবিতাগুলো কালের সাক্ষী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে লালন করে, তাই কবির কবিতার বাণী ও সুর গণচেতনার ডাক দেয়, মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে।

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের কবিতার ধারায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান একটি বিশিষ্ট নাম। পঞ্চাশের দশকে বাংলা কাব্যাঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব। তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাধনায় তিনি নির্মাণ করেছেন স্বকীয় এক কাব্যভুবন। রোমান্টিক চেতনাই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিপ্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রেমচেতনা, প্রকৃতিচেতনা, স্বদেশপ্রেম, সমাজ-সমকাল, আন্তর্জাতিকতা, মাতৃভাষাপ্রীতি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এ-সব বিষয় নিয়েই গড়ে উঠেছে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাব্যজগৎ। এ পর্যায়ে তাঁর ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা নিয়ে আলোচনার প্রচেষ্টা।

সৃষ্টিশীল লেখকদের অনেক বেশি করে নাড়া দিয়েছিল দুটি ঘটনা: একটি ভাষা আন্দোলন, অন্যটি মুক্তির সংগ্রাম। পাকিস্তানের জন্ম, ক্রমবিকাশ, পর্যায়-পরিণতির ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের সরকার বাংলাদেশে ইসলাম ও

---

* mnKvix Aa¨vcK, evsjv wefvM, RMbv_ wekwe`¨vjq, XvKv|

জাতীয় সংহতির পক্ষে কাজ করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের প্ররোচনা দিয়ে আসছিল। প্রথমদিকে অনেকেই সংহতি প্রকাশ করলেও ধীরে ধীরে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। খেতাব, সাহিত্য-পুরস্কার ও প্রেসিডেন্টের বিশেষ পুরস্কারের লোভ দেখানোও ছিল পাকিস্তান সরকারের কূট-কৌশলের অন্যতম উপায়। অর্থ ও সম্মানের লোভের পাশাপাশি জীবন ও জীবিকার তাগিদে অনেক কবি-সাহিত্যিক সরকারি প্রচেষ্টাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিছু বুদ্ধিজীবী উভয়কূল রক্ষা করে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাহিত্যিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জন্ম দিয়েছেন নতুন সংগঠনের, নতুন বিপ্লবী শক্তির, যাঁরা শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামই করেননি, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্য জীবন পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭-এ এবং পরিণতি ঘটে ১৯৫২ সালে। এই আন্দোলন ছিল মূলত অসাম্প্রদায়িক, ফলে ১৯৫২ সালের পরবর্তী বছরগুলো ছিল অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার উৎসারণের কাল। ছাত্র-সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমাগত অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার মাধ্যমেই এই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে থাকে। 'মুসলিম ছাত্রলীগ' এবং 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' ''মুসলিম'' শব্দটিকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মূলত সাম্প্রদায়িক শক্তিরই পরাজয় ঘটে। শাসক-শ্রেণি সমস্ত অপকৌশল অবলম্বন করেও ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক চেতনাকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি। বাংলাদেশের কবিতায় সংগ্রামী মানুষের সেই আর্তি বাণীবহ হয়েছে। বাংলা কবিতা প্রমাণ করেছে, তার মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা–বাংলা। ১৯৫২ সাল থেকে আজ অবধি একুশে ফেব্রুয়ারি এলে প্রকাশিত হয় অসংখ্য কবিতা। এসব কবিতায় ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে তেমনি বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজ-চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। সে-জন্যই ভাষা-আন্দোলন শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না। বাঙালি জনগণ ভাষা-আন্দোলনকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী চেতনা ভাষা-আন্দোলনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র ভাষা-আন্দোলনকে সব সময় ভয়ের চোখে দেখেছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং '৫২-র ভাষা-আন্দোলনের পর যখন এদেশে নতুন শিল্পী-সাহিত্যিক আবির্ভূত হলেন, তাঁরা খুব স্বাভাবিকভাবে জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুকান্ত এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কারণ, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেকালটা ছিল সংকটের। সে-ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল ভারতীয়

বই-পুঁথি ও তথ্য-উপাত্তের। আর এ কারণেই পাকিস্তানি সরকার ভারতীয় লেখকদের গ্রন্থ-চলচ্চিত্র আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে তারা নিষিদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু বাংলাদেশের কবিরা একাধিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং করেছেন এমন ভাষায় যা তুলনারহিত।

বাংলাদেশের কবিকুল ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তি-সংগ্রামের যথার্থ সৈনিক। বাঙালি জাতির মনন ও মানস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সূক্ষ্ম চেতনা-সমূহের দলিল তাঁদের কবিতা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের রাজনৈতিক আলোড়ন, সামাজিক দ্বন্দ্বমুখরতা, অর্থনৈতিক সংকট, বাঙালির স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ, উদ্ভূত শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্ত সমাজের সাম্যবাদী দর্শনে আস্থা ও তিরিশের কবিদের প্রভাব নিয়েই কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮ খ্রি.)। তাঁর সম্পর্কে একজন গবেষক মন্তব্য করেছেন:

> দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মূলত রোমান্টিক কবি। এই রোমান্টিকতার মর্মে প্রবিষ্ট হয়ে আছে সমকালীন অনুষঙ্গ। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের পর মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলার মানুষ। এই বোধই প্রাথমিক পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায়। তাঁর নিজেরই কবিতা অনুসারে 'এই স্বদেশের বাণী' তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে প্রত্যহ।[১]

ভাষা আন্দোলনের কবিতা

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ' একটি রূপক, প্রতীক ও ইঙ্গিতধর্মী কবিতা। ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে অনেকেই আবেগ ও উচ্ছ্বাসময় কবিতা লিখেছেন, কিন্তু মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান শুধু আবেগের বশবর্তী না হয়ে সমাজ-সমকাল চেতনাকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধারণ করেছেন। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো, এর বাণীবিন্যাস গীতধর্মী, বক্তব্যধর্মী নয়। একদিকে সুরময়গীত, অন্যদিকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরা— এই দুইয়ের সংমিশ্রণ 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ' কবিতাটি:

দৈনিক দারিদ্র্য ঠেলে আমরা যে গানে
হেসে উঠি, মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানে,
মায়ের যে গানে ফোটে দোলনার
কচিমুখের হাসি
যে সুরে কবিতা লিখি-
সেই গানে প্রেয়সী নারীকে ভালোবাসি
তারা ভালোবেসেছিল সে গানের
জন্মে জন্মে পরিচিত ভাষা।[২]

একদিকে যেমন বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক, গভীর একাত্মতাবোধ কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে লাল, রক্তিম নামগুলোকে বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রাম ও মুক্তির প্রতীকরূপে কবি উপলব্ধি করেছেন।

বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন:

> মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমাদের কবিতার আঙ্গিকে, প্রকরণে বলিষ্ঠ বক্তব্য ও বাণীবিন্যাসে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এ পরিবর্তন আরো এসেছে স্বকীয়তায়, স্বাতন্ত্র্যে, আত্মোপলব্ধিতে ও সাংস্কৃতিক আবহে। সর্বোপরি স্বরূপের সন্ধানে, উৎসের সন্ধানে ও শিকড়ের সন্ধানে। কবিতার দেহ ও আত্মায় এসেছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও তিস্তা এবং সুরমা-কুশিয়ারার এক ঐক্যতান। মানবিক চৈতন্য ও বিশ্বাসবোধ আমাদের মন ও মৃত্তিকাকে করেছে, অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনাসর্বস্ব।[৩]

যখনই আমাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে এবং জাতিসত্তা ও বাঙালিত্বের ওপর আঘাত আসবে তখনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের প্রেরণা দেবে যার ফলে কবিতা হয়ে উঠবে লক্ষ লক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র, কবিরা হবেন বীর, সৈনিক। ভাবতে অবাক লাগে, যারা অগণিত কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, তাদের আমরা ভুলতে বসেছি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর কবিতায় বার বার বলতে চেয়েছেন যে, একদিন তাদের বিচার হবে। তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন এই ভেবে যে, রক্তে লেখা চিহ্ন মুছে ফেলার মতো শক্তি-সাহস কেউ অর্জন করেনি। কালের সাক্ষী সেই রক্ত, লাখো শহীদের রক্তে বয়ে যাওয়া সেই স্রোতস্বিনী নদীর জল শুকোবার নয়। এ রক্ত সমগ্র বাঙালি জাতির, কবি সেই রক্তের কথা বলেছেন। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে বিশ্লেষকের মন্তব্য:

> মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মহান ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের কবিতা বিশেষত তাঁর দেশপ্রেমের কবিতাগুলোকে অন্য কোটি ও অন্য মাত্রায় মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ এ বিষয়ে তাঁর কবিতাগুলো আমাদের আবেগকে শুধু জাগ্রত করে না, উচ্ছ্বাসকেই শুধু উসকিয়ে দেয়না—আমাদের অন্তরের গভীর অনুভূতি ও চেতনাকে দেশ, মাটি ও মানুষের একাত্মতা ও ভালবাসায় সমুক্ত করে। এবং তাঁর প্রতিটি কবিতার বাণী ও আবেদন যেন আমাদের প্রজ্ঞা ও স্থিতধি চেতনাকে একটি আলোকিত প্রহরে উদ্ভাসিত করে। এ জন্যই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা শ্লোগান ও বক্তব্যধর্মী নয়—অন্তরের আবেদনে ভাস্বর।[৪]

বঙ্গীয় কবিদের মতো তাঁরও সূচনা হয়েছিল শৈশবে নিভৃতে। প্রথমে হাতে লেখা পত্রিকায় পরবর্তীকালে মাসিক পত্রিকায়। তের বছর বয়সে কবি লিখলেন 'এই আজাদী'। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের বাতাসে পরিবেশ ভারী হয়েছে। সর্বত্র বিরাজ করছে কবির নিজস্ব অভিব্যক্তি:

> এই সময়ে যশোর কলেজের একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় আমি একটি কবিতা পাঠাই। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির একটি শ্লোগান খুব জনপ্রিয় "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় লাখো ইনসান

ভূখা হ্যায়"। এই চিন্তা অবলম্বন করে কবিতাটি লিখি। কবিতাটির নাম ছিল 'এই আজাদী' আমার কবিতা স্কুল ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করে। ঐ প্রতিযোগিতায় কলেজ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন মোহাম্মদ শরীফ হোসেন। মোহাম্মদ আব্দুল হাই তখন যশোর এম. এম. কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি এই প্রতিযোগিতার একজন বিচারক ছিলেন। তিনি যশোরের খড়কীর পীর সাহেব মাওলানা আবুল খায়েরের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। পীর সাহেবের বড় ছেলে আবদুল হক তখন কমিউনিস্ট হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর প্রভাবে মোহাম্মদ শরীফ হোসেন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং আমাদেরকেও তাঁরা যথেষ্ট প্রভাবিত করতেন। এই কবিতা সেই প্রভাবেরই ফল। আমি তখন নজরুল ও সুকান্তের কবিতার অনুরক্ত পাঠক ছিলাম। এই কবিতাটিই আমার প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত কবিতা।[৫]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাব্য জীবনের সূচনায় কমিউনিস্ট পার্টির এই অক্ষয় বাণীই ফুটে উঠেছে। তাঁর বিশ্বাস ও আস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির একাত্মতা লক্ষ্য করা যায় তাই 'এই আজাদী' কবিতায়, তিনি কমিউনিস্টদের বিশ্বাসকেই নতুন সময়ের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করেছেন, যেমনটি করেছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম :

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটোভাত একটু নুন,
বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।[৬]

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভৌগোলিক স্বাধীনতা অপেক্ষা অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাধীনতা তখনকার কবিত্বের লক্ষ্য ছিল। '৫২-র ভাষা আন্দোলন ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে আছে দীর্ঘকালের সংগ্রাম ও সাধনার ইতিহাস। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাই ছিল এই দীর্ঘকালের সংগ্রামের লক্ষ্য। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়েও আমাদের চৈতন্যে আলোড়ন তুলেছে বিচিত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রবাহ। একটু একটু ঘটনা-দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা যাকে স্মৃতি-বিস্মৃতির আড়ালে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কবিরা কলম তুলে নিয়েছেন, লিখেছেন অভিজ্ঞতা থেকে, চেতনাবোধ থেকে। এ প্রসঙ্গে আমাদের এই সময়ের কবিতার কয়েকটি প্রধান প্রবণতা বিবেচনা করব। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থে হাসান হাফিজুর রহমানের "অমর একুশে"[৭] আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম কবিতা। সেই দিন 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ' 'এক ঝাঁক নাম' মুখর হয়ে উঠেছিল সেই শহীদদের স্মরণ করে, তাঁদের শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিল শত লক্ষ শহীদ বাঙালি:

বাংলাদেশে অবশেষে
অত্যাচারী শত্রু মরে।
প্রিয়জনের লাশের শপথ,
পোড়াঘরের ভিটের শপথ
অস্ত্রহাতে বাঙলীরা বাংলাদেশের
শত্রু রোখে।
বাংলাদেশের সবুজ পটে

সূর্য ওঠে
সহজে নয়
লক্ষ শহীদ ভাইয়ের গাঢ়
রক্তস্নানের দুরন্ত অন্তিমে।
(সহজে নয়, পৃ. ১৪৮)

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব কবিতা রচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে তা হলো, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশজ উত্তরাধিকারের প্রতি আস্থা, মানবতাবাদী জীবন-সংলগ্ন জীবনানুভূতি, আবহমান বাংলার ঐতিহ্য, স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ। এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো, ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*।[৮] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁরা হলেন- শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গনি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জামালুদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান। মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি" কবিতাটি *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে এই কবিতাটি একুশের চেতনার প্রথম কবিতা হিসেবে আলোচিত ও সমাদৃত। এই কবিতা চট্টগ্রামে রচিত হয়েছিল এবং প্রচারিত হয়েছিল। প্রচারের সাথে সাথে কবিতাটি তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনটিও। এদেশের মানুষ কেবল কাঁদতে জানে না, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিবাদ করতেও জানে, তাই কবি তাঁর কবিতায় স্পষ্ট জানিয়েছেন- 'আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।'[৯] মহান শহীদ দিবসে শোকাবহ ঘটনা, শহীদদের আত্মত্যাগকে জগত-খ্যাত মহাপুরুষদের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে তুলনা করে শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন:

কিন্তু শোনো, একফোঁটা রক্তও যেন পড়ে না মাটিতে,
কেননা আমার রক্তের কণায় কণায় উজ্জ্বল স্রোতের মতো
বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী রক্তের অভিজ্ঞান।
(একুশের কবিতা)[১০]

হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর কবিতায় উপলব্ধি করেছেন, সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সকলেই ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জাতির জন্য গৌরব ছিনিয়ে এনেছেন। এঁরা আমাদের অহঙ্কার। একুশের চেতনায় মানুষের মধ্যে যে জাগরণ ঝড় তুলেছে তা-ই

পরবর্তীকালে গভীর দেশপ্রেমে পরিণত হয়েছে। ভাষা শহীদদের জাতি স্মরণ করেছে গভীর মমতায়-শ্রদ্ধায়। কবি বলেছেন:

সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার- কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম;
এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ম ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে;
(একুশের কবিতা, পৃ. ৩৮)

ছেলে বাড়ি ফিরবে অধীর আগ্রহে মা প্রতীক্ষায় থাকে। অবশেষে ছেলের চিঠি পায়—ছেলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাকে লিখেছে, যারা আমার মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে চায় তাদের ধ্বংস না করে সে বাড়ি ফিরবে না। ছেলে বাড়ি ফেরে ঠিকই কিন্তু লাশ হয়ে, তবে ছেলে যে ভাষার অমর্যাদা করেনি তার প্রমাণ মেলে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র এই কবিতায়:

এখন,
মা'র চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের
(একুশের কবিতা, পৃ.৭৯)

পৃথিবীকে সবুজে ভরে দেবার জন্য বৈশাখের প্রচণ্ড তাণ্ডবের পর যেমন আষাঢ়ের নবীন মেঘ শীতল বাতাস নিয়ে আসে ঠিক তেমনি কবি সৈয়দ শামসুল হকের অভিব্যক্তি:

তপ্তশ্বাস হাহুতাশ পাতাঝরা বিদীর্ণ বৈশাখীর জ্বালাকর দিনের দিগন্তে
আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত কালো মেঘ আসবেই ঠিক।
(একুশের কবিতা, পৃ. ৩৭)

একুশের চেতনায় মিশে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দীপ্তিময় আশ্বাস। আবদুল গণি হাজারীর অভিব্যক্তি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য:

ফাল্গুনের রৌদ্রতপ্ত তৃষিত মাটিতে-
সে ঝড় কাঁপন তুলেছিল,
দিয়েছিল
কাজল মেঘের হাতছানি।
(একুশের কবিতা, পৃ. ২৩)

ভাষা শহীদের চিরস্মরণীয় করে রাখে শহীদ মিনার, তাই কবিতা লেখা হয় শহীদ মিনারকে নিয়েও। ভাষার লড়াইয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের জায়গাটিতে শহীদদের স্মরণে নির্মিত হয় স্মৃতিস্তম্ভ। প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি সরকার শহীদদের ঐ স্মৃতিস্তম্ভের ওপর আঘাত হানে, স্মৃতির মিনারটি চূর্ণবিচূর্ণ করে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়। আলাউদ্দীন আল-আজাদ শহীদ মিনার ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশবাসীকে অভয়বাণী শুনিয়ে উচ্চারণ করেন:

স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছ তোমরা? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো। যে ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে।[১১]

আবেগ আর চৈতন্যের আলোকে উন্নত শির, শহীদ মিনারের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন কবি জসীমউদ্‌দীন । কবি বলেছেন:

পাঁচটি স্তম্ভ তো নয়
পাঁচটি প্রদীপ্ত দণ্ড আকাশের পানে উঠি —
যুগ-যুগান্তরে যেন ঘোষে ফরিয়াদ।[১২]

একুশ আমাদের প্রাণের অহঙ্কার, একুশ আমাদের গর্বের। সুফিয়া কামালের কবিতায়১৩ সেই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। আহসান হাবীব প্রতীকের মাধ্যমে একই বাণী উচ্চারণ করেছেন:

আমাকে
কথারা লালন করে—
আমি তার পরিচর্যাভার
নিয়েছি এবং তার লালনেই থাকতে চাই সমর্পিত প্রাণ।
(একুশের কবিতা) [১৪]

১৯৫৮-র পরবর্তী সময়ে সামরিক সরকারের কালো থাবায় রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত হলে ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে নস্যাৎ করার পরিকল্পনা হয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে হতাশাগ্রস্ত রূপ ফুটে ওঠে। কবিদের মধ্যে কেউ কেউ হতাশায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন আবার কেউ কেউ হতাশা থেকে উত্তরণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কবি আল মাহমুদ লিখেছেন:

রক্তাক্ত ফুলের মত আমার সঙ্গীতজ্ঞ ভাইদের মুখাবয়ব
বাঙলা ... বাঙলা...
আমার নিদ্রিতা মায়ের নাম ইতস্তত উচ্চারিত হলো।
(একুশের কবিতা, পৃ. ৯৮)

একুশ শব্দটি বাঙালি জাতির কাছে অনন্য একটি শব্দ। নির্মলেন্দু গুণ তার কবিতায় অমর একুশকে ভিন্নমাত্রায় ঐশ্বর্যশালী করে উপস্থাপন করেছেন:

আটাশ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারি ধরে,
একদিন বাড়ে তার চতুর্থ বৎসরে।
এই সত্য পৃথিবীর অন্যসব দেশে,
অথচ এদেশে সবচেয়ে বড় মাস,
বড়দিন, ফেব্রুয়ারির অমর একুশে।[১৫]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় ভাষা আন্দোলন

বাঙালি জাতিকে সত্যিকার জাতিতে রূপ দেয়ার পটভূমিতে একুশের চেতনা তথা ভাষা আন্দোলনের চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা নতুনভাবে প্রাণ-সঞ্চার করে গেছেন, যে প্রাণ শুধু দেশপ্রেমের কথা বলে। তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের মানুষের মুখে হাসি ও গান, প্রাণের ভাষায় কথা বলা সবই যেন চিরস্থায়ী হয়। তাঁদের মনন ও চেতনায় মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা ছিল সমার্থক। শহীদেরাও ভালোবেসেছিলেন এ দেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতিকে। নিজবাসভূমে তারা পরবাসী হয়ে বাঁচতে চাননি। অধিকার অর্জনের জন্য তাঁরা আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত। তাঁরা বিস্মৃতির ইতিহাস নয়, তাঁরা অমর। ভাষা আন্দোলনে যে-সকল কবি উজ্জীবিত হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তাঁদের মহান আত্মত্যাগের চেতনাকে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর কাব্যে ধারণ করেছেন।

কবির উক্তি:

বিষণ্ন পিপাসা
নিয়ে তাই তাঁরা ছড়িয়েছে
কী দুরন্ত কৃষ্ণচূড়া মেঘ।
ঝড়ের আবেগ
তারা—জুড়ে আছে এ দেশের সমস্ত হৃদয়ে
তাই তারা বিস্মৃতির ইতিহাস নয়।।

(কৃষ্ণচূড়ার মেঘ, পৃ. ৪৭)

বাঙালি জাতির জন্য তাঁদের দান সত্যিই গর্বের কিন্তু ভাষার জন্য জীবন দিতে হয় এমন ইতিহাস গড়া একমাত্র বাঙালি জাতির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। তাই আশাবাদী কবিও শহীদদের স্মৃতি-তাড়িত হয়ে পড়েন। কবির উপলব্ধি:

একুশে ফেব্রুয়ারী এলে
স্মৃতিরিক্ত সব পুরোনো পাতা ঝরে যায়
এবং অকস্মাৎ বুকের গভীরে
তীক্ষ্ণ বেদনার সবুজাভা
সাড়া দেয়;

(একুশে ফেব্রুয়ারী এলে, পৃ. ১৪১)

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় বাঙালিরা মাতৃভাষার প্রাতিষ্ঠানিক ও সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠার জন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। ঐতিহ্যই দেশাত্মবোধের জন্ম দেয়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সেই স্মৃতিকে স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, কেননা স্বাধীনতাবিরোধী অদৃশ্য কালো হাতের ছোঁয়া স্বাধীনতাপরবর্তী সময় পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। ফলে, যে-কোনো সময়

তাদের প্রতিহত করার সময় আসতে পারে। তাই কবি সেই সময়ের কথা বলেছেন, যে-সময়টুকু থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করা যায়। কবির উপলব্ধি:

বাংলার কি শক্তি, বাংলা ভাষায়
কি যাদু, ইতিহাসের ধারায়
কত শত সহস্র কবি
মুগ্ধতায়, মমতায়, আবেগে, আনন্দে
সে কথা বলেছেন
সেই সব কবিতা গান শব্দ বর্ণমালা
চিত্রল বর্ণিল উন্মিল উন্নত সম্ভার,
তার তুল্য নয় কোনো কিছু:
যখন বাংলার বুকে দুঃশাসন পদভার কেঁপে ওঠে
রুদ্ধ করে দিতে চায় কণ্ঠময় সর্বজয়ী ভাষা
তখন সমস্ত দেশ কেমন দুর্জয় হয়
কেমন সংকল্পবদ্ধ ঋজু হয়-
কোনো উপমায়, কোনো তুলনায়
তাকে যায় না ধরা;
কেবল রক্তে রক্তে, শোণিত প্রবাহে ধ্বনিময়
তার দুর্মর আলোড়ন।

(কোনো কথায় কোনো গানে, পৃ. ১৪২)

শহীদ, ভাষা, বর্ণমালা, শহীদ মিনার, সবকিছুই আমাদের চেতনায় বৈচিত্র্যের মহিমাকে জাগ্রত করেছে, তাই একুশের কবিতায় বা ভাষা আন্দোলনের কবিতায় এসব অনুষঙ্গ এসেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এই ধারার কবিদের উদ্দেশ্য একই। উদ্দেশ্য শহীদের রক্তে অর্জিত আমাদের মুখের ভাষা যে বাংলা, এই আমাদের অহঙ্কার, যাকে মহামূল্যবান কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে অন্যত্র বলেছেন:

> একুশে ফেব্রুয়ারী চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন করে এবং চক্রান্তকারীকে ব্যর্থ করে। একুশে ফেব্রুয়ারীর মূলবাণী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই বাণী। জাতীয় জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অপরিহার্যতা একুশে ফেব্রুয়ারী-ই-অনিবার্য বুঝিয়ে দেয়।[১৬]

আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যে মৌল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই মৌল ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় চেতনা—একুশ তারই প্রতীক। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে আজ

আমাদের যে পরিচিতি, '৫২-র ভাষা আন্দোলন ছাড়া তা' লাভ করা সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল যে বাঙালিত্বের সাধনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, তাকে লালন করেছে এই একুশের চেতনা। কেননা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। ভাষাই এই জাতীয়তাবাদের মূল উপাদান। ধর্মীয় রাষ্ট্র–পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার পথে ভাষার দ্বারাই বাঙালি চিহ্নিত করেছে আপন পরিচয়।[১৭]

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সালাম-বরকত-রফিক-জব্বার প্রমুখ ছাত্র যুবার বুকের রক্ত বৃথা যায়নি। চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, আটান্নর সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র-আন্দোলন, চৌষট্টির নির্বাচন, পঁয়ষট্টির রেলশ্রমিক আন্দোলন, ছেষট্টির স্বায়ত্তশাসন তথা ৬ দফার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তে অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। কাজেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্যে যে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র সুপ্ত ছিল এবং একাত্তরের সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অভ্যুদয় বাঙালি জাতির জীবনে সেটি ছিল এক অসীম প্রেরণা। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের কবিগণ অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। কবিতায় উঠে এসেছে জাতীয় চেতনা, কখনও ব্যক্তিক অনুভূতি। আমরা এই ধারার কিছু কবিতা আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

আক্রান্ত স্বদেশের ছবি এঁকেছেন ফজল শাহাবুদ্দীন। একাত্তরের বাংলাদেশকে তিনি তুলনা করেছেন ভিয়েতনামের সঙ্গে, কেননা ক্ষতবিক্ষত ভিয়েতনামের চিত্র আর ১৯৭১-এর বাংলার চিত্র ছিল অভিন্ন।

কবি বলেছেন:

বাংলাদেশ আগুন লাগা শহর আর লক্ষ গ্রাম
বাংলাদেশ দুর্গময় ক্রুদ্ধ একটি ভিয়েতনাম।[১৮]

আক্রান্ত স্বদেশকে 'ক্যামোফ্লাজ' নিতে বলেন আল মাহমুদ:

প্রাণের ওপরে আজ লতা গুল্ম পত্রগুচ্ছ ধরে
তোমাকে বাঁচতে হবে হতভম্ব সন্ততি তোমার।[১৯]

"ব্লাক আউটের পূর্ণিমায়" শহীদ কাদরীর মনে হয়েছে বাংলাদেশের নিসর্গ আমাদের প্রতিরোধের সহায়:

ব্লাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বেলে দিলে
বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি
আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হয়ে নিজেদের ঘরে।[২০]

আসাদ চৌধুরী আঁকলেন পাকিস্তানি বর্বরতার চিত্র প্রবল ঘৃণায়:

দেশলাইর বাক্সের মত সহজে ভাঙে
গ্রন্থাগার, উপাসনালয়, ছাত্রাবাস,
মানুষের সাধ্যমত ঘরবাড়ি
সাত কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত ফুলকে সে বুটজুতোয় থেঁতলে দেয়।[২১]

রফিক আজাদ উচ্চারণ করেন "সৈনিকের শপথ প্যারেডে" অধিনায়কের বাণী:

ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে পুনর্বার বুঝে নিতে চাই।
অধিনায়কের কণ্ঠে উচ্চারিত গাঢ় শব্দাবলি।[২২]

এরপর মুস্তাফা আনোয়ারের *বৈশাখের রুদ্ধ জামা,*[২৩] নির্মলেন্দু গুণের *আগ্নেয়াস্ত্র,*[২৪] হুমায়ুন আজাদের *মুক্তিবাহিনীর জন্য,*[২৫] মুহম্মদ নুরুল হুদার *বাঙালির জন্মতিথি*[২৬] এবং মাহবুব সাদিকের *যুদ্ধভাসান*।[২৭] কতিপয় কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রবল স্মৃতি ও সংকল্প গাঁথা রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবেচনায় নানা মাপের কবিতা উপস্থাপিত হলো। তার মধ্যে দিয়ে যে মূল কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের সংকল্প ও সংগ্রামের প্রত্যক্ষ উচ্চারণে বেজে উঠেছিল সম্মিলিত প্রবল দামামা দুন্দুভি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতায়ও আমরা জাগরণের সুর খুঁজে পাই। এই চেতনাবোধ থেকেই তাঁর এ সকল কবিতার আবেদনে ছিল পরোক্ষভাবে স্বাধীনতাকামীদের হৃদয়াকূতি। কবির কবিতাগুলো যে সময়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবে তা বোঝা যায়। কবি বলেছেন:

> এখানে উল্লেখ করা সম্ভবত অসমীচীন হবে না যে, 'জর্নাল ১৯৭১' শিরোনামে তেইশ মার্চ; চব্বিশ মার্চ ও পঁচিশে মার্চ নামে আমি যে তিনটি কবিতা লিখেছিলাম প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সূচনার মুহূর্তে তার প্রথমটি চব্বিশে মার্চ ৭১ তারিখে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে আমি প্রচার করেছিলাম। তিনটি কবিতাই একসঙ্গে ও আলাদা আলাদাভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তীকালে বহুবার মুদ্রিত হয়।[২৮]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলোর বিচিত্র দিক আছে। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের যে আবেদন, বিশেষকরে মানুষের আকণ্ঠ চাওয়া-পাওয়ার স্থান-অবস্থান সম্পর্কিত দিক উন্মোচনই কবির অভীষ্ট। কবির অনুভবে ও উপলব্ধিতে সেই সুর শোনা যায় '*প্রতনু প্রত্যাশা*' কাব্যের "সদণ্ডী *উদ্ভেদ*" অংশের প্রায় প্রতিটি কবিতায়। 'স্বপ্নময় স্বদেশের' আকাঙ্ক্ষায় মুক্তিযুদ্ধ প্রাগবর্তী ও পরবর্তী সংকট নিয়েও বিচলিত ছিলেন কবি। এ পর্যায়ে প্রথম কবিতা "একুশে ফেব্রুয়ারী এলে" ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত। কবির ভাষায় 'এদিনে বাঙালির কণ্ঠচিরে/বেজে ওঠে আবহমান বাংলার গান।'

কবি সাধারণ মানুষের হয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ভাষার দাবি—তাই "কোনো কথায় বা কোনো গানে" কবিকণ্ঠ অত্যন্ত বলিষ্ঠ। কবি '৫২-এর উত্তাল মিছিলের দুর্বার তরঙ্গ কিংবা '৬৯-এর সেই তরুণ, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধা-মাতা, ভগ্নি, জায়ার, স্রোতধারার তুলনা খুঁজে পান। কবি এ দেশের মানুষের চাওয়া মুখের ভাষা বাংলাকে কবিতার ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, বলেছেন—মাতৃভাষা বাংলায় কী শক্তি, কী যাদু, কত সহস্র ভালোবাসায় কবি বিস্মিত। বাংলা ভাষার দাবি, ভাষার জন্য লড়াই, অবশেষে প্রাণদান সবই কবির কবিতার অমূল্য সম্পদ। কবি তাঁদের দানে মুগ্ধ হয়েছেন, মমতায়, আবেগে এবং আনন্দে সে কথাই বলেছেন। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে দেশবাসীর অসীম সাহসিকতা ও সংকল্পের কথা চিত্রিত করেন এভাবে:

যখন বাংলার বুকে দুঃশাসন পদভার কেঁপে ওঠে
রুদ্ধ করে দিতে চায় কণ্ঠময় সর্বজয়ী ভাষা
তখন সমস্ত দেশ কেমন দুর্জয় হয়
কেমন সংকল্পবদ্ধ ঋজু হয়—
কোনো উপমায়, কোনো তুলনায়
তাকে যায় না ধরা;
কেবল রক্তে রক্তে শোণিত প্রবাহে ধ্বনিময়
তার দুর্মর আলোড়ন।

(কোনো কথায় কোনো গানে, পৃ. ১৪২)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ

কবির একাত্তরের মার্চে লেখা পরপর তিনটি কবিতা। '৫২ এবং '৬৯-এর পরে আবার বুকের রক্তে বাংলার মাটি প্লাবিত, সকল সবুজে এখন ছোপ ছোপ লাল রক্ত, আর সেই সবুজের বক্ষদীর্ণ রক্তের গোলকে সোনার বাংলার মানস-ছবি মুহূর্তেই যেন পতাকা হয়ে দোলে সর্বত্র এবং—

জনতার হাতে হাতে
সাতকোটি বাঙালির বুকের শোণিতে আঁকা
উড্ডীন পতাকা।

(জর্নাল ১: তেইশে মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৪৩)

কবির আবেগাপ্লুত কণ্ঠ ধ্বনিত হয় এ ভাবে:

আর কত রক্ত নেবে বলো! সব রক্তধারা
এই বাংলার সবুজ পটে
বিপুল প্রগাঢ় এক লাল বৃত্ত
হয়ে যায়, হয়ে যাচ্ছে, যাবে;

(জর্নাল ১: তেইশে মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৪৩)

পরাধীন জাতির জন্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্বত্র, কেউ কোন ভয়ে ভীত নয়। শপথ করেছে যেন, রক্ত দিতে হলে রক্ত দেবে, খুনপিয়াসীর তৃষ্ণা নিবারিত না হলে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এদেশের মাটি-মানুষের অধিকার রক্ষা করবে। এমনই দীপ্ত শপথের কথা বলেছেন কবি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় জনতা জেগে ওঠে, ঘরে ঘরে চলে সংগ্রামের প্রস্তুতি। কবি দেখেছেন:

কোনোখানে কেউ বিমর্ষ নয় শোকে
মৃত্যুর ভয়ে বিচলিত কেউ নয়,
জনতার জয় সে কার সাধ্য রোখে
মৃত্যু পেরিয়ে হাসে মৃত্যুঞ্জয়।
(জর্নাল ২: চব্বিশে মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৪৪)

মৃত্যুকে জয় করার দুর্জয় প্রত্যাশা যাদের শোণিতে তারাতো ঘরে বসে থাকতে চায় না। মুক্তিপিয়াসী মন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হাসিমুখে। বাংলার তরুণেরা এ কথাই বলেছেন কবির কানে।

কবি আহ্বান জানিয়েছেন তাদের:

শেষ যুদ্ধের বন্ধুরা আজ শোনো,
শাণিত শপথ ঋজু হাতে নাও তুলে।
(জর্নাল ২: চব্বিশে মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৪৪)

কবি জানেন অন্ধকার দূর করতে হলে 'সূর্য প্রখর দীপ্তির প্রয়োজন', তাই প্রাণের দ্বারে মশাল জ্বেলে আলোকিত করেছেন যাত্রাপথ, যে যাত্রাপথে কোন বাধা না থাকে, কারফিউয়ের শব্দে মানুষের কোলাহল যেন বন্ধ হয়ে না যায়। চেতনার জাগরণে উদ্দীপ্ত বাঙালি সেদিন জয় করেছে কারফিউয়ের ভীতিকে। বাঙালিরা আর শাসকের থাবায় ভীত নয়, কবি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন শোষিত জনগণ আজ 'মুক্তি প্রতিম রক্তিম বৃত্ত'কে অর্জন করবেই।

কেননা—

আস্ফালকের পলাতক পদরেখা
বুকের শোণিতে করেছি সুচিহ্নিত,
কোথায় পালাবে মুছে সে রক্ত-লেখা
এবার যে তার বিনাশ সুনিশ্চিত।
(জর্নাল ৩: পঁচিশে মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৪৫)

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তা মোটেই স্নিগ্ধ , সুখী, কোমল ও রোমান্টিক নয়, তা প্রচণ্ড ক্রোধ ও তীব্র-তিক্ত ঘৃণার। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি, তার ভয়াবহতা এবং পরিণাম সম্পর্কে কবি সুনিশ্চিত বলেই মনে হয় কবিতাগুলো পড়ে। আর এ কারণেই কবিতার উচ্চারণ এতটাই বলিষ্ঠ যে

কবি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়েই সমগ্রজাতিকে একই আবেগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। কবি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন; তাদের হৃদয়ের কথা বলছেন। "ডগফাইট" কবিতায় রক্তপায়ী দস্যু হানাদারকে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় আক্রমণ করেছেন কবি। তাদের পৈশাচিক বর্বরতায় কীভাবে বাঙালির জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে তার নিখুঁত বাঙময় রূপ "ঘৃণা-*ক্রোধের বারুদ"* কবিতাটি। কবির ভাষায়:

মুহূর্তে সব ভস্ম হল:
দাদার যত দলিল এবং
দাদির যত মধুর স্মৃতি,
নকশী কাঁথা, তোরঙ্ভরা পুঁথি,
কোরান শরীফ;
পিতার যত পত্রাবলী, আলমারীতে
বাঁধানো বই: রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন
সুপ্রিয় শেক্সপীয়ার;
(ঘৃণা-ক্রোধের বারুদ, পৃ. ১৪৭)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মুক্তিযুদ্ধ-অনুপ্রাণিত অনেক কবিতায় আমরা একটা প্রত্যয়কে জোরালভাবে উচ্চারিত হতে দেখি। এদেশের মানুষ এখন ভয়হীন, দৃঢ়-সংকল্প, তারা জানে যে ন্যায় তাদের পক্ষে এবং অস্ত্র-সম্ভারের দিক থেকে শত্রু অধিক শক্তিশালী হলেও তার পরাজয় অনিবার্য। যে নৈতিকতা ও শ্রেয়োবোধ এদেশের মানুষের স্বপক্ষে, তার আবেদন অমূল্য, এজন্যই মায়ের শাড়ি, হাঁড়িকুড়ি, সাজানো সংসার, তোষক-বালিশ, মশারী, খাতা-কলম, টেবিল-চেয়ারসহ চালের বাতায় গোঁজা পুত্রের টেলিগ্রাম সবকিছু মিলিটারি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করেছে, তারপরও—

রক্তে এবং ভস্মে চাপা রইল শুধু
কী দুঃসহ ঘৃণা-ক্রোধের বারুদ।
(ঘৃণা-ক্রোধের বারুদ, পৃ. ১৪৭)

"সহজে নয়" কবিতায় কবির ঘৃণা এবং ক্রোধের প্রকাশ আরও তীব্র। আগুনে ঘর জ্বালানো, গ্রাম জ্বালানো খুবই সহজ। বুলেট ছুঁড়ে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, কৃষক, বণিক, দোকানী, ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মারা হানাদারদের জন্য খুবই সহজ কিন্তু মানুষ মরে যাবার পরও বধ্যভূমি সাক্ষী থাকে, লাশের স্মৃতি থাকে, স্বপ্ন ও বাণী থাকে। আর তাই —

প্রিয়জনের লাশের শপথ,
পোড়া ঘরের ভিটের শপথ,
অস্ত্র হাতে বাঙালীরা বাংলাদেশে
শত্রু রোখে।
(সহজে নয়, পৃ. ১৪৮)

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। "শহীদ স্মরণে" কবিতাটি কবির স্বদেশ চেতনার প্রগাঢ় উদাহরণ, প্রিয়জন হারানোর মর্মযন্ত্রণা ও আবেগ স্পর্শিত। কবির সহোদর আসাদ স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তবে এ কথা সত্য যে কবির আবেগ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ নয় বরং ব্যক্তিক অনুভূতি সর্বজনীন ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে। কবির ভাষ্য—

কবিতায় আর কি লিখব?
যখন বুকের রক্তে লিখেছি
একটি নাম
বাংলাদেশ।
(শহীদ স্মরণে, পৃ. ১৪৯)

তারপর একে একে তিনি দেশের তরুণ যোদ্ধাদের কথা বলেছেন, বলেছেন কনিষ্ঠ সহোদর আসাদের কথা, বৃদ্ধ পিতার কথা—যার শরীরে এখনো পশুদের প্রহারের চিহ্ন, বৃদ্ধা মাতার কথা—যার কণ্ঠে আর্তনাদ নেই, আছে অভিসম্পাত ও ঘৃণার আগুন। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে বাবার কথা বলেন এভাবে:

> আব্বা চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "আরো খবর আছে। খবরগুলো তোমার জানা দরকার। অক্টোবরের ২১ তারিখে মনিরামপুরে পুলের ওপরে যে ৬ জনকে বেয়োনেট চার্জ করে পাকসেনারা হত্যা করে নদীতে ফেলেছে, তার মধ্যে তোমার ছোট ভাই 'আসাদ' আছে।" আব্বা যেমন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সব কথা বললেন আমিও তেমনি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সব কথা শুনলাম।[২৯]

কবি আরও বলেন:

> এসব খবর আমার জন্য ছিল মর্মান্তিক। মামা বড় নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর কোলে পিঠেই আমি বড় হয়েছি। আর আসাদ—তার কথা ভাবি। সে যে মত আর যে বিশ্বাস নিয়েই যে পথে কাজ করে চলেছিল তা মানুষের মঙ্গল আর কল্যাণ সাধনের কথা ভেবেই যে সে করছিল এতে তো ভুল নেই। হিত সাধনের ইতিবাচক শক্তিই ছিল ওদের কর্মপ্রেরণা। সেই আসাদ—তার এভাবে মৃত্যু ঘটলো ২১শে অক্টোবর। কিভাবে বেঁচে আছেন আমার আব্বা-আম্মা?[৩০]

কবি কনিষ্ঠ সহোদর আসাদের মৃত্যুর সংবাদ যখন শোনেন তখনও বৃদ্ধ পিতার শরীরে প্রহারের চিহ্ন মুছে যায়নি, বৃদ্ধা মাতার আর্তনাদ হাহাকার করে, চিৎকার করে সমস্ত দেয়ালে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দেয়। তাকে বলা হয়নি তার ছেলে হাজার ছেলে হয়ে ফিরে এসেছে। এভাবেই কবি ব্যক্তিহৃদয়ের সঙ্গে কষ্ট-যন্ত্রণাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অস্তিত্বে। তাঁর হৃদয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত:

আমি কোন্ শহীদের স্মরণে লিখব?
বায়ান্ন ,বাষট্টি, ঊনসত্তর, একাত্তর;

বাংলার লক্ষ লক্ষ আসাদ মতিউর আজ
বুকের শোণিতে উর্বর করেছে এই
প্রগাঢ় শ্যামল।
(শহীদ স্মরণে, পৃ. ১৫০)

কবির কাছে এর চেয়ে 'প্রাণময় মহৎ কবিতা' আর কোথাও তিনি দেখেননি কেননা শহীদের রক্তে সাতকোটি বাঙালির আবেগ নতুন চেতনায় জেগে উঠেছে। বাংলার নগর বন্দরে বাষট্টি হাজার গ্রামের ধ্বংসস্তূপ থেকে যেন সাতকোটি ফুল ফোটে। কবির চেতনায় বাংলাদেশের এমন চিত্রই প্রস্ফুটিত হয়। ব্যক্তিক অনুভূতি রূপান্তরিত হয় জাতীয় আবেগে, প্রত্যয় ও বিশ্বাসে। "সূর্য-সারথী" কবিতায়ও আসাদ রক্তাক্ত পতাকা ও স্বাধীনতার স্বপ্নের মাঝে একাকার হয়ে যায়। কবি বলেন, আমার শেকড় কত দূর? এই দেশ, এই মাটির পরতে পরতে তার কত চিহ্ন, আমার আয়ুরেখায় মুক্তোর মত গাঁথা, তার একটা একটা করে ছিঁড়ে নিলে আমার প্রাণবায়ু যেন নিঃশেষ হয়ে আসে। আসাদও কি সূর্য সারথী? কবিতায় কবি বলেছেন:

খড়কীর খিড়কীর
খড়খড়ি খুলেছে
আসাদ গিয়েছে মনিরামপুর
আসাদের হাতে আছে
রক্তের পতাকা
সূর্যের স্বপ্নের দৃঢ় সুর।
(সূর্য-সারথী, পৃ. ১৫২)

"জীবন-তূর্য" কবিতায় আশাবাদী কবি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন:

সংহত কর আবেগ বন্ধু
দৃঢ় হাতে ধর বন্দুক
বাঙালীর আশা দুর্জয় হোক
ভাষাহীন হোক নিন্দুক।
(জীবন-তূর্য, পৃ. ১৫২)

কবির অকৃত্রিম আবেগ ও ভালোবাসায় সিক্ত "স্বীকৃতি" নামক কবিতাটি। স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় কবিচিত্ত 'অপরিশোধ্য ঋণে' আবদ্ধ। কবির দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এখানে একাকার হয়ে গেছে।

স্বদেশ আমায় স্বীকৃতি দিলে মমতায় স্নেহে
আকুল আবেগে গভীর করুণ
সজল সতর্কতায়।
(স্বীকৃতি, পৃ. ১৫৩)

পাকিস্তানি হানাদারদের শিকার হয়েছিল শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, জায়া-জননীসহ সর্বস্তরের মানুষ। হতবিহ্বল জাতি শেষ পর্যন্ত হারিয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। এ দেশের বুদ্ধিজীবী তথা জাতির ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, পথ-প্রদর্শকদের হারাতে হয়েছিল সেই রাতে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তখন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের বাসায়। হানাদার বাহিনীর লোকেরা যখন কবিকে খুঁজে ফিরছে, হত্যা করছে স্বজন, সুহৃদকে, আসাদসহ হাজার যুবককে, তখন কবির উচ্চারণ:

স্বদেশ আমায় রাখলে লুকিয়ে
তোমার পরম উষ্ণ আন্তরিকে;
(স্বীকৃতি, পৃ. ১৫৩)

কবির অনুজ আসাদ মুক্তি সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন। শুধু শহীদ হিসেবেই আমাদের হৃদয়ে আসাদের স্থান নয়; সে বিপ্লবের প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক। কবির অনুভূতি:

কবিতায় কি যায় বলা সব?
মনের কথা?
শব্দজালে যায় কি ধরা
চঞ্চলতা?
(কবিতায়, পৃ. ১৫৮)

যুদ্ধ কখনও শান্তি বয়ে আনেনা। আগ্নেয়াস্ত্র আর বারুদের গন্ধে ঝলসানো মাংসপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে মানুষ নামের পশুত্ব, কেননা যে মানুষ, মনুষ্যত্ব যার আছে, সে চায় ভালোবাসা। সে চায় না হাতের মুঠোয় রক্তিম গোলাপ পশুশক্তির প্রবল পেষণে দলিত হোক, যুদ্ধের মধ্যেও মানুষ চায় শান্তি, আকাশে উড়তে দেখতে চায় শান্তির শ্বেত পায়রা। আশাবাদী কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মুক্তিযুদ্ধের কবিতাগুলো পড়লে এমনটিই মনে হয়।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলো একদিকে মানুষকে স্বদেশের প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে অন্যদিকে প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়, আশ্রয় নয়, শুধুই যুদ্ধের ডাক দেয়। এ যুদ্ধে অকুতোভয় সৈনিকরা হটবে না, পিছপা হবে না, জয় তাদের সুনিশ্চিত। আর এজন্যই মনে হয় বাংলাদেশের গণজাগরণ এবং সংগ্রামের উত্তাপ সমগ্র বিশ্বকে চকিত করেছে। তাঁর কবিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শত শত সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে, নগর পুড়ে ভস্ম হবে, শুধু টিকে থাকবে সংগ্রামী জনতা আর জনতার আন্দোলন, মিছিল। তাঁর কবিতা আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দেয় এদেশের গণ আন্দোলনগুলোর চূড়ান্ত সার্থকতাকে। কবির আবেগ যেন জাতীয় চেতনা, কবির অভিব্যক্তি যেন সকল মানুষের প্রেরণা—

কৃষ্ণচূড়ায় ভয় কি রে তোর?
ভয় কি রে তোর কৃষ্ণচূড়ার লালে?
তবে কেন কোপ বসালি কৃষ্ণচূড়ার ডালে?
(জনৈক কৃষ্ণচূড়া-হন্তার প্রতি, পৃ. ১৮৭)

মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার। আমাদের চারপাশের যুদ্ধ, বিপ্লব, বিদ্রোহ, দারিদ্র্য, ধ্বংস, বন্যা, মহামারী, মড়ক, অবক্ষয়, খরা প্রভৃতি দ্বারা মানুষ মানসিক ও আত্মিক সংকটে নিমজ্জিত। যে-কোন শক্তি এ সময় বিপন্ন, কবি-সাহিত্যিকের চিত্তও সংকটে নিপতিত। কিন্তু মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সবকিছুকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন, তিনি মূলত উত্তরণের কবি। তাঁর কবিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোথাও তার পিছুটান নেই। সকলের কাছে তিনি পথের সন্ধান পৌঁছে দেন, সকলই হয়ে ওঠে প্রত্যয়ী, আশাবাদী; কারণ সামনে আছে অনন্ত সম্ভাবনা ও আলোকিত দিগন্ত। তিনি জীবন থেকে পলাতক নন বরং অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জীবনবাদী শিল্পী, জীবনশিল্পী ও জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পী। কবিতায় তিনি জীবনকে জানতে চান, জীবনের রহস্য উন্মোচন করতে চান। জীবনকে তিনি তন্নতন্ন করে পরিপূর্ণ জানতে চান। আমাদের জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে তিনি শিল্পরূপ দিয়েছেন। এবং জীবনের সমস্ত হতাশা ও বেদনা এবং ব্যর্থতা ও গ্লানিকে জয় করে সামনে এগিয়ে যাবার কবি তিনি। ব্যর্থতাকে স্পর্ধাভরে জয় করার মহানন্দ তাঁর কবিতার দেহ ও আত্মায় সম্পৃক্ত।[৩১]

পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের শহীদের অত্মদান কবিচিত্তকে বেদনাক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ করে তুলেছে; কিন্তু তার চেয়ে বেশি করেছে জীবনীশক্তিকে উদ্দীপ্ত। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

তরুণের মূর্খ রক্ত হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে এসে
ভেজায় কিছুটা জমি
অনাবাদী দেশে।
(ভস্মের সংকল্পে, পৃ. ৪৪)

অথবা,

তোমরা যে কথা বলো সেই স্বরে
তাদের প্রতিজ্ঞা মিশে আছে।
তোমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে
তোমাদের পদক্ষেপে প্রত্যেক বিশ্বাসে
তোমাদের স্নেহে প্রেমে আষাঢ়-আশ্বিনে
ভাই-বোন মায়েদের স্মরণীয় দিনে
অবিচ্ছিন্ন তাদের হৃদয়।
(কৃষ্ণচূড়ার মেঘ, পৃ. ৪৬)

আপন ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তিরিশ পরবর্তী বাংলা কবিতায় নিজের স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিরিশ পরবর্তী কবিরা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালকে ধারণ করেছেন তাঁদের কবিতায়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতায় স্বদেশ সংলগ্নতা লক্ষণীয়:

রৌদ্রে পথ হাঁটি মনে মনে। মেঘ বৃষ্টি বন্যার স্বদেশে
জেনেছি যে ব্যর্থ নয় রৌদ্রমুখী প্রহর বন্দনা। জানি মেশে
সূর্যের সোনার সুখ শরীরের রক্তে, তার প্রতিকণা
ছড়ায় গানের কলি—স্বপ্ন নয়, ফসল-বিলাসী আরাধনা-
মিলিত মন্ত্রের সুরে। এই অভিজ্ঞান
প্রত্যেক শ্রাবণে আনে একই বাণী : সূর্যের সন্তান
সব সূর্য হবে। তাই এই নক্ষত্রের আশ্চর্য আগুনে
তমিস্রার গান শুনে
এখন জ্বলবে জানি সকালের সোনালী হরিৎ।।

(নাম কবি, পৃ. ৩৫)

শহীদের প্রতি শ্রদ্ধায় কবি-হৃদয়ের আবেগ ও উপলব্ধির গভীরতা অনেক দূর পর্যন্ত প্রোথিত। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি, শহীদদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মহিমা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বাণীবহ হয়েছে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায়।

কবি বলেছেন:

তারা তো তোমার কথা
তারা তো আমার কথা
তোমাদের আমাদের সকলের হাসি
চেয়েছিল। এ দেশে প্রবাসী
নয়—তারা হতে চেয়েছিল
এ দেশেরই ঘাসের শিশির।

(কৃষ্ণচূড়ার মেঘ, পৃ. ৪৬)

এ-ভাবেই কবি ভাষা-শহীদদের অস্তিত্বকে প্রকৃতিতে সমর্পিত করেন। দেশের মাটি, ঘাস, শিশিরে ছড়িয়ে দেন বীরদের অস্তিত্বকে। কারণ তারা এদেশের ফুল, পাখি, প্রজাপতি, আকাশ, সবুজ-মাঠ, শস্যের ক্ষেত, ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া, আউল-বাউল, জারি-সারি সবকিছুকে ভালোবেসেছিল। ভালোবেসেছিল জীবনের প্রত্যেকটি ভালোলাগা মুহূর্তকে। কবির উপলব্ধি:

ক্লান্তির রাত্রিকে ঢাকো এ সূর্যের
প্রমত্ত আস্বাদে, সমুদ্রের

বিশাল গহ্বরে আনো
প্রজ্ঞার তরঙ্গ অবিশ্রাম
কৃষ্ণচূড়া মেঘে হোক মুখরিত
এক ঝাঁক নাম।
(কৃষ্ণচূড়ার মেঘ, পৃ. ৪৭)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সমাজ সচেতন কবি। তাই কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, কখনও শ্লেষে, কখনও প্রতিবাদে, কখনও সাহসী উচ্চারণে কবিকে সোচ্চার হতে দেখা যায়। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময় থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যে স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বিপ্লব তার মূলে ছিল একজন মহান ব্যক্তির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াতে কবি যে কবিতাটি লিখেছেন তার নাম "মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গবন্ধু"। মৃত্যু যে সবকিছুকে শেষ করে দিতে পারে না, কবি সে ভাবনাই ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায়।

কবির উপলব্ধি:

মৃত্যু কেবল জীবনেই সম্ভব
মৃত্যু জাগায় মৃত্যুজয়ের গান
ঝড়ে ভঙ্গুরে জনপটে এক
সাহসিক উদ্ভব
মুহূর্তে আনে জীবিতের সম্মান,
জীবনে সত্য মৃত্যুজয়ের গান।
(১৫ ই আগস্ট, ১৯৭৫)
(মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গবন্ধু, পৃ. ১৯২)

কবি স্বাধীনতার সুখ উপলব্ধি করেছেন কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন:

সবকিছু হিসেব নিকেশ করতে হবে,
ক্ষতি আর ক্ষতের; আদমশুমারিও।
আর যেন অতল গহ্বরে
পা ফসকে না যায়।
প্রতি মুহূর্তে ভাবতে হবে সমগ্রতার অঙ্ক,
দাঁড়াতে হবে বাঁকে,
আর স্থির যেতে হবে গন্তব্যে।
(স্থির গন্তব্যে, পৃ. ৩২৫)

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা যেন বিপথগামী না হয়। সঠিক গন্তব্যস্থান যেন খুঁজে পায় স্বাধীনতা ভোগকারী সকল মানুষ। বিদেশী সবকিছুকে যারা মূল্যবান মনে করে, দেশি বলে নিজের যা আছে তাকে অবহেলা করে, অবজ্ঞার চোখে দেখে, তাদের প্রতি কবির তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। কবি ব্যঙ্গভরে উচ্চারণ করেছেন:

দেশি মানেই সস্তা, এই যেমন বাংলা ভাষা;
ও সব চলবে না।
ইংরেজের গোলামের বংশধর
ইংরেজির গোলাম না হলে কি মানায়!

(হিসেব নিকেশ, পৃ. ৩২৬)

বিলেতের রানির সিলমারা চাটার্ড, আমেরিকান ডলারে কেনা সার্টিফায়েড এ্যাকাউন্ট্যাটের সই, বিলেতি হাই কমিশন, কমিশন এজেন্টের মুনাফা, পাকিস্তানি খানের বংশ-গৌরব, ইংরেজি ভাষা কোন কিছুকেই কবি নিজের দেশ, নিজের ভাষা ও ঐতিহ্যের চেয়ে মূল্যবান মনে করেননি। নিজের দেশ, জাতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার কবির কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে মূল্যবান।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মানুষকে ভালোবেসে, প্রকৃতিকে ভালোবেসে জীবনের একান্ত কাছে এসেছেন। অন্ধকারকে প্রতিহত করে আলোর পথে চলতে চেয়েছেন। এ কারণেই ব্যর্থতা, হতাশা কবিকে সাময়িক বিচলিত করলেও তা থেকে সহজেই কবির উত্তরণ ঘটেছে। তিনি জানতেন:

জীবন অবশ্য যায় মৃত্যুর অতলে,
সব সুর ভেসে যায় সময়ের স্রোতে,
নশ্বর শরীর তার পরিণতি জানে—
ফিরে যায় পুনরায় আদি ঠিকানায়।
… … … …
মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ বিনয়ে বিনত;
স্বার্থবন্দী ক্ষুদ্রতাকে মুক্ত হতে ডাকে,
প্রতি মুহূর্তেই তাকে দেখায় সংকেত,
আঁধার আড়াল ছিঁড়ে আলোর সভায়।

(আলোর সভায়, পৃ. ৩৪৫)

ভাষায়, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায় ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, প্রাজ্ঞ কবির অভিজ্ঞতাপুষ্ট উচ্চারণে প্রতিটি কবিতা হয়ে উঠেছে সহজ, সাবলীল ও বোধগম্য। সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

> মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে আমি প্রশংসা করব, তিনি নিজেকে একটি সহজতার মধ্যে টেনে এনে কবিতার ক্ষতি করেননি। তিনি সেই অর্থে 'জনপ্রিয়' নন যে অর্থে এখনকার অনেকেই 'জনপ্রিয়'। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের চেয়ে অনেক তরুণ কবি হঠাৎ আবির্ভূত কবি হঠাৎ

> 'জনপ্রিয়' হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই ধরনের 'জনপ্রিয়তা' কবিতা বিচারের লক্ষণ নয় এবং কোন মাপকাঠিও নয়। 'জনপ্রিয়তা' হচ্ছে কবিতার সাময়িকতা নির্ধারণের মাপকাঠি এবং পাঠকের চিত্ত থেকে এই তাৎক্ষণিক তরলতা যখন চলে যাবে, যখন সত্যিই বিবেচনা এবং বুদ্ধি আমাদের দেশে-সমাজে, কবিতার সমালোচনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হবে তখন এসব তরল কবিতা নিশ্চিহ্নে হারিয়ে যাবে। কিন্তু কবিতা—যে কবিতা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, নতুন পথে টেনে আনতে চায়, জিজ্ঞাসার সাহায্যে, কৌতূহলের সাহায্যে, কৌতুকের সাহায্যে সে কবিতাগুলোই টিকবে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা ঐ বিশিষ্ট গুণে গুণান্বিত। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লিখলেও তিনি কখনও কবিতার শিল্পকে উপেক্ষা করেন না। ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তাঁর কবিতাগুলো পড়লেই এ কথা বোঝা যাবে।[৩২]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতার বিষয়ে বৈচিত্র্য রয়েছে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও প্রেম, প্রকৃতি, নারী, স্বদেশ, সমাজ-সমকাল, সার্বজনীনতা, মানবিকতা, আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি বহু বিষয়ের সমন্বয়ে তাঁর কবিতা। তিনি নিজেই বলেছেন:

এক মাত্রিক কিছু নয়
স্বপ্নের অনেক মাত্রা
অস্তিত্বের বিপুল বিস্তার
স্মৃতি নানা মণিবর্ণে জ্বলে
সত্যের বিচিত্র পত্র
বহুমাত্রা জীবনের গানে।

(চতুর্মাত্রায় যাই, পৃ. ২০০)

শেষকথা

কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সুপরিচিত কিন্তু তাঁর কবিতার যথার্থ মূল্যায়ন এখনও অজানা রয়ে গেছে। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন 'আর কোনো আশা নেই কবি ছাড়া'। আর সেই আশা পূরণ করতেই সকল ব্যস্ততা সম্পন্ন করেছেন তিনি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পঞ্চাশের দশকের কবি হলেও তাঁর কবিতার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল তিরিশোত্তর আধুনিক কবি ও চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের কবিদের প্রভাব, তেমনি তাঁর কাব্যধারা পঞ্চাশ পরবর্তীকালেও ছিল অনুসরণীয়। সুতরাং অর্ধশতাব্দীব্যাপী লিখিত ও প্রকাশিত মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাব্যসম্ভার বিবিধ বিবেচনায় সহজেই স্বাতন্ত্র্য দাবি করে।

তথ্যনির্দেশ

১. মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা,* ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ২৪৪
২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কৃষ্ণচূড়ার মেঘ, *মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্য সংগ্রহ,* ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃ. ৪৭

৩. সফিউদ্দিন আহমদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের কবিতা, প্রণব চৌধুরী (সম্পা), *বাংলাদেশের সাহিত্যের আলোচনা-পর্যালোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ১২৯
৪. *পূবোক্ত,* পৃ. ১৩১
৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সূর্যের সুপ্রভাতে, *স্মৃতি যে অচঞ্চলা,* ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১৩
৬. আতাউর রহমান, *নজরুল কাব্য সমীক্ষা,* ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৪
৭. হাসান হাফিজুর রহমান, অমর একুশে, *বিমুখ প্রান্তর,* ঢাকা, ১৩৭০, পৃ. ৩৩
৮. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা,* ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪২
৯. মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, *কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি,* ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮-৩৯
১০.শামসুর রাহমান, *একুশে ফেব্রুয়ারী,* হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৯
১১. আলাউদ্দীন আল আজাদ, স্মৃতিস্তম্ভ, *মানচিত্র,* ঢাকা , ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭১-৭২
১২. জসীমউদ্‌দীন, *যারা জান দিল, কাফনের মিছিল,* ঢাকা , ১৯৮৮, পৃ. ১৫
১৩. সুফিয়া কামাল, একুশের কবিতা, *একুশের কবিতা,* ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩০
১৪. আহসান হাবীব, একুশের কবিতা, *একুশের কবিতা,* ঢাকা, ১৯৯২,পৃ. ৩০
১৫. নির্মলেন্দু গুণ, ফেব্রুয়ারী, *কাব্য সমগ্র (১),* ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪৬২
১৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অমর একুশে ফেব্রুয়ারী: একুশের চেতনা, *ভাষা আন্দোলন শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা,* ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১০
১৭. জুলফিকার মতিন, একুশের চেতনা, *লক্ষ্য যেথা স্থির,* ঢাকা, ১৯৯৬ পৃ. ৪০
১৮. ফজল শাহাবুদ্দীন, বাংলাদেশ একাত্তরে, *আততায়ী সূর্যাস্ত,* ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৩
১৯. আল মাহমুদ, ক্যামোফ্লাজ, *সোনালী কাবিন,* ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৬০
২০. শহীদ কাদরী, ব্লাকআউটের পূর্ণিমায়, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা,* আবুল হাসনাত সম্পাদিত, ঢাকা, জুলাই ২০১২, পৃ. ১০৪
২১. আসাদ চৌধুরী, বারবারা বিডলারকে, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪
২২. রফিক আজাদ, সৌন্দর্য-সৈনিকের শপথ প্যারেড, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
২৩. মুস্তাফা আনোয়ার, বৈশাখের রুদ্ধ জামা, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০
২৪. নির্মলেন্দু গুণ, আগ্নেয়াস্ত্র, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১
২৫. হুমায়ুন আজাদ, মুক্তিবাহিনীর জন্যে, *যতই গভীরে যাই মধু যতই ওপরে যাই নীল,* ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৮ (*শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৫)
২৬. মুহম্মদ নুরুল হুদা, বাঙালীর জন্মতিথি, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩
২৭. মাহবুব সাদিক, যুদ্ধভাসান, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২
২৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা,* আই.বি.এস. জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০০: ১, পৃ. ২৩
২৯. সহজে নয়, *স্মৃতি যে অচঞ্চলা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
৩১. সফিউদ্দিন আহমদ, 'তাঁর কবিমানস, ড. মোহাম্মদ হাননান সম্পাদিত, *মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কবি ও কোবিদ,* ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৪৬
৩২. সৈয়দ আলী আহসান, *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে,* ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ১৪৩

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অন্তেবাসী নারীর জীবনালেখ্য

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক ছোটগল্পে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থানরত নারীর বিচিত্র জীবনালেখ্য নিখুঁতভাবে রূপায়িত। পুরুষনিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষীয় সমাজে বহুকাল ধরেই নারীর অবস্থান প্রান্তিক। তিনি এ সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রান্তিক নারীদের যে জীবনভাষ্য নির্মাণ করেছেন, সেখানে রয়েছে বালিকা, তরুণী, যুবতী, গৃহবধূ, বৃদ্ধা, বিধবা নারী এবং পতিতা। ব্যক্তিগত পরিচিতি, জীবনাভিজ্ঞতা ও সমকালীন বাস্তব প্রতিবেশের সম্মিলনে তাদের জীবনের নিজস্ব আখ্যান বয়ানে লেখকের পারদর্শিতা ও শিল্পবোধ অতুলনীয়। আর্থিক অনটন, পারিবারিক অবস্থান, সামাজিক প্রতিকূলতা ও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগহীনতা তাদের জীবনকে পুনঃপুনঃ করেছে বিপর্যস্ত, সংকটাপন্ন। ভারতীয় বর্ণহিন্দু সমাজে যেহেতু আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই বালিকাকে পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর সংসারে যেতে হত, তাই বিভূতিভূষণের প্রায় সকল গল্পেই বিবাহিতা নারীর জীবনসংগ্রাম ও সাংসারিক চালচিত্র রূপায়িত। স্ত্রী হিসেবে ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ প্রাপ্তির অসম্ভাব্যতা, একান্নবর্তী পরিবারে স্বামীসহ অন্যদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা, নিম্নবিত্তের সংসারে অভাব-অনটন মোচনের জন্য বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা–এসবই তার জীবনবাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। স্বামী, সন্তান ও সংসারের ক্ষুদ্র বলয়েই আজীবন অতিবাহিত করতে আগ্রহী নারীর ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটুকুও প্রায়শই অধরা থেকে যায় পুরুষতন্ত্রের স্বার্থসর্বস্ব বিভিন্ন বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলগত অবরুদ্ধতায়। এ প্রবন্ধভুক্ত গল্পসমূহে বিশ্লেষিত হয়েছে পরিবার ও সমাজে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত নারীদের বিপন্নতা ও অস্তিত্বসংকট, তাদের প্রতি পুরুষতন্ত্রের অপরতাবোধ, নারীত্বের সম্ভ্রম বজায় রাখতে সচেষ্ট তার অকপট মনোভঙ্গি, সর্বোপরি সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মুখরিত জীবনকে উপভোগের একান্ত মানবিক আকূতি।

মানবদরদী, উদার ও সংবেদনশীল কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) সাহিত্যকর্মে ভারতীয় সমাজভুক্ত নারীদের চালচিত্র বিশ শতকের প্রথমার্ধের পরিসরে অসামান্য শিল্পরূপে উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রীয় আধার ছিল নিঃসন্দেহে বাংলার গ্রামীণ জীবন। আবহমানকাল থেকেই এতদঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত পুরুষতন্ত্রের একচ্ছত্র দাপট, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজকাঠামো ও ভূমিনির্ভর উৎপাদনব্যবস্থা, কৃষি ও কারিগর-হস্তশিল্পীদের প্রবর্তিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, সনাতন ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদ, কৌলীন্যপ্রথার উদ্ভব, শিক্ষাহীনতা এবং গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে

* mnKvix Aa¨vcK, evsjv wefvM, XvKv wekwe`¨vjq|

বিচরণের বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক অনুষঙ্গের পরিণতিতে নারীরা প্রান্তিক অবস্থানে বিচ্যুত হয়েছিল। বিভূতিভূষণ নিজেই এ রূঢ় ও অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কেননা নিজের বেড়ে ওঠার পারিবারিক পরিমণ্ডল, পারিপার্শ্বিক সমাজ-বাস্তবতা ও জীবনাভিজ্ঞতার মিথষ্ক্রিয়া তাঁকে উপর্যুক্ত ধারণা পোষণে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে। ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি সাংস্কৃতিক পরিসরেও নারীর ওপর পুরুষের অহমবোধ প্রতিষ্ঠিত ও যুগ-যুগব্যাপী কার্যকর থাকে শ্রেষ্ঠত্বের ঝাণ্ডা উত্তোলনের মাধ্যমে। যখন থেকে সমাজে পুরুষতন্ত্রের দাপট বিস্তৃত হয়েছে, সেই ক্রান্তিলগ্নেই বহির্জগতের বহুধাবিস্তৃত পরিসর থেকে পুরুষের নিষ্ঠুরতায় নারীর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ও মানবসুলভ পরিচিতি ক্রমশই অবলুপ্ত হয়েছে। তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে গৃহের সংকীর্ণ পরিসর, গার্হস্থ্যকর্মের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হওয়ার বিকল্পহীন বাধ্যবাধকতা। উচ্চবর্গের সঙ্গে প্রতিতুলনায় সমাজের শ্রমজীবী-শ্রেণি সর্বদাই প্রান্তজন হিসেবে চিহ্নিত। অতঃপর এরই অন্তর্গত নারী — যাকে পরিবার ও সমাজের বিবিধ অনুশাসন, রীতি-নীতির পীড়নে সর্বদাই জর্জরিত হতে হয় এবং একপর্যায়ে যে বিস্মৃত হতে বাধ্য হয় তার নারীসুলভ একান্ত সাধ-আহ্লাদ, নিজের অন্তর্গত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করার আকাঙ্ক্ষা; স্বাভাবিক বিবেচনায় সেই নারী অবশ্যই 'অন্তেবাসী' হিসেবে অবনমিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু ছোটগল্পে প্রান্তবাসী হিসেবে নারীজীবনের করুণ ও বঞ্চনাকর পরিণতি ভাষ্যরূপ পেয়েছে।

'উমারানী' (*মেঘমল্লার,* ১৯৩১) গল্পে[১] দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রী হিসেবে স্বামী ও পরিবারের প্রতি পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ সত্ত্বেও দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর প্রতিকূল মনোভঙ্গির পীড়নে এক অসহায় গৃহবধূর সম্ভাবনাহীনতা ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুর দিকে অগ্রযাত্রার করুণ বৃত্তান্ত অসামান্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব ইচ্ছা, চিন্তাকে সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা যে অলীক কল্পনামাত্র, তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে এ গল্পের উমারানীর মত বিপন্ন নারীর মাধ্যমে। যেহেতু ভারতবর্ষীয় সমাজে পুরুষই নারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সে-কারণেই তার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নারীর বাধ্যগত নীরবতাই তার অস্তিত্বসংকটের মুখ্য অবলম্বন হয়ে ওঠে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার গ্রামজীবনের সামাজিক বাস্তবতার অকৃত্রিম রূপটিও এ গল্পে বিভূতিভূষণের সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টিতে বিধৃত। গল্পকথক ডাক্তারের ছোট বোন শৈলের মৃত্যুর পর তার স্বামী সুরেন পুনরায় উমারানী নামের চৌদ্দ-পনেরো বছরের মাতৃহীনা এক তরুণীকে বিয়ে করে। ভাইবোনহীন উমারানী শৈশব থেকেই পশ্চিমের শহরে বাবার আশ্রয়ে প্রতিপালিত। কমিসারিয়েটে চাকুরিরত উমারানীর পিতার আর্থিক সঙ্গতি সম্ভবত তেমন সচ্ছল নয়। সে-কারণে স্বামী সুরেনই ছিল সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। গল্পকথকের সঙ্গে উমারানীর পরিচয় ঘটে সুরেনের ছোট বোন টুনির মাধ্যমে। কোলকাতায় তাদের বাড়িতে উপস্থিত গল্পকথকের সঙ্গে উমারানীর প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি — 'মেয়েটি আধ-ঘোমটা অবস্থায় গলার আঁচল

দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করছে। দিব্যি মেয়েটি তো! রং খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখখানির গড়ন। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া ঠাস-বুনানি কালো চুল মাথা ভর্তি' (১ ॥ ৩০)। অতি দ্রুতই ভাইবোনের সান্নিধ্যবঞ্চিত উমারানী গল্পকথককে বড় ভাইয়ের আসনে অধিষ্ঠিত করে পারস্পরিক সম্পর্কগত আন্তরিকতা ও হার্দ্যিক আবেদনের মাধুর্যে। স্বভাবসুলভ নম্রতা, শ্রদ্ধা, বিনয় ও আন্তরিকতার সম্মিলনে গল্পকথকের মৃত বোন শৈলের সঙ্গে উমারানীও একাসনে স্থান করে নেয়। বিয়ের পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীগৃহে আসলেও পিতাকে একবার দেখার জন্য তার মনটি অস্থির হয়ে ওঠে। অথচ সুরেনের চাকরিগত ব্যস্ততার জন্য তার পক্ষে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সুযোগ ঘটে না। উমারানী তার পিতার নিকট থেকে চিঠি পেয়েছিল যে তার বাবা দুর্গাপূজার একাদশীর দিন এসে তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোনো কারণে তার পিতার আর আসা হয়ে ওঠেনি। প্রায় সাত-আট বছরের ব্যবধানে গল্পকথক পুনরায় কোলকাতা যাওয়ার একপর্যায়ে অবহিত হয়, সুরেন চাকরির কারণে অন্যত্র রয়েছে। তাদের পৈতৃক ভিটা চাঁপাপুকুরের অজ পাড়াগাঁয় বৃদ্ধা পিসিশাশুড়ির সঙ্গে উমারানী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে। দুর্গাপূজার সময় তার পিতার কোলকাতায় আসার কথা থাকলেও এর একমাসের ব্যবধানে কলেরায় তার মৃত্যু ঘটে। অথচ যে বিয়ের জন্য উমারানী নীরবে মুখ বুঁজে সব ত্যাগ স্বীকার করে চলে, কখনো স্ত্রী হিসেবে প্রাপ্য অধিকার দাবি করেনি, তাকেই চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় সুরেনের জন্য। প্রথম স্ত্রী শৈলর সঙ্গে দাম্পত্যসম্পর্কের একপর্যায়ে তার মৃত্যু ঘটায় শিক্ষিত, সচেতন, চাকরিজীবী, সুস্থ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যুবক হিসেবেই সে উমারানীকে বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল। অথচ পরবর্তীকালে উমারানীর পিতার মৃত্যু ঘটলে তার আচরণে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাই সে নিকটজনদের জানায়, 'জোর করে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিয়ে করার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না'। (১ ॥ ৩৫)। এভাবেই স্ত্রীর প্রতি তার আচরণে প্রকটিত হয় দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতির প্রচেষ্টা ও সচেতনভাবেই উমারানীকে অস্বীকারের প্রবণতা। টুনির মাধ্যমে গল্পকথক অবগত হয়:

> দাদা তার (উমারানী) সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তিনি সেই যেখানে চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন, বৌদি থাকেন চাঁপাপুকুরের বাড়িতে পড়ে, দাদা চিঠিপত্রও দেন না। বৌদি বড় শান্ত, বড় চাপা মেয়ে, সে মুখ ফুটে কখনো কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। মেয়েমানুষেরও কষ্ট যে কি, সে আপনি বুঝবেন না দাদা। যতদিন মা ছিলেন, বৌদিকে কষ্ট জানতে দেননি, তা তিনিও আজ দু-বছর মারা গিয়েছেন। বাড়িতে আছে শুধু পিসিমা।' (১ ॥ ৩৫)

অসহায় এক বৃদ্ধা ও যুবতী স্ত্রী — এ দুই নারীর প্রতি সুরেনের কোনো দায়িত্ববোধ বা আন্তরিক সহানুভূতি আদৌ ব্যক্ত হয়নি। নিছক খাজনা আদায়ের জন্য এক-দুই রাত গ্রামে অবস্থানের প্রয়োজনে সে বছরে দু'বার পৈতৃক ভিটায় যায়। অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি তার কোনো আগ্রহ, দায়িত্ববোধ বা ভালোবাসার বন্ধন নেই। উমারানী এ সংসারে বারবার প্রাপ্য অধিকার, স্নেহ, ভালোবাসার দাবি ও মমতার বন্ধন থেকে প্রবঞ্চিত হয়েছে। নিঃসঙ্গ জীবনে তার ভালো-মন্দের খোঁজ নেয়ার বা কুশল বিনিময়ের সৌজন্যটুকুও সে কারো কাছে

পায়নি। তাই গল্পকথক তার মৃত বোন শৈলের স্থানে উমারানীকে অন্তরে অভিষিক্ত করেই ব্যথিত হৃদয়ের শোকানল প্রশমিত করতে সচেষ্ট হয়।

সুদীর্ঘ আট বছরের ব্যবধানে উমারানীর সঙ্গে সাক্ষাতের অবকাশ ঘটলে গল্পকথক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এই নারীর লাঞ্ছিত ও বিড়াম্বিত জীবনের পূর্বাভাস—

> তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, ঘোমটার পাশ দিয়ে চুলগুলো অসংযতভাবে কানের পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর পড়েছে, পরনে আধ-ময়লা শাড়ি, চেহারা রোগা রোগা একহারা। এই সেই-ই উমারানী। তাকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হল সে আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। (১ ॥ ৩৭-৩৮)।

নিঃসঙ্গ জীবনে উমারানীর বিপন্নতা প্রকটিত হয় যক্ষ্মার মত ব্যাধির সংক্রমণে। অথচ এর প্রতিকারের সামর্থ্য তার নেই। উমারানীর মনোভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আজীবন বিভিন্নভাবে নিপীড়িত হওয়ার বিষয়টিকে সে নিয়তির লেখন, অদৃষ্ট, কপাল বা দৈব নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছে। নিয়তি অখণ্ডনীয় — এরূপ ধারণাকে রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধিপতিরা সুকৌশলে নারীর ওপর আরোপের মাধ্যমে তাদের অধীন রাখতে বরাবরই সচেষ্ট। এরই নির্মম পরিণতিতে উমারানীর মত গৃহবধূর অসহায়ত্বের অবলম্বন হয়ে ওঠে নিছক চোখের জল ও পরজন্মে ভালো কিছুর প্রত্যাশা। কিন্তু বর্তমানের দুঃসহ পরিস্থিতিকে মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে তার নেই কোনো গত্যন্তর। প্রায় আট মাস আগে একদিনের জন্য তার স্বামী এসেছিল, তা-ও বৈষয়িক বন্দোবস্তের প্রয়োজনে। প্রায় অশিক্ষিত এবং নিজের অধিকারের প্রতি অসচেতন উমারানীর পক্ষে স্বামীর নিকট এ দাবি নিছকই অলীক কল্পনা যে, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কর্মস্থলে তারই সঙ্গে সে সহাবস্থান করবে এবং সেই ব্যবস্থা সুরেনকেই করতে হবে। যে প্রতিবেশে শৈশবকাল থেকে উমারানী প্রতিপালিত হয়েছে, সেখানে স্বামীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং স্ত্রীর পক্ষে তার বিরুদ্ধাচরণ নিষিদ্ধ। এরই নির্মম পরিণতি হল উমারানীর স্বামী-সন্তানহীন প্রবঞ্চিত নিঃসঙ্গ জীবন, যেখানে তার নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্যের পীড়ন ও কঠিন ব্যাধির প্রকোপ। গল্পকথকের সঙ্গে আলাপকালে তার সংলাপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে — সে তার ব্যাধিকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে এবং এর প্রতিকারের কোনো উদ্যোগ, এমনকি ভাবনাটুকুও তার চেতনালোকে অনুপস্থিত। হয়ত অবমানিত জীবনের দ্রত অবসান তার অভীপ্সিত ছিল বলেই অসুখের প্রসঙ্গে সে সর্বদা নীরব থাকত। মুখে কিছুই প্রকাশ না করলেও স্বামীর প্রতি উমারানীর প্রগাঢ় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সুরেনের লিখিত চিঠিগুলোকে পরম মমতায় গচ্ছিত রাখার প্রচেষ্টায়। পাঁচ-ছয় বছরের পুরাতন সেই চিঠিগুলোই উমারানীর দাম্পত্য জীবনের প্রথমদিকের মধুর স্মৃতিচারণের একমাত্র অবলম্বন এবং তার ব্যথিত হৃদয়ে প্রেমের প্রতীকরূপে সিঞ্চিত পুষ্পাঞ্জলি। সে-কারণেই গল্পকথক কথাপ্রসঙ্গে সুরেনের চাপাপুকুরে আগমন ও কর্মস্থল হতে চিঠি প্রদান প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় উমারানীর অশ্রুসিক্ত নীরবতায় মূর্ত হয় তার বেদনাবিধুর রূপটি। বছরখানেকের ব্যবধানে সুরেনের এক পত্রের মাধ্যমে গল্পকথক তার মৃত্যু সম্পর্কে

অবগত হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও অসুস্থতার ঘোরে সে সুরেনের লিখিত চিঠিগুলোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। সেগুলোই ছিল তার জীবনের শেষ অবলম্বন, যা সে মৃত্যুলগ্নেও সঙ্গে রাখতে চেয়েছিল। উমারানীর তেইশ বছরের জীবনে যতি টেনে দিয়েছিল যক্ষ্মা। কিন্তু তার অন্তর্লোকে সাধারণ বাঙালি গৃহবধূর আজন্মলালিত অভিলাষ অর্থাৎ স্বামী, সন্তানকে নিয়ে নিজের গড়ে তোলা সংসারে জীবন নির্বাহ করার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যায়। প্রাপ্য অধিকারবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে নয়, নিছক বিয়ে নামক সামাজিক রীতি মেনে নেয়ার একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই সুরেনকে উমারানী মনপ্রাণ উজাড় করা ভালোবাসায় সিক্ত করতে চেয়েছিল, প্রত্যাশা করেছিল স্বামীর পূর্ণ অভিনিবেশ, আন্তরিকতা ও দাম্পত্যসুখ। কিন্তু তার প্রতি সুরেনের বিবেচনাশূন্য ও অনুরাগহীন মনোভঙ্গির উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশেই উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কে সংগুপ্ত অপরতাবোধের প্রভাব উপলব্ধ। পারিবারিক প্রতিকূলতা ও সামাজিক মর্যাদাহীনতা উমারানীকে কোলকাতা থেকে বহুদূরবর্তী নির্জন গ্রামের বাসিন্দায় অবনমিত করে এবং প্রকৃতঅর্থে এটি সমাজ-সংসার থেকে তার পলায়নপরতারই নামান্তর; যদিও এ পরিণতি কখনোই তার কাম্য ছিল না। জীবনের অপার সম্ভাবনার বাস্তবায়নের পরিবর্তে মাত্র তেইশ বছরেই চিকিৎসাহীনতা ও স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার নির্মমতাই সংস্কারবদ্ধ সমাজে তার মত প্রান্তিক নারীর অন্তিম পরিণতি; যার বাস্তবায়নে সুরেনের মত দায়িত্বজ্ঞানহীন পুরুষদের নির্মম মানসিকতাই দায়ী। এ গল্প সম্পর্কে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত —

> একটি মৃত্যু পেরিয়ে আর-একটি জীবনের প্রতিষ্ঠা হয় : শৈল ধারাবাহিক উমারানীতে, যদিও এ মেয়েটি অজানা-অচেনা। এভাবেই বিভূতিভূষণের বীক্ষায় জীবন প্রবাহিত হয়, আপনজনের মৃত্যুর বিচ্ছেদ ঢেকে দিয়ে আর এক জীবন আসে, সে হয়তো প্রথমে আপনজন নয়। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে। ... একটি মৃত্যুকে পেরিয়ে থাকে আর এক আভাস। জীবনের শেষ অসীমত্ব এসে দাঁড়ায়, প্রকৃতির হাত ধরে। উমারানীর জীবন ও মৃত্যু এই বাস্তবে স্বাভাবিক ঘটনা- এ মৃত্যু গল্পটির প্রকাশকাল ১৩২৯-এও যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। কিন্তু এ বিশ্বে জীবন তো হার মানে না, প্রকৃতির মতোই সবকিছুকে প্রতিহত করে এক জীবনাবেগে প্রবাহিত। তাই উমারানীর গল্প শেষ হয়েও শেষ হয় না : অনেক বছর কেটে গেলেও উমারানী থেকে যায়। ... আবহমান এক প্রকৃতির মৃত্যুঞ্জয়ী অস্তিত্বে উমারানী তার ব্যর্থ জীবন ও মৃত্যু পেরিয়ে দাদার ভাবনায়, একটি মানুষের মনদৃষ্টিতে বেঁচে আছে। ... উমারানী গল্পের মৃত্যুতে সামাজিক পটভূমি প্রচ্ছন্নভাবে আছে। প্রত্যক্ষত গল্পটি দুটি প্রাথমিকভাবে অচেনা, সম্পর্কহীন নর-নারীর সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[২]

'পুঁইমাচা' *(মেঘমল্লার,* ১৯৩১) গল্পে যৌতুকের মত সামাজিক ব্যাধির যূপকাষ্ঠে এক উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীর অবহেলিত, লাঞ্ছিত জীবনের সকরুণ বৃত্তান্ত উপস্থাপনে লেখকের গ্রামজীবন-সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা মানব-মনস্তত্ত্বকে অনুধাবনের পারদর্শিতায় সুনিপুণ শিল্পভাষ্যে উত্তীর্ণ। বিশ শতকের ক্রমস্ফীত পুঁজিবাদী সমাজে অর্থের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অহমিকা ও উচ্চম্মন্যতা যে নিতান্তই তুচ্ছ, উক্ত সত্যের প্রতিভাষণ হয়ে উঠেছে এ গল্প। এককালে বংশগত আভিজাত্য ও প্রসিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অনটনে স্ত্রী ও তিন কন্যার

পরিবারের কর্তা সহায়হরি চাটুজ্যের সাংসারিক ব্যয়ভারের নিয়মিত বন্দোবস্ত রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তবে এ ব্যাপারে স্বভাবে কিছুটা উদাসীন ও লঘু মেজাজের সহায়হরির তেমন ভ্রুক্ষেপ বা দুশ্চিন্তা নেই। তার নামেই প্রতিবিম্বিত হয় কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনের অনীহাসূচক মনোভঙ্গি। আপাতসরল ও অবৈষয়িক সহায়হরি সংসার নির্বাহে অবলীলায় অন্যের পুকুরে মাছ ধরা, জমিতে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ সামগ্রী হস্তগত করতে সচেষ্ট। ব্যক্তিগত মান-মর্যাদার ব্যাপারে অসীম উদাসীনতাও তার উপর্যুক্ত কর্মসাধনে বিশেষ সহায়ক। গল্পের প্রারম্ভেই বিবৃত হয়েছে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত। 'সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।' (১ ॥ ৫৩৬)। তার বাউণ্ডুলে ও উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি স্ত্রী অন্নপূর্ণার রয়েছে তীব্র আক্ষেপ। কারণ, মান-মর্যাদাহীনতাকে তাচ্ছিল্য করে যথেচ্ছ সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য সে স্বামীর আপাতভোলা স্বভাবের প্রতি সর্বদাই খড়্গহস্ত। 'চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই' (১ ॥ ৫৩৬) এমন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে পেয়ে অন্নপূর্ণা সর্বদাই বিচলিত। আর্থিক সংকট মোকাবেলার তাগিদে সহায়হরিকে অন্যের কাছে প্রায়শই ঋণগ্রহণে বাধ্য হতে হয়। তা-ছাড়া সংসারের ভালো-মন্দের প্রতি স্বামীর অমনোযোগ ও চিন্তাহীনতায় অন্নপূর্ণা রীতিমত ক্ষিপ্ত। কারণ বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলেও একবার সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়া মেয়ের জন্য বিয়ের অন্য সম্বন্ধ অনুসন্ধানের ব্যাপারে সহায়হরির নেই কোনো উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা। তার বড় মেয়ে ক্ষেন্তির বয়স পনেরো, যদিও তার বাবা মা বহুকষ্টে তাকে তেরো বছরের মেয়ে হিসেবে গ্রামসমাজে প্রচারে সচেষ্ট। কারণ বর্ণবাদী বিধান অনুযায়ী সমাজে মেয়ের বিয়ের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেটি অতিক্রম করলে তার বাবা-মাকে নিশ্চিতভাবেই সামাজিক নিগ্রহের শিকার হওয়ার বিবিধ আশংকা বিদ্যমান। সে-কারণেই ক্ষেন্তির বিয়ে প্রসঙ্গে অন্নপূর্ণার চেতনালোকে উদ্বেগ সর্বদা বিরাজমান। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি কালীময় চৌধুরীর ক্ষেন্তির জন্য মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করার অন্তরালবর্তী উদ্দেশ্য ছিল 'কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেক দিনের সুদ পর্যন্ত বাকি—শীঘ্রই নালিশ হইবে' (১ ॥ ৫৩৮)। একপর্যায়ে পাত্রপক্ষ ক্ষেন্তিকে আশীর্বাদ করে যাওয়ার কিছুদিনের ব্যবধানে সহায়হরি ঘটনাক্রমে অবহিত হয় —

> পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন। (১ ॥ ৫৩৯)।

তাই একপর্যায়ে কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সহায়হরিকে তলব করা হয়। কারণ ক্ষেন্তিকে বিয়ের জন্য আশীর্বাদ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন অনুযায়ী বিয়ের আশীর্বাদপ্রাপ্ত পাত্রী ক্ষেন্তি এক অর্থে উৎসর্গীকৃত, শুধু সাত পাক বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ অবশিষ্ট। সেটুকু সম্পন্ন হবে বিয়ের মাধ্যমে। এমতাবস্থায় তাকে স্পষ্টতই হুমকি প্রদান করা হয়- গ্রামের ব্রাহ্মণসমাজকে

উপেক্ষা করে সহায়হরি যদি স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তবে তাকে পরিবারসহ সমাজ থেকে বিতাড়িত হতে হবে। অন্নপূর্ণার মনেও সমাজে একঘরে হবার ভয়। সহায়হরিকে উদ্দেশ্য করে প্রক্ষিপ্ত অন্নপূর্ণার সংলাপে বিষয়টি স্পষ্ট হয় — 'আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না,— ও নাকি উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে-গাঁয়ের কোনো কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না।' (১ ॥ ৫৩৬)। সহায়হরি বর্ণগত পরিচয়ে ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণসুলভ কৃত্রিম জাত্যভিমান ও উচ্চম্মন্যতা তার স্বভাবে অনুপস্থিত। বরং গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা বাগদি, দুলেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক যথেষ্ট আন্তরিকতাপূর্ণ, যা তার স্ত্রী অন্নপূর্ণার চক্ষুশূল। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে বর্ণভেদের মূল উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ হিসেবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অপরাপর অধস্তন বর্ণসমূহের সর্বপ্রকার দূরত্ব বজায় রাখার বাধ্যবাধকতায়। জননী হিসেবে অন্নপূর্ণা ক্ষেন্তির জন্য বিভিন্ন কারণে চিন্তিত। প্রথমত, সহায়হরি ক্ষেন্তির পুনর্বিবাহের ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীন। কেননা সামাজিক অনুশাসন ও গ্রামের সমাজপতিদের আদেশ তার নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, ক্ষেন্তির বয়স ক্রমশ বর্ধমান। পনেরো বছরের তরুণীকে ঘরে আইবুড়ো করে রাখলে সমাজারোপিত অপবাদ ও কলঙ্কের ভাগীদার হতে হবে। তদুপরি, একবার সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে সহায়হরি তা ভেঙে দেয়ায় ক্ষেন্তির জন্য অন্নপূর্ণা সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সর্বোপরি, ক্ষেন্তির আচরণ তার পিতার স্বভাবানুসারী। সহায়হরির মতই গ্রামের কার বাড়ি থেকে কি চেয়ে-চিন্তে আনা যায়, এ ব্যাপারে তার উৎসাহ সর্বাধিক। কারণ, ভোজনপটু হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের অন্যের বাড়ি থেকে কখনো চুরি, কখনো চেয়ে-চিন্তে আহার সংগ্রহ অন্নপূর্ণার নিকট কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর ফলে গ্রামবাসীর নিকট অন্নপূর্ণার পরিবারসহ সম্মানহানির সুযোগ ত্বরান্বিত হয়। তবে পিতার মত ক্ষেন্তিও উপর্যুক্ত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের পরিবর্তে বরং অন্যের জমি থেকে যে-কোনো ভাবে ঈপ্সিত বস্তু আহরণে সচেষ্ট। গল্পের প্রারম্ভাংশেই লক্ষণীয়, ক্ষেন্তি গ্রামের রায় পরিবারের জমিতে বেড়ে ওঠা মোটা ও হলদেটে এক আঁটি পাকা পুঁইশাক কুড়িয়ে আনে। শুধু তাই নয়, প্রিয় পুঁইডাটা রান্নার জন্য গয়া বুড়ির নিকট হতে ধারে চিংড়ি মাছও নিয়ে আসে। কিন্তু ঘরে প্রবেশমাত্রই অন্নপূর্ণার রুদ্রমূর্তির দাপটে তাকে বিপর্যস্ত হতে হয়। কারণ তার আহৃত পুঁইশাক খাবার অযোগ্য বলেই রায়মহাশয় ক্ষেন্তিকে জমি থেকে কুড়িয়ে নিতে বলেছিল। ক্ষেন্তির অন্নাহারে আগ্রহের বিষয়টি সম্পর্কে উক্ত প্রতিবেশী অবগত বলেই সে জমি থেকে সেগুলো তুলে নিতে বলেছিল। এর ফলে তাকে লোকমারফত এসব জঞ্জাল পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়নি। এ বিষয়টি অনুধাবনপূর্বক ক্ষেন্তি ও সহায়হরির প্রতি অন্নপূর্ণার ক্রোধান্বিত মনোভাবে তার আত্মমর্যাদাসূচক ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন স্পষ্ট। ক্ষেন্তির অতি প্রিয় পুঁইশাক অন্নপূর্ণার আদেশে রাধী ফেলে দিতে বাধ্য হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সে ব্যথিতচিত্তে অশ্রু বিসর্জন করে। অবশেষে ক্ষেন্তির অশ্রুসিক্ত মুখাবয়র স্মরণপূর্বক উঠানে ও খিড়কি দোরের নিকট পতিত পুঁইশাক কুড়িয়ে অন্নপূর্ণা রান্নার পর দুপুরে যখন মেয়ের পাতে পরিবেশন করে এবং

ক্ষেন্তির পরিতৃপ্ত মুখ দেখে তার মাতৃহৃদয় আনন্দে সিক্ত হয়। কিন্তু দারিদ্র্যের পীড়নে জর্জরিত হয়েও অন্নপূর্ণা কোনোভাবেই অন্যের সামগ্রীর প্রতি প্রলুব্ধ নয়, এমনকি ক্ষেন্তির প্রতি তার রয়েছে কঠোর অনুশাসনের শৃঙ্খল। তবু তার শত নিষেধ ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ক্ষেন্তি ও সহায়হরি যথারীতি অন্যের বাড়ি, জমি থেকে সংগোপনে আহার সংগ্রহে সচেষ্ট। বরোজপোতার বনে গোসাঁইদের জমি থেকে তারা সংগোপনে মেটে আলু চুরি করলেও অন্নপূর্ণার তীক্ষ্ম দৃষ্টি ফাঁকি দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে স্বামীর অপ্রস্তুত অবস্থায় মিথ্যা দোহাই তোয়াক্কার পরিবর্তে প্রকৃত ঘটনা উদ্ধারার্থে সে ক্ষেন্তিকেও রীতিমত জেরা করে।

> অন্নপূর্ণা তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, পাজী, তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছো মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, তার মধ্যে দিনদুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এলো তুলে! যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা বলে পরের জিনিসে হাত? (১ ॥ ৫৪০)

কিছুদিনের ব্যবধানে ভাঙা পাঁচিলের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ক্ষেন্তির রোপিত পুঁইচারাটি ক্ষীণ অস্তিত্ব প্রকাশ করায় সে মহানন্দে অন্নপূর্ণাকে এ সংবাদ জানায়। পৌষের সংক্রান্তিতে পিঠা খেতে বসে অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার তিন মেয়ের আন্তরিক সম্পর্কের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সন্ধ্যাবেলায় অন্নপূর্ণা পিঠা তৈরি করতে বসলে ক্ষেন্তিও মাকে সাহায্য করার আগ্রহ ব্যক্ত করে। অন্নপূর্ণা এ প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত না হলেও 'ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড়' পরিধান করে তবেই সে সুযোগ পায়। ভোজনে পরিপূর্ণ আনন্দলাভে সচেষ্ট ক্ষেন্তি পিঠা খেতে অত্যন্ত ভালবাসে। কিন্তু পিতৃগৃহে তার এই নিশ্চিন্ত ও আনন্দমুখরিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে বৈশাখ মাসে সহায়হরির এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের ঘটকালিতে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ায়। চল্লিশ বছরের দোজবরে পাত্রের সঙ্গে তার বিয়েতে অন্নপূর্ণা অনাগ্রহী হলেও পাত্রের আর্থিক অবস্থা সমৃদ্ধশালী হওয়ায় অবশেষে তাকে রাজি হতে হয়। ক্ষেন্তি শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় তাকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায়কালে অন্নপূর্ণার মনোবেদনা অব্যক্ত থাকেনি। বিদায়লগ্নে ক্ষেন্তি দুমাস অতিবাহিত হলেই তাকে পিতৃগৃহে আনার অনুরোধ জানিয়েছিল। অথচ তার এ অভিলাষ অপূর্ণই থেকে যায়। সহায়হরির সংলাপে জানা যায়, বিয়ের এক বছরের ব্যবধানে ক্ষেন্তি মৃত। কারণ বিয়েতে যৌতুক বাবদ সহায়হরির আড়াইশ টাকা পাত্রপক্ষকে প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছিল। সে টাকা প্রদান না করায় বসন্তে আক্রান্ত ক্ষেন্তিকে দেখা ও পরিচর্যার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার পরিবারকে এ সংবাদ জ্ঞাপন বা পিতৃগৃহে পাঠানো থেকে বিরত থাকে। অন্নপূর্ণার কান্নাকাটিতে বিচলিত হয়ে সহায়হরি গত ফাল্গুনে ক্ষেন্তিকে দেখতে গেলে 'শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমন মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!' (১ ॥ ৫৪৩)।

ফাল্গুনে ক্ষেন্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কের বোনের বাসায় তারা তাকে অবলীলায় ফেলে রাখে। ইতঃপূর্বেই তার গহনাগুলো তারা খুলে রেখেছিল। অর্থাৎ একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারপ্রথার নঞর্থক দিকগুলোর পেষণে নারী হিসেবে ক্ষেন্তির প্রান্তিকতা ক্রমশই প্রকটিত হয়। প্রথমত, চল্লিশ বছর বয়স্ক স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে তাকে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হয়। দ্বিতীয়ত, স্বামীকে নিয়ে নিজের অভিলাষ অনুযায়ী সংসার যাপনে সে অসমর্থ। কারণ, শাশুড়ির কঠোর অনুশাসনে সে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ। তৃতীয়ত, স্বামীর আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন হলেও শ্বশুরবাড়ির যৌতুকের জন্য তার পরিবারের ব্যগ্রতাতেই প্রতীয়মান হয় ক্ষেন্তির প্রতি তার বিরূপ মনোভঙ্গি। তা না হলে অসুস্থ স্ত্রীকে পিতৃগৃহে পাঠাতে সে অন্তত যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারত। শুধু তাই নয়, সেই অবস্থাতেই তার পরিবারের সদস্যরা ক্ষেন্তির গহনাগুলো খুলে নেয়। অর্থাৎ স্ত্রী হিসেবে ক্ষেন্তি স্বামীর নিকট থেকে কোনো অধিকার ও মর্যাদা পায়নি। তাই রোগাক্রান্ত অবস্থায় অন্যের বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণই তার জীবনের সকল সম্ভাবনার যবনিকা ত্বরান্বিত করে। স্বভাবে কোমল, শান্ত ও সলজ্জ বলেই ক্ষেন্তির ওপর শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের মাত্রাও অধিক ছিল। তার মৃত্যুর পরবর্তী বছরের পৌষ-পার্বণের রাতে পিঠা তৈরি করতে বসে সন্তানহারা জননী অন্নপূর্ণা, বোনহারা রাধী ও পুটির অন্তর্লোকে জাগ্রত হয় ক্ষেন্তির স্মৃতি। কারণ সে পিঠা খেতে ভীষণ ভালোবাসত।

> তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল ... যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে ... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর! (১ ॥ ৫৪৫)

ক্ষেন্তির হাতে রোপিত তার প্রিয় পুঁইগাছটি গত বছরের ক্ষীণ অবস্থা থেকে এ বছর তার অবিশ্বাস্য জীবনীশক্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয় সজীবতা ও প্রবৃদ্ধির দুরন্ত আহ্বানে। ক্ষেন্তির আকস্মিক মৃত্যুতে তার ব্যক্তিসত্তার অন্তর্গত প্রাণপ্রবাহে বিরতি ঘটলেও প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে তার পরিচর্যিত পুঁইগাছটি শত শাখায় বিস্তৃত হয়ে জীবনের অবারিত স্পন্দনকেই আভাসিত করে। প্রকৃতির অবধারিত নিয়মেই জগতে নতুনের আবির্ভাব ও পুরাতনের তিরোধান চক্র অবিরাম সঞ্চরণশীল। তাই কেউ মারা গেলেও অর্থাৎ তার ব্যক্তিসত্তার বিনাশ সাধিত হলেও অন্যদের জীবনে বিরতি পড়ে না। আবার প্রত্যেকের গড়পড়তা জীবনেও রয়েছে বিবর্তনের নির্দিষ্ট রূপরেখা। ক্ষেন্তির অকাল মৃত্যুর জন্য শ্বশুরবাড়ির মানসিক পীড়ন, অবহেলা ও উপেক্ষা দায়ী; যার মূলে রয়েছে অবক্ষয়িত সমাজের ব্যাধিস্বরূপ যৌতুকপ্রথা। তথাপি বিভূতিভূষণ জীবনের পরিসমাপ্তি হিসেবে মৃত্যুকে

এ গল্পে উপজীব্য করে তোলেননি। ক্ষেন্তির লাগানো পুঁইপাতার সুপুষ্ট পরিবর্ধনে মৃত্যুর পরাজয়ের বিপরীতে জীবনের জয়গানই ঘোষিত হয়।

এ গল্পে ব্রাহ্মণ্যবাদী গ্রামীণ সমাজের সামগ্রিক রূপটি বিভূতিভূষণের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিতে অকৃত্রিমভাবে ধরা পড়েছে। পূর্বপুরুষ অতীতে প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সমর্থ ছিল, এমন এক ব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহকর্তা হয়েও গ্রামসমাজে সহায়হরির অবস্থান মর্যাদাহীন। কারণ, আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় সে প্রায় কপর্দকশূন্য, পরমুখাপেক্ষী। পুরোহিত হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট হতে প্রাপ্ত সামান্য দান-দক্ষিণা ব্যতীত তার আয়ের কোনো বন্দোবস্ত নেই। তদুপরি সে কালীনাথের মত গ্রামসমাজের কর্তাব্যক্তিও নয়, যার দাপটে অন্যরা তটস্থ থাকে। এরূপ ভঙ্গুর, সঙ্গতিহীন পরিবারের কর্তা হিসেবে সে ভিন্ন কোনো জীবিকা অবলম্বনে অসমর্থ। কারণ, পৌরোহিত্য ব্যতীত নিম্নতর বর্ণসমূহের জন্য নির্ধারিত জীবিকা অবলম্বনে সে অনাগ্রহী, উদ্যমহীন। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে সম্পাদনের জন্য বরপক্ষের দাবিকৃত যৌতুক দানের সঙ্গতি তার নেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকের শেষভাগে পরিবর্তিত গ্রামীণ জীবনব্যবস্থায় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যই যে সমাজের চালিকাশক্তি হয়ে উঠছিল এবং ধর্মীয় প্রতাপ যে ক্রমশই ক্ষয়িষ্ণু রূপ লাভ করছিল, সহায়হরির মত ব্রাহ্মণের পারিবারিক বিপর্যয়ের চিত্র তারই প্রতিধ্বনিবহ। ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে বিদ্যমান প্রান্তিকতার মানদণ্ড হিসেবে এ পর্যায়ে স্পষ্টই অর্থ ও ধর্মীয় উচ্চম্মন্যতার সংঘাতে প্রথমটির বিজয় ও অবশিষ্টটির পরাজয় নিশ্চিত হয়। অন্য বর্ণের তুলনায় ব্রাহ্মণরা ধর্মীয় পরিচয়ের গুণেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হলেও এর অন্তর্গত প্রতারণা নিশ্চিতভাবেই ধরা পড়ে যখন স্বীয় বর্ণের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অপরতাবোধের উদ্ভব ঘটে। কালীনাথের সঙ্গে সহায়হরির পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্কের বিশ্লেষণেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। সহায়হরির মেয়ে ক্ষেন্তির বিবাহের পাত্র নির্ধারণের দায়িত্ব নিজের গরজেই পালন করে কালীনাথ, কারণ এর সঙ্গে জড়িত তার আর্থিক সম্পৃক্ততা। এ কর্তৃত্ব তার রয়েছে বলেই সহায়হরি তার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে যথাসময়ে দেখা করতে বাধ্য হয়। অতঃপর তাকে কালীনাথ স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে তার সিদ্ধান্ত:

> পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাতপাকের যা বাকি, এই তো? ... সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব, এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল। ... পাত্তর পাত্তর! রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না? ... গরিব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানল? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না? (১ ॥ ৫৩৮)

অন্যদিকে বর্ণগত পরিচয়ে ব্রাহ্মণ হলেও সহায়হরি ক্ষেন্তির শ্বশুরপক্ষের নিকট কোনো ছাড় পায়নি। যৌতুক প্রদানে তার অসঙ্গতির জন্যই তাদের অমানবিক আচরণ ও অর্থলোভ প্রকটিত হয়। অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধের চেয়ে অর্থের আসক্তিই পরিবর্তনশীল গ্রামীণ জীবনধারার চালিকাশক্তি হওয়ায় ব্রাহ্মণ সহায়হরির প্রান্তিকতা সুচিহ্নিত হয়। বিভূতিভূষণের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত বাঙালি গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন বাঁক-বদলের রূপরেখা নির্দেশেও এ গল্পের উপযোগিতা অনতিক্রান্ত। এ গল্প সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত —

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়:

> "পুঁইমাচা' "পথের পাঁচালীকে মনে পড়িয়ে দেয়। সর্বজয়া এখানে অন্নপূর্ণায় পরিণত হয়েছে- গল্পের প্রধান চরিত্র ক্ষেন্তি দুর্গারই রূপান্তর ছাড়া কিছু নয়। সরল, স্বল্পবুদ্ধি, ভোজনপ্রিয় এই মেয়েটি দুর্গার নারকেল সংগ্রহ করবার মতো বাপের সহযোগিতায় মেটে আলু চুরি করে আনে। শেষ পর্যন্ত প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার বিয়ে, শ্বশুরবাড়িতে নিগ্রহ এবং পরিণামে সন্দেহ-জনক অকালমৃত্যু- অপরূপ সহমর্মিতা ও মমত্বের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। গল্পটির কৃতিত্ব এর রচনায়- হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি উজাড় করে দিয়ে এটি লেখা। বিভূতিভূষণ অনুভব করেন- "Innocence"-এর মূল্য দেবার মতো মানুষ সংসারে খুব বেশি নেই- কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠে কখনো ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। ক্ষেন্তিকে বৈষয়িক জগৎ থেকে অকালে চলে যেতে হয়, কিন্তু তার জীবনের ছোট আশা, ছোট আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর সে রেখে যায় তারই রোপিত 'পুঁইমাচায়'।[৩]

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'পুঁইমাচা' গল্পে 'পথের পাঁচালী'র অনুরূপ সাদৃশ্যের কথা বলেছেন।[৪]

বীরেন্দ্র দত্তের ভাষ্য:

> সমগ্র গল্পটির পটভূমিতে আছে বাংলার এক প্রকৃতি-লালিত শান্ত গ্রাম, তার মানুষজন, তার গাছ-পালা, ফলমূল। ... বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল তীব্র রোমান্টিক কবি মন। তাঁর প্রতীক প্রয়োগে সেই মন সক্রিয়। ... পুঁইমাচা গল্পের শেষে লেখক যে একটি কল্প-চিত্রকে কয়েকটি বাক্যবন্ধের গাঢ়তায় এঁকেছেন, তার মধ্যে লেখকের রোমান্টিক মনের উত্তুঙ্গ স্বভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যু মানুষের সবচেয়ে Crude reality। ... ক্ষেন্তির মৃত্যু নিষ্ঠুর সত্য ও বাস্তব। লেখক তাকে নধর পুঁইগাছের সঙ্গে যোগে ব্যাপক অর্থ-তাৎপর্য দিয়েছেন। ... প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর যোগে বর্তমান লেখক এক গভীর বেদনাকে অন্তঃশীল রেখেছেন। ... 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তির পোতা 'প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' পুঁইচারার মধ্যে বিভূতিভূষণ প্রচ্ছন্ন রেখেছেন পরোক্ষে ক্ষেন্তির জন্য গভীর দীর্ঘশ্বাস। পুঁইচারা যেন জীবন্ত ক্ষেন্তির লোভী-বাসনা ও মৃত ক্ষেন্তির অসহায় বিষাদের মিলিত অস্তিত্ব। এই চিত্রে প্রকৃতির দুর্মর, দুরন্ত, সর্বকালিক জয় ঘোষণা আছে ঠিকই, কিন্ত এসবের অধিতলে মহাভারতের শেষে যদুবংশ ধক্ষংসের পর্বে কালপুরুষের ছায়ায় সবার অলক্ষ্যে নিশ্চুপ সঞ্চরমান থাকার মতো ক্ষেন্তি অসহায় মৃত্যুজনিত দুঃখের বেদনা ও বিষাদের ছায়া লেগেই আছে।[৫]

সরোজমোহন মিত্রের বক্তব্য:

> গল্পের নাম পুঁই মাচা। পুঁই মাচার নধর এবং লাবণ্যে পরিপূর্ণ সতেজতার মধ্যে একটি মেয়ের স্মৃতি বর্তমান। তা অত্যন্ত করুণ, নিষ্ঠুর এবং নির্মম। নিরীহ, সরল, শান্ত এবং অধিক মাত্রায়

> ভোজন পটু একটি গ্রাম্য বালিকার যে নিষ্ঠুর পরিণতি তার উল্লেখ থাকলেও সেদিকে লেখকের কটুমন্তব্য থাকলেও সে সমস্যার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। ... বিভূতিভূষণের মৌলিকতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে। ... সব উত্তেজনার মধ্যে থেকেও তিনি শান্ত স্থির এবং ধ্যানস্থ হতে পারেন। ক্ষেন্তির জীবনের নিষ্ঠুর পরিণামের চেয়েও তার লোভী জীবনের পুঁই পাতার প্রতি আকর্ষণই লেখককে বেশি মুগ্ধ করেছে। ... গল্পটি নিঃসন্দেহে করুণ সুরে বাঁধা। ক্ষেন্তির জীবনের পরিণাম অবশ্যই করুণ। লেখক কিন্তু সেখানে গল্পটিকে শেষ করেননি। পুঁই মাচার স্মৃতির মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। ... এখানে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক। ... এখানে মানুষের প্রতি লেখকের ভালোবাসার পরিচয় আছে কিন্তু একই সঙ্গে আছে পল্লীপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি। গল্পের মধ্যে অতৃপ্তির চেয়ে প্রীতিবোধই প্রধান। ... বিভূতিভূষণ এই গল্পে প্রকৃতিভাবনার অনন্যতাকে পুঁই গাছের অনন্ত জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ... ক্ষেন্তির মৃত্যু এই গল্পে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তার মৃত্যুই গল্পের পরিণতিতে পুঁইগাছের মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবন প্রবাহের শাশ্বত সত্যকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। এখানেই বিভূতিভূষণের মূল বৈশিষ্ট্য।[৬]

'মৌরীফুল' *(মৌরীফুল*, ১৯৩২) গল্পে রক্ষণশীল সমাজে নারীর ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদার বহিঃপ্রকাশ কীভাবে তাকে পদে পদে লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়, তার অসামান্য রূপায়ণ ঘটেছে সুশীলা চরিত্রে। নামের সঙ্গে তার চরিত্রের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধানের পরিবর্তে অন্যায়ের প্রতিবাদ, স্বীয় অবস্থানে অটল থাকার সুদৃঢ় মানসিকতা প্রভৃতি একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারে এক তরুণী গৃহবধূর স্বপ্নগুলোকে কী-ভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, সেটিও এ গল্পের উপজীব্য। বিভূতিভূষণের সমগ্র ছোটগল্পের ভুবনে সুশীলার মত এত স্পষ্ট, প্রতিবাদী, ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্র আর নেই। সাধারণ এক গৃহবধূ হিসেবে সংসারে সুশীলার পরিণতি অন্য নারীর চেয়ে ব্যতিক্রমী নয়। কিন্তু তার স্বভাবগত স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল একগুয়েমি, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সেই অবস্থান থেকে কোনোভাবেই বিচ্যুত না হওয়ার প্রচেষ্টা, এরই পাশাপাশি স্নেহ-মমতা, ভালোবাসার জন্য ব্যাকুলতা। যে কাজ আন্তরিকভাবে বললে খুব সহজেই সুশীলাকে দিয়ে করিয়ে নেয়া সম্ভব, আদেশপ্রদানের মাধ্যমে তা তার নিকট হতে আদায় ততটাই দুরূহ। বৃদ্ধ রামতনু মুখুজ্যে সাধু শিবকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য, যদিও তার উপার্জনের উৎস হল গ্রামের জমিদারের জমি-জমা সংক্রান্ত মামলায় তার পক্ষে মিথ্যে সাক্ষ্য প্রদানের পাশাপাশি অন্যদেরও এর প্রশিক্ষণ দান। নিত্যদিন সামান্য বিষয়কে ভিত্তি করেই পুত্রবধূ সুশীলার সঙ্গে তার ও তার স্ত্রী মোক্ষদার চলতে থাকে অবিরাম বিবাদ। এ-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি এমনভাবে বাক্যবাণে লিপ্ত হয় যে সম্পর্কগত শ্রদ্ধা বা সৌজন্য, সমীহ বা আপস তখন রীতিমত অসম্ভব প্রতিভাত হয়। গল্পের বিবরণে প্রথমেই এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ লক্ষণীয়। বাড়িতে ঘি না থাকায় সুশীলা তার শ্বশুর রামতনুর সঞ্চিত ঘি দিয়ে খাবার রান্না করে। অন্যদিকে মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নিগৃহীত রামতনুর চিত্তদাহ বহুগুণে প্রজ্বলিত হয় বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত ঘটনা শ্রবণের মাধ্যমে। রামতনু ঘিয়ের প্রদীপে সন্ধ্যাকালে পরমহংসের আরতি সম্পাদনে অভ্যস্ত। তাই এ ঘটনায়-

> প্রায় অর্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া মুখুজ্যে বাড়ির অন্দর মহলে একটা রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখুজ্যে মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সামলাইয়া লইয়া এমন-সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন আঠারো-বৎসর বয়স্কা তরুণীর মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকিলের অপমানে ও ঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখুজ্যে পুত্রবধূর পিতৃকুল ও তাঁহার নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমন সব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডুবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে-সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব। (১ ॥ ৪৫-৪৬)

জমিদারের কাছারিতে মুহুরির স্বল্প বেতনে কর্মরত সুশীলার স্বামী কিশোরীলাল ঘরে ফিরলেই তাকে সুশীলার ক্রুদ্ধ অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয় — 'এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ি ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হয়।' (১ ॥ ৪৬)। এ ঘটনায় কিশোরী বিচলিত নয়। কারণ পাঁচ বছরের দাম্পত্যজীবনে এ দৃশ্য তার অতি পরিচিত। সুশীলার প্রতি রামতনুর অভিযোগ হল —

> সুশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। ... শ্বশুর শাশুড়িকে সে হঠাৎ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্য তাহার চেষ্টায় ত্রুটি দেখা যায় না! (১ ॥ ৪৬)।

সংসারে তাদের সঙ্গে সুশীলার সম্পর্ক বহুলাংশেই বৈরী ভাবাপন্ন। সে-কারণেই স্বামীর নিকট সে প্রত্যাশা করে অনুরাগ, ভালোবাসাসিক্ত কোমল ব্যবহার ও সবিশেষ মনোযোগ। কিন্তু তার প্রবণতা হল, কেউ তার সঙ্গে বাঁকা মুখে কথা বললে সেও এর জবাবে নেতিবাচক মনোভঙ্গিতে প্রত্যুত্তরদানে অগ্রসর হয়। ফলে পরক্ষণেই দু'পক্ষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তিক্ততা ও বাগ-বিতণ্ডা। তাই সেদিন গভীর রাতে বাড়িতে ফেরার একপর্যায়ে নিদ্রিত সুশীলাকে না ডেকেই আহার পর্ব সম্পন্ন করার সময় 'আর ডেকে কি হবে। আমার কি আর হাত পা নেই। নিতে জানি নে?' (১ ॥ ৪৬) বলায় ক্রুদ্ধ সুশীলার প্রত্যুত্তর — 'নিতে জানো তো জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বনবে না। এ যেন হয়েচে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়িসুদ্ধ লোক আমার পেছনে এমন করে লেগেছে কেন শুনতে চাই।' (১ ॥ ৪৬)। স্বামীর প্রতি সুশীলার এ ধরনের নেতিবাচকতা একান্তই অকারণে নয়। কিশোরী গভীররাতে বাড়িতে ফেরার একপর্যায়ে নিছক স্ত্রীর দায়িত্বপালনের তাগিদেই নয়, বরং আন্তরিকতাবশতই সে প্রশ্ন করেছিল — 'কখন এলে? তা আমার ডাকলে না কেন?' (১ ॥ ৪৬)। কিশোরীর নিকট মাঝরাতে অভিমানী সুশীলার ক্রোধ ও কান্না বিড়ম্বনামাত্র। এর অন্তরালে স্ত্রীর বিক্ষুব্ধতার কারণ সম্পর্কে অবহিত হতে সে অনাগ্রহী। সে-কারণেই রাতে কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট কিশোরীর পরবর্তী সংলাপেই নির্মমভাবে প্রকাশিত হয় পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তৃত ব্যবধান ও আন্তরিকতা —

'ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ, কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে ওঠাবো।' (১ ॥ ৪৬)। সংসারে নানা কাজের ভারে অতিষ্ঠ সুশীলাকে তার শাশুড়ি যখন কোনো কাজের জন্য অনবরত তাগাদা দিয়েও তা সম্পাদনে ব্যর্থ হয়, তখন তার আচরণে উন্মোচিত হয় ক্রোধ ও অপমানবোধের অদ্বৈত সমাবেশ। অন্যদিকে সুশীলাও সংসারের অজস্র কাজের চাপে যখন অতিষ্ঠ, তখন শাশুড়ির রূঢ় বাক্যে তার গাত্রদাহ ঘটে। উভয়েরই পরস্পরের প্রতি অনমনীয় ও শ্রদ্ধা-বাৎসল্যহীন মনোভঙ্গি এজন্য দায়ী।

সুশীলার স্বভাবে বিরক্তি ও ক্রোধের সমান্তরালেই প্রকাশিত হয় অন্যের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও আন্তরিকতা। কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থ বা দয়া প্রকাশের জন্য সে উক্ত আচরণে উদ্বুদ্ধ নয়। ম্যালেরিয়ার জরাজীর্ণ দশ-বারো বৎসরের পিতৃহীন আতর ঘরামির ছেলের করুণ কাহিনী শুনে সুশীলার সংবেদনশীল চিত্ত বেদনায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। তাই শ্বশুর-শাশুড়ির দৃষ্টি এড়িয়ে সংগোপনে সে ছেলেটিকে বিছানার চাদর প্রদান করে, ঠাণ্ডার পীড়ন হতে রক্ষার প্রচেষ্টায়। সুশীলা সর্বদাই তাদের প্রতি বিমুখ বা অবাধ্য নয়, বরং কখনো কখনো তাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এ ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে রান্নাঘরে প্রবেশের পর 'ছেলেটার দুঃখে সুশীলার মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল। সে গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল- আপনাকে কিছু দেব বাবা?' (১ ॥ ৪৮)। স্বাভাবিকভাবেই একথা শুনে মোক্ষদার কণ্ঠে তার প্রতি অবলীলায় উচ্চারিত হয় ভর্ৎসনা। অন্যদিকে রামতনুর সচেতন নীরবতা ও অনাগ্রহেই অভিব্যক্ত হয় সুশীলার প্রতি তাদের প্রতিকূল মনোভাবের স্বরূপ। স্বামীর প্রতি ভালোবাসার অনুভব সুশীলার স্বভাবে বরাবরই লক্ষণীয়। দাম্পত্যজীবনের প্রেমসিক্ত মুহূর্তগুলো তার মনে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু যতই দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, ততই কিশোরীর অনাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয়তায় তাদের সম্পর্কটি হারিয়েছে ভালোবাসার মাধুর্য ও আনন্দ; হয়ে উঠেছে একঘেয়ে। তাই স্বামীকে প্রেমের ফাঁদে আবদ্ধ করার কৌশল হিসেবে সুশীলা চিঠি লেখার অভিনয়ের পাশাপাশি কখনো আরব্য রজনীর রূপকথা শোনানোর অনুনয় জানায়। কারণ 'অনেক দিন সে স্বামীর মুখে দুটো ভালো কথা শুনে নাই, তাহার নারী হৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল।' (১ ॥ ৪৮)। কিন্তু তার তৃষ্ণার্ত চিত্তের আকুলতা অনুধাবনের সাধ বা সামর্থ্য কিশোরীর ছিল না। তাই এক পর্যায়ে সুশীলার গল্প বলার অনুনয় অচিরেই কিশোরীর অসন্তোষজনক মনোভঙ্গিতে বিরক্তিকর বিবেচিত হয়। এর নির্মম পরিণতিতে কিশোরীর দ্বারা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হওয়ার পাশাপাশি চরম অপমানিত অবস্থায় সে মাঝরাতে ঘর থেকে বিতাড়িত হয়। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক বিধি লঙ্ঘণপূর্বক কিশোরীর যথেচ্ছ, বেপরোয়া ও দাপুটে আচরণই হয়ে ওঠে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতির নির্ধারক। স্বামীর প্রতি দুর্বার ভালোবাসার আকর্ষণেই এভাবে নির্যাতিত হয়েও সুশীলা এই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে স্বামীর ওপর অভিমান করেনি। অর্থাৎ স্বামীর এই উগ্র রুদ্রমূর্তি সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই তার পরিচয় ঘটেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় স্বামীর নিপীড়ন প্রতিকারার্থে সচেষ্ট সুশীলা 'দুই হাতের নখ

আঁচড়াইয়া তাহার হাতের আঙ্গুলগুলিতে রক্তপাত' (১ ॥ ৪৯) ঘটাত। শিবতলার পূজা উপলক্ষে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে নৌ-ভ্রমণে তার সঙ্গে চৌধুরী বাড়ির এক গৃহবধূর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা এ বন্ধনকে অটুট রাখতে 'মৌরিফুল' পাতায়। কোলকাতার মেয়ে ও উচ্চশিক্ষিত ডেপুটির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার মৌরিফুলের নিরহঙ্কারী, আন্তরিক ও মাধুর্যপূর্ণ আহ্বানে অচিরেই সুশীলার হৃদয়ে তার অধিষ্ঠান ঘটে। তবে একপর্যায়ে যখন সে মৌরিফুলের সঙ্গে তার স্বামীর ভালোবাসাপূর্ণ অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বৃত্তান্ত অবগত হয়, তখন:

> সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল–সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে। প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত- সেই স্বামী কেন তাহার অমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হু হু করিয়া উঠিল।' (১ ॥ ৫১)

তাই এর প্রতিকারার্থে সে শিবতলার ঘাটে নেমে জনৈক বৃদ্ধার নিকট হতে সংগোপনে শিকড় ক্রয় করে স্বামীকে বশীভূত করার অন্তর্তাগিদে। কারণ সেটিই ছিল তার সকল আক্ষেপের কেন্দ্রবিন্দু। কিশোরী যদি তার প্রতি অতীতের ভালোবাসাস্নাত সম্পর্ক বজায় রাখত, তবে তার বিক্ষুব্ধ চিত্তে কোনো অপূর্ণতা থাকত না। শিকড় বিক্রেতা বৃদ্ধার নিকট স্বামী কিশোরীর 'বারমুখো টানের' কথা শুনে শঙ্কিত সুশীলা এর প্রতিকারার্থে উদ্যোগী হয়। অবশেষে সেদিনের নৌযাত্রার বিদায়লগ্নে মৌরিফুলের প্রতি সুশীলার আন্তরিক উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে তার অশ্রুসজল স্বীকারোক্তিতে — 'তোমায় ভুলব না ভাই মৌরিফুল। কখ্খোনো না—তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরিফুল' (১ ॥ ৫২)। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ছিল বরাবর সুশীলার ওপর। ভোর থেকে শুরু হত তার বিভিন্ন কাজের ভার, যা সারাদিন চলত। কিশোরীর বিয়ের পর গৃহকর্মের ক্ষেত্রে পূর্বের ঝি-চাকরের জায়গা দখল করেছিল সুশীলা। তবুও এ দায়িত্বপালনে তার কোনো আপত্তি ছিল না। মেজাজ ভালো থাকলে সমস্ত দিন নীরবে উদয়াস্ত পরিশ্রমেও সে থাকত স্বচ্ছন্দ। কিন্তু কোনো কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে বারবার বলা সত্ত্বেও সে ব্যাপারে অন্যদের অমনোযোগের কারণে সুশীলার মেজাজ চড়ে যেত। তাই রামতনু রান্নার কাঠের বন্দোবস্ত না করায় সে একদিন জেদের বশে দুপুরের রান্নায় বিরতি দেয়। এর পরিণতিতে সে সম্মুখীন হয় চরম অবমাননার। যথারীতি ভরদুপুরে বাড়ি ফিরে মোক্ষদা ও রামতনু এ বৃত্তান্ত অবহিত হয়। এরপর কিশোরীর প্রত্যাবর্তনের একপর্যায়ে চেলাকাঠের প্রহারে সুশীলাকে নিরস্ত্র করার মাধ্যমে তার পাশবিক ক্রোধান্ধতার অবসান ঘটে। বলাবাহুল্য, বিভূতিভূষণের অন্য কোনো গল্পেই স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের এমন জীবন্ত অথচ নির্মম বর্ণনা নেই। কিন্তু বাঙালি গ্রামীণ সমাজে উপর্যুক্ত পরিস্থিতির উপজীব্যতা থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ, মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন। প্রকৃতঅর্থে, পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন এ সমাজে প্রচলিত ও স্বাভাবিক ছিল। তাঁর বর্ণনা একান্তই প্রত্যক্ষদর্শীর বাস্তব অভিজ্ঞতাসুলভ ও অনুপুঙ্খ।

দিনদুপুরে সুশীলার লাঞ্ছনার এ ঘটনা পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট প্রথমে বিস্ময়, অতঃপর বিনোদনের জমজমাট খোরাকে উপনীত হয়। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ প্রতিবেশে বেড়ে ওঠা সুশীলার রক্ষণশীল ও সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তে স্বামীকে বশে আনার ঔষধ প্রয়োগের কোনে বিকল্প না থাকায় সে পরদিন গোপনে কিশোরীর জন্য ডালের বাটিতে শিকড় বাটা মেশাতে গিয়ে শাশুড়ির সতর্ক দৃষ্টিজালে আবদ্ধ হয়। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই মোক্ষদার মাধ্যমে সমগ্র গ্রামে অতি দ্রুতই প্রচারিত হয় — সুশীলা তার ছেলে কিশোরীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিল। এর প্রতিকারার্থে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরামর্শকে শিরোধার্য বিবেচনা করা হয়—'গুরু রক্ষা করেছেন! এখন যত শীগগির বিদেয় করতে পার তার চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভার্যে! আর একদিনও এখানে রেখো না।' (১ ॥ ৫৬)। সে রাতে ভিন্ন ঘরে তার শয়নের বন্দোবস্তের পাশাপাশি পরদিন পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ির দ্বারা পদে পদে অপদস্থ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সুশীলার সংবেদনশীল চিত্তে স্বামীর প্রতি প্রবল অভিমানবোধ পুঞ্জীভূত হয়। কারণ, ইতঃপূর্বেই অতি সামান্য কারণে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মতভেদের পরিণতিতে কিশোরীর দ্বারা প্রহৃত হলেও দিনদুপুরে পাড়া-প্রতিবেশীর সামনে তাকে কখনো হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। আদৌ সে তার স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করতে চেয়েছিল কি না — তা পরীক্ষা করার তাগিদ পাড়া-প্রতিবেশীদের ছিল না। সকলের নিকট অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত সুশীলার হয়ে কেউ প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে এগিয়ে আসেনি। কারণ যেখানে নারীকে তার স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের জন্য প্রতিনিয়ত পুরষের বাহুবল ও পেশীর জোর, মুখের হুকুমে ক্রমাগত পদদলিত হতে হয়, সেখানে সুশীলার মত ব্যক্তিত্বময়ী নারীর পক্ষে সমর্থন জানানো গ্রামবাসীর পক্ষে নিতান্তই বাহুল্য বিবেচিত। এটাই রক্ষণশীল, আধিপত্যপ্রবণ পুরুষতন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের অশিক্ষা, আর্থিক অনটন ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে পুঁজি করেই এর নগ্ন আক্রমণ ঘটে নারীর নিজস্বতা, প্রতিবাদ ও আপসহীন মনোভঙ্গিকে বিচূর্ণ করতে। ক্রমশই সুশীলার অবস্থান সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে প্রান্তবাসীর অবস্থানে পৌঁছায়, যেখানে তার অস্তিত্বহীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। তার অবচেতন মনে স্বামীকে নিয়ে স্বাধীনভাবে নীড় রচনার সাধ অধরাই থেকে যায়। কেননা, প্রবল জ্বরে সুশীলা মৌরিফুল ও ছোটবউকে আপন ভেবে অপূর্ণ স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়নের আগ্রহে বিভোর হলেও একপর্যায়ে প্রবল জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু ঘটে। এভাবেই আঠারো বছরের প্রাণচঞ্চল এক গৃহবধূর মনোভূমিতে উপ্ত ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন ও অশেষ সম্ভাবনাসমূহের অকালেই অবসান ঘটে, যে স্বামীকে অবলম্বন করে নতুন জীবন রচনার আগ্রহে উদ্বেল ছিল। একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারে গৃহবধূর ভূমিকা সকলের মনোরঞ্জন ও পরিতুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় নিবেদিত—এরূপ প্রত্যাশা যে-কোনো নারীর নিজস্ব অভিরুচি ও মানসিকতার পরিপন্থী। অথচ সুশীলার মত বিবাহিতা নারীর স্বামীকে নিয়ে নিজের অভিলাষ ও ইচ্ছানুযায়ী একটি পছন্দসই সংসারের গৃহকর্ত্রী হওয়ার সাধ অযৌক্তিক বা অধরা নয়। কিন্তু যেহেতু সে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও শিক্ষিত নয়, তাই গৃহের আটপৌরে গণ্ডিতেই অন্যের

অধীন, বিশেষত পুরুষের সেবাদাসীর ভূমিকা পালনে তাকে বাধ্য হতে হয়। এর অন্যথা কখনোই রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। সুশীলার মত ব্যক্তিত্বময়ী নারীর বিরুদ্ধাচরণের মূলোৎপাটন পুরুষতন্ত্রের নিকট অত্যাবশ্যক এ আশঙ্কায় যে, তার অনুসরণে অন্য নারীরাও প্রাপ্য অধিকার আদায়ে উদ্যোগী হলে তাদের যথেচ্ছ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হবে। নারী-পুরুষের সহাবস্থান বাঙালি গ্রামীণ সমাজে অকল্পনীয়। তাই সেখানে নারীকে নিজের অধীন রাখতে পুরুষ অবলীলায় তাকে জনসমক্ষে শারীরিক ও মানসিকভাবে চূড়ান্ত অপমান, এমনকি অবলীলায় পরিত্যাগেও দ্বিধাহীন। এভাবেই সুশীলার মত নারীর প্রান্তিকতা তার পরিণাম নির্ধারণে অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা পালন করে, যা বিশেষভাবেই পুরুষতন্ত্রের অপতৎপরতায় সৃষ্ট। এ গল্প সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত-

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়:

> একটি কলহপরায়ণা সরলা গ্রাম্যবধূর করুণ কাহিনী 'মৌরীফুল'। সে খেয়ালী, বধূ হিসাবে দুর্বিনীতা, তার ঝগড়ায় পাড়ায় কাকচিল পড়তে পারে না–সংসারের কাজেও তার কোনো পটুতা নেই। কিন্তু ক্ষণিকের সখী শহরবাসিনী "মৌরীফুলের" সোনার কাঠি মুহূর্তে তাকে আশ্চর্য সুন্দর করে তুলেছে। বহির্মুখ স্বামী কিশোরীকে ঘরমুখো করবার চেষ্টায় তার জীবনে যে দুর্ভাগ্য-পরিণতি নেমে এল, তার মরণাচ্ছন্ন চেতনায় বিবাহ-লগ্নের যে বাঁশির সুর আর মৌরীফুলের সোনার জল দেওয়া আতর-মাখানো চিঠির স্বপ্ন সঞ্চারিত হল–তা একটি করুণ বেদনায় পাঠকের চিত্তকে আর্দ্র করে তোলে। এ-ও বিবৃতিধর্মী গল্প- একটি সংকট মুহূর্ত আছে স্বামীর ডালের বাটিতে ওষুধ মেশাতে গিয়ে সুশীলার ধরা পড়ার মধ্যে–কিন্তু সমস্ত মিলে গোধুলির বর্ণরাগ দিনান্তিক অন্ধকারে মিলে যাওয়ার মতো এর শান্ত সহজ পরিণতি। আর তার অনুষঙ্গে মিশে আছে সেই হাপু-গাওয়া ছেলেটি, যার দারিদ্র্যের এবং বেদনার ছবিতে বিভূতিভূষণের সর্বাত্মক সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস।[৭]

বীরেন্দ্র দত্ত:

> বিভূতিভষণ সুশীলার মনোভঙ্গির ও জীবন-স্বভাবের বিকাশ ধরে কাহিনী ও ঘটনাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন — যেখানে গল্পের সুমিত স্বভাব বিস্ময়কর শিল্প রসের আস্বাদ দেয়। ... সুশীলা বিভূতিভূষণের অনবদ্য সৃষ্টি, সে নিছক গভীর বিষয়াসক্ত এক পরিবারের মানুষগুলির মূল্যায়নে বধূমাত্র নয়, সে শিল্পীর সৃষ্টি নারী— যার ব্যক্তিত্ব 'এ্যাভারেজ' বধূদের থেকে যোজন দূরের বিষয়। ... সুশীলা স্বপ্ন দেখেছে স্বামীর ভাল চাকরীর, আলাদা সংসারের, সংসার নিজের মতো করে গোছানোর, পেতে চেয়েছে বাপের বাড়ির কিছু নয়, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এক শহুরে বধূর অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি, বন্ধুত্ব-সখীত্ব। ... সুশীলার মৃত্যুতে তার ফেলে-যাওয়া শশুরবাড়ি হয়েছে তার অস্তিত্বের সমূল বিস্মরণের আশ্রয়। সুশীলা সংসারের বধূ ছিল, কিন্তু মনের গভীরে এক অনিকেত জীবন তৈরী হচ্ছিল কবে থেকে যেন! গল্পের অন্তিমে তারই সফল রূপ, রূপায়ণ। সুশীলা এক দক্ষ গল্পকারের হাতে আঁকা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের, অনন্য ব্যক্তিত্বের, জগত সংসারের, বিষয়ী মানুষের এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী গৃহক্ষধূ চরিত্র।[৮]

'বেণীগীর ফুলবাড়ী' (*বেণীগীর ফুলবাড়ী*, ১৯৪১) গল্পে আভিজাত্য, সৌন্দর্য ও প্রেমের অনিন্দ্য মহিমায় বিকশিত এক অসামান্য নারীর হৃদয়াবেগ-ই উপজীব্য, যদিও পুরুষতান্ত্রিক বিবেচনায় সেই প্রণয় তার ক্ষীণভঙ্গুর সামাজিক অবস্থান ও দুর্বলতারই প্রতীক। একে

অবলম্বনের মাধ্যমে রক্ষণশীল সমাজ সেই নারীকে রক্ষিতার মত অবমাননাকর অভিধায় শৃঙ্খলিত করার পাশাপাশি তার অসহায়ত্বের সুযোগে স্বার্থান্বেষী পুরুষের কর্তৃত্বপরায়ণতাকে কীভাবে স্বীকৃতি দান করে, সেটিই এ গল্পের গুরুত্ববহ প্রসঙ্গ। গল্পকথক হিসেবে এ গল্পে লেখক স্বয়ং উপস্থিত। গল্পকথক পিসিমার বাড়ি মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে পরিচিত হয় হুগলি জেলার প্রৌঢ় বাঙালি ললিতমোহন ঘোষালের সঙ্গে। সে একসময় উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও গল্পকথকের বিবেচনায়, সেগুলো যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পরিবর্তে প্রাচীনত্বের অনুসারী এবং এ-যুগে অচল। পরিচয়ের তিন বছরের ব্যবধানে গল্পকথক ধীরে ধীরে ললিতমোহনের বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিতির সূত্রে মনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। কোলকাতায় তার বইয়ের বিক্রি বন্ধ হওয়ায় সে মুঙ্গেরে চলে আসে এবং কমলেশ্বরী উকিলের সহায়তায় মণিয়ার বাবার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। সুদীর্ঘ সাত বছর তার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে চাকরির একপর্যায়ে মণিয়ার বাবার মৃত্যু হলে আইনত ললিতমোহনই মণিয়ার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এরপর মণিয়ার প্রতি তার স্বেচ্ছাচারিত্বের চরম রূপ ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে। কমলেশ্বরী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে বেণীগীর ফুলবাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে চাইলে তখন মুঙ্গেরে বসবাসকালে গল্পকথকের সঙ্গে তার ও মণিয়ার পরিচয় ঘটে। পঞ্চান্ন বছরের ললিতমোহনের প্রতি কুড়ি-একুশ বছরের ধনীর দুলালী মণিয়ার প্রেমের মূলে হার্দ্যিক আবেদন যতটা তীব্র, সামাজিক অনুশাসনের কড়াকড়ি ও কঠোরতা, সনাতনী রক্ষণশীলতার চাপ তার চেয়ে কোনো অংশেই কম রূঢ় ও অবমাননাকর নয়। মণিয়ার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর বিয়ে অর্থাৎ ধর্মকে সাক্ষী রেখে সামাজিক বন্ধনে একাত্ম হয়ে সংসার রচনার ঘটনা ঘটেনি—তাদের প্রেমের ফসল মণিয়া। তার বাবা ছিল ধনী জমিদার। বেণীগীর ফুলবাড়ি তারই নির্মিত। অন্যদিকে তার মা মজঃপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের কন্যা। এ বাগানবাড়িতে সে রক্ষিতা হিসেবে জমিদারের সঙ্গে একত্রে বসবাসকালে মণিয়ার জন্ম হয়। অতঃপর তাদের মৃত্যু হওয়ায় আইনত মণিয়াই এ বাগানবাড়ির একমাত্র অধিকারী। প্রথমবার মুঙ্গেরে অবস্থানকালে যখন মণিয়া ললিতমোহনের অনুরোধে গল্পকথককে বাড়িতে ডাকতে এসেছিল, তখনো তার পক্ষে মণিয়ার সঙ্গে ললিতমোহনের সম্পর্ক অনুধাবন সম্ভব হয়নি। প্রথম দর্শনেই সে মণিয়ার অনিন্দ্য সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়। স্বভাবসুলভ নম্রতা, লাজুকতা, সৌজন্যবোধ ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশে মণিয়াকে ললিতমোহনের গৃহ পরিচারিকা ভাবলেও পরবর্তীকালে তার পক্ষে তাদের প্রেমোপলব্ধির বৃত্তান্ত অনুধাবন সম্ভব হয়। গল্পকথক ও ললিতমোহনকে বাগানবাড়িতে আন্তরিক সেবাদানের পাশাপাশি নিজ হাতে রান্নার পর পরম যত্ন সহকারে পরিবেশনের একাগ্রতা তার সম্পর্কে গল্পকথককে নতুন ধারণা সঞ্চারে উদ্বুদ্ধ করে। মণিয়ার পূর্ব বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় তার জীবনের করুণ দিকটি গল্পকথককেও ব্যথিত করে। রক্ষিতার কন্যা হিসেবে সমাজে মণিয়ার পরিচয় গোপন রাখা অসম্ভব। তাই কেউই তাকে বিয়ে করতে সম্মত নয়। অন্যদিকে, পৈতৃক বাগানবাড়ি রক্ষার জন্য মণিয়ার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। তার একার পক্ষে এ সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কেননা তার

জন্মের বৃত্তান্ত ভারতবর্ষীয় সমাজে পাপ ও কলঙ্ক হিসেবে বিবেচিত। এ কারণেই ললিতমোহনের প্রতি সে সর্বদাই বাধ্যগত, সেবা যত্নে আন্তরিক। এ ছাড়াও নিঃসঙ্গ জীবনে সংসারের যে-কোনো কাজে মণিয়াকে ললিতমোহনের ওপর নির্ভর করতে হয়। কেননা বাইরের জগতের বিচিত্র কর্মপ্রবাহের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই মণিয়ার দূরত্ব রয়ে গেছে; যেহেতু সে ছিল ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। গল্পকথকের দৃষ্টিতে ললিতমোহনের প্রতি মণিয়ার গভীরতর প্রেমের স্বরূপ ধরা পড়ে, প্রথম যেদিন ললিতমোহনের বাড়ি ফিরতে বিলম্ব ঘটায় সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তার ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। পেশাগত জীবনে ললিতমোহন সম্পূর্ণ বেকার। সে মণিয়াকে আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদানে অক্ষম, অথচ তার যাবতীয় খরচ মণিয়ার অর্থেই সম্পন্ন হয়। এমনকি তার অর্থেই ললিতমোহন স্বগ্রামস্থ এক বেকার ভ্রাতুষ্পুত্রকে টাকা পাঠায়। এজন্য তার কোনো অনুতাপ বা সংকোচ নেই। মণিয়ার সঙ্গে আলাপকালে গল্পকথক অবহিত হয়— ছয় বছর পূর্বে পিতার মৃত্যু ঘটায় সে পৈতৃক বাগানবাড়িতে দাই-মা ও চাচাতো ভাইকে নিয়ে বাস করত। কিন্তু ললিতমোহনকে স্বামীর মত পরম ভক্তি করে বলেই মুঙ্গেরের অসচ্ছল জীবন থেকে মুক্ত করে মণিয়া তাকে বাগানবাড়িতে নিয়ে আসে। এছাড়া পৈতৃক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ক্রমশ খরচ হওয়ায় মুঙ্গেরের ব্যয়ভার বহন মণিয়ার পক্ষে দুরূহ ছিল। তার সরলতা, সৌন্দর্য ও রুচিবোধ, সঙ্গীতানুরাগ, আন্তরিকতা ও সেবাপরায়ণতা, বনেদিয়ানা প্রভৃতি রূপকথার রাজকন্যার মতই ঐশ্বর্যময়। গল্পকথকের মতে, মণিয়ার সঙ্গে প্রতিতুলনা চলতে পারে শুধু সংস্কৃত কাব্যের নায়িকাদের। গল্পকথকের বিবেচনায়, মণিয়া ও ললিতমোহনের পারস্পরিক সম্পর্ক যথেষ্ট আন্তরিক ও উভয়ের দিক থেকে একান্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল না। মণিয়া যত তীব্রভাবে ললিতমোহনকে ভালোবেসেছিল, ললিতমোহনের আচরণে তার কিয়দংশের বহিঃপ্রকাশও কখনো ঘটেনি। ললিতমোহন বেণীগীর ফুলবাড়িতে বসবাসে আগ্রহী, কারণ সেখানে মণিয়াই তার ব্যয়ভার বহনে সম্মত। আর এ সুযোগে সে মণিয়াকে প্রেমিকা হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে ঝি, পাচিকার মতোই যথেচ্ছ ব্যবহার করে। কারণ 'সমাজে ওর স্থান কোনদিনই নাই, আমায় ছাড়া ও কাউকে জানেও না।' (১ ॥ ৬২৮)। সেই সুযোগে ললিতমোহন মণিয়াকে এভাবে নিজের ভোগ, সুবিধা ও অর্থগত ব্যয়ভার লালনের জন্য বাধ্য করে। মণিয়ার প্রতি ললিতমোহনের অনাসক্ত ও বিরূপ মানসিকতার পরিচয় গল্পকথকের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয় দুটি ঘটনায়। প্রথমত, মণিয়ার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তার ও তার জননী সম্পর্কে অবলীলায় চরম মিথ্যাচার ও অশ্লীল মন্তব্য করায়।

> আমি কারও হাতে তোলা খেয়ে থাকতে পারব না। হয়েছে কি, আমার বাড়িতে একটা সাড়ে এগারো টাকার রেভিনিউ মনিঅর্ডার পাঠাতে হবে, আজ কদিন ধরে চাচ্ছি টাকাটা। কবার চাইব? আমার মান বলে একটা জিনিস আছে তো? আজ দেব, কাল দেব, আজ ওবেলা নিয়ে এসেছে পাঁচটি টাকা। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আরে, আমার বইয়ের এককালে তিন-তিনটে এডিশন হয়েছে, আমায় টাকা চেনাতে হবে না। ওর মা মাগী ছিল ভ্রষ্টা, ওদের কি ভদ্রস্থতা আছে মশাই? ভদ্রলোকের খাতির কি বোঝে ছাতুখোর মেড়ুয়াবাদীর দল? (১ ॥ ৬৩১)

অথচ এ ঘটনার দু'দিনের ব্যবধানে মণিয়ার নিকট থেকে সে অবহিত হয়, 'আমার হার ছড়াটা ভেঙে গড়াতে দেবেন বলে সঙ্গে আনলেন আর পঞ্চাশটা টাকা ওঁর নিজের কি দরকার আছে বল্লেন'। (১ ॥ ৬৩২)। ললিতমোহন সম্পর্কে মণিয়ার ধারণা ছিল অসম্পূর্ণ এবং কোনো বিরূপতা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। ভালোবাসার একনিষ্ঠ অনুরাগ ও আন্তরিকতার গুণে সে নিজেকে ললিতমোহনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করতে পেরেছিল বলেই ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের তিন বছরের ব্যবধানে পুনরায় তার নিকট ললিতমোহনকে ফিরে আসতে হয়। এতদিনে মণিয়া তার সম্পর্কে পোষণকৃত পূর্ব ধারণার বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতিসমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। জন্মের ওপরে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই বলেই মণিয়ার মত নারীকে আজীবন ললিতমোহনের মত স্বার্থসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়—'অমন সুন্দরী মেয়ে–কত তরুণ প্রেমিক যাহার এক কণা অনুগ্রহ পাইবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে রাজি হইতে পারিত—তাহার অদৃষ্টে একি দুর্ভোগ?' (১ ॥ ৬২৯)। এ সংকীর্ণমনস্ক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মণিয়ার মত রক্ষিতার স্থান নেই। অথচ মণিয়া ও তার জননীকে অশ্লীল সম্ভাষণ, বছরের পর বছর তার সম্পত্তি ভোগ, সর্বোপরি প্রেমের অভিনয়ের মাধ্যমে নারীকে নিজের সেবাদাসীতে রূপান্তরসাধনে ললিতমোহনের মত পুরুষরা কত পারদর্শী, গল্পকথক সে বিষয়টিও অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন। রক্ষিতা হিসেবে মণিয়ার প্রান্তিক অবস্থানকে অতিক্রম করে যায় তার অতুলনীয় চারিত্রিক মহিমা ও ঔদার্য, রুচিবোধ ও আভিজাত্য, সৌন্দর্য ও সরলতার সমন্বয়ে গঠিত তার দুর্লভ ব্যক্তিত্ববোধ এবং সেই প্রতিস্বিক অবস্থানেই মণিয়া অনন্য। নিজের কলঙ্কিত জন্মের দায়ভার মণিয়ার না থাকলেও এ সমাজের নিকট থেকে সহানুভূতি আদায়ে সে অপারগ। কারণ যে সমাজ তাকে নারীর স্বাভাবিক মর্যাদালাভ অর্থাৎ একজন পুরুষের স্ত্রী হওয়ার ন্যূনতম সুযোগ প্রদানপূর্বক তার সামাজিক পরিচয় অর্জনের পথ অবরুদ্ধ করে, সেখানে রক্ষিতা হিসেবে তার প্রান্তিক অবস্থান শুধু সামাজিকভাবেই নয়, বরং পারিবারিকভাবেও অবমাননাকর। পুরুষ তার ভোগবৃত্তিকে যথেচ্ছ নিবৃত্তির তাড়নাবশতই নারীকে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীকে তথাকথিত মর্যাদা প্রদানের পাশাপাশি পতিতাবৃত্তি, রক্ষিতা, উপপত্নীপ্রথা প্রভৃতির আয়োজন করে। এ-ক্ষেত্রে কোনো কারণে নারীর দুর্বলতা বা অসহায়ত্ব, পারিবারিক বিপর্যয় হয়ে ওঠে সুবিধাবাদী পুরুষের হাতিয়ার। এ মন্তব্য উক্ত গল্পের মণিয়া ও ললিতমোহনের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিজের জন্মের জন্য সমাজে কোণঠাসা ও বিব্রত, পিতৃমাতৃহীন মণিয়ার অগাধ ধনসম্পদের প্রতি প্রলোভনই ললিতমোহনকে প্ররোচিত করে ভালোবাসার অভিনয়নৈপুণ্যের দ্বারা তার পৈতৃক সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহারে। এ-ক্ষেত্রে সে মণিয়ার যে দুর্বলতাকে অবলম্বন করে, তা হল পারিপার্শ্বিক সমাজে মণিয়ার অবনমিত অবস্থান ও অসহায়ত্ববোধ। এ-ছাড়াও শিশু মণিয়াকে শৈশব থেকে প্রতিপালনের ফলে তার চিত্তে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে যে প্রেমভাব জাগ্রত হয়, তা মূলত ললিতমোহনকে কেন্দ্র করেই বিকশিত। অর্থরিক্ত ললিতমোহন সেই সুযোগে মণিয়াকে সেবাদাসীর মত ব্যবহারের পাশাপাশি তার অর্থ আত্মসাতেও উদ্যোগী হয়। অর্থাৎ নারীর ওপর প্রযুক্ত সামাজিক

নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে পুরুষতন্ত্র তাকে ইন্দ্রিয়লিপ্সার উপকরণে পরিণত করায় সেই নারী বাধ্য হয় নিজস্ব পরিচয় থেকে বিচ্যুত হতে এবং এ সমাজে তার প্রান্তিক অবস্থান সময়ের পরিক্রমায় প্রান্তিকতর হয়ে ওঠে।

'আহ্বান' (*উপলখণ্ড*, ১৯৪৫) গল্পে সন্তানের মত বাৎসল্য ও অপত্যস্নেহের মহিমায় ব্রাহ্মণ গল্পকথকের প্রতি বিধবা মুসলমান বৃদ্ধার অসামান্য ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ অকৃত্রিম শিল্পভাষ্যে উদ্ভাসিত। বলাবাহুল্য, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে বিদ্যমান অন্তরঙ্গতা ও হার্দিক প্রগাঢ়তার নিকট ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, সমগ্র গল্পে বৃদ্ধার পুনঃপুন 'অ মোর গোপাল' সম্বোধনে সে বিষয়টিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বাঙালি গ্রামীণ সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও সংখ্যালঘু মুসলমান নিঃসন্দেহে ধর্মীয় বিভাজনে পরস্পরের প্রতি অপরতাবোধে আক্রান্ত। বাহ্যদৃষ্টিতে এর স্বরূপ ততটা স্পষ্ট না হলেও নিত্যদিনের বহমান জীবনে আহার-বিহার-উৎসব, সাংস্কৃতিক লেনদেনের ভিন্নতা, স্বতন্ত্র ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতির ভিত্তিতে অপরতাবোধের অদৃশ্য দেয়াল তাদের আন্তঃমানবিক সম্পর্কে আরোপ করে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন। তবে এ গল্পে লেখকের জীবনবোধগত অবস্থান উক্ত ভাবনার ঠিক বিপ্রতীপ প্রান্তে, যেখানে মানবতাবাদই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় মূল্যবোধ হিসেবে পরিগণিত। জমির করাতীর বিধবা স্ত্রী সংসারে একাকী দিনযাপনে বাধ্যগত। কারণ স্বামী ও কন্যার মৃত্যুর পরবর্তীকালে একমাত্র কন্যাজামাতা তার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করায় উপার্জনহীন সংসারে দারিদ্র্যের করালগ্রাসে তাকে নিত্যদিন অনাহারে-অর্ধাহারে দিনযাপন করতে হয়। এমতাবস্থায় অন্যের দ্বারস্থ না হয়ে তার একবেলা ভাতের বন্দোবস্তও দুঃসাধ্য। ব্রাহ্মণ গল্পকথকের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে বগলে একটি ছোট থলে ঝুলিয়ে ডান হাতে লাঠি ঠুকে বাজারের পথে গমন কালে। তার উপলব্ধিতে এ বৃদ্ধা যেন 'ভারতচন্দ্র-বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নপূর্ণার মতো।' (১ ॥ ২৯৩)। এরপর তার সঙ্গে আলাপকালে গল্পকথক নিজের পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি তার সামূহিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়। সংসারে সেই নিঃসঙ্গ নারীর এমন কেউ নেই, যে তাকে বাজার করে দিতে পারে। প্রথম দিনের পরিচয়-সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই গল্পকথকের ধারণা ছিল—এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সেদিনই ঘটবে। কিন্তু সেই বৃদ্ধা যে তার মানবিক আহ্বানের অন্তরঙ্গতায় গল্পকথকের মানসলোকে স্বতন্ত্র স্থান অধিকারে সমর্থ হবে, এমন ভাবনা ছিল তার কল্পনারও অগোচর। গ্রামে গল্পকথকের অবস্থানকালে সকালে তার ঘুম ভাঙতেই ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন সেই নারী উপস্থিত হত তাকে 'গোপাল' সম্বোধনপূর্বক স্নেহবশত বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী উপহার দানের আন্তর্গরজে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম পরিচয়প্রাপ্তির পরবর্তী পর্যায়ে একসময় গল্পকথক কোলকাতায় ফিরে গেলেও ছয় মাসের ব্যবধানে যখন পুনরায় গ্রামে ফিরে আসে, তখন এক সকালে আম নিয়ে তার বাড়িতে বৃদ্ধার আবির্ভাব ঘটে। তার 'গোপাল' সম্বোধন ও অকৃত্রিম মাতৃসুলভ ব্যবহারে গল্পকথকের প্রতিক্রিয়া:

> আমি ওর সম্বোধনের নতুনত্বে কৌতুক অনুভব করলাম, কিন্তু কি জানি কেন বড় ভালো লাগলো। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই, একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাইনি বাল্যকালে মা পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অত বেশি বয়সের স্ত্রীলোক কেউ নেই যে আমাকে 'গোপাল' বলে ডাকে। (১ ॥ ২৯৪)

তবে এককথায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে সৃষ্টি হয় তিক্ততা, যার অন্তরালে রয়েছে গল্পকথকের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক সংস্কারের সংবেদনশীল প্রসঙ্গ। গল্পকথকের জন্য বৃদ্ধা দুধের বন্দোবস্ত করায় সে বিরক্তি প্রকাশের পাশাপাশি এ ঘটনার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারেও তাকে সতর্ক করে। কারণ ব্রাহ্মণ হিসেবে তার পক্ষে মুসলমানের স্পৃষ্ট দুধ গ্রহণের ঘটনা গ্রামে প্রচারিত হওয়ার আশঙ্কায় সে ভীত ছিল। বৃদ্ধা দুধের অর্থ নিতে না চাইলেও গল্পকথক জোরপূর্বক দুধের দাম পরিশোধ করে। তথাপি বৃদ্ধা তার জন্য হরহামেশা পাকা আম, পাতি লেবু, একছড়া কাচকলা বা এক ফালি কুমড়ো নিয়ে আসে। এর মূলে নেই তার অর্থলোভ, বরং রয়েছে গল্পকথকের প্রতি সন্তানসুলভ মাতৃস্নেহ ও অন্তর্গত ভালোবাসা। কিন্তু কখনো কখনো বৃদ্ধার সরল-অনাড়ম্বর মনোভঙ্গির কারণে তাকে গল্পকথকের দ্বারা তিরস্কৃত হতেও হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবার গল্পকথকের বাড়িতে তার শহুরে বন্ধুদের উপস্থিতিতে সে চিড়া নিয়ে সকালে উপস্থিত হলে তাকে গল্পকথক প্রায় অপমানপূর্বক বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে—বন্ধুদের নিকট, এমনকি জ্ঞাতি খুড়োর নিকট অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কায়। তথাপি এর প্রতিক্রিয়ায় বৃদ্ধার মনে কোনো আক্ষেপ বা বিরূপ মনোভাব প্রকাশিত হয়নি। পাঁচ-ছয় মাসের ব্যবধানে পুনরায় গ্রামে ফিরে সে জনৈক নারীর নিকট বৃদ্ধার অসুস্থতা এবং তাকে একবার দেখার জন্য বৃদ্ধার চরম আকুলতা সম্পর্কে অবহিত হয়। জরাজীর্ণ ঘরে অবহেলায় তার দিন অতিবাহিত হয়।

> ঘরখানার সংস্কার হয়নি অনেকদিন, খড় উড়ে পড়েচে চালা থেকে, দড়ি বাখারি ঝুলচে, মাটির দাওয়া নানা স্থানে ভেঙে পড়েচে, বাঁশের খুটি নড়-বড় করচে! বুড়ি শুয়ে আছে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর, মাথায় তেলচিটে মলিন বালিশ। (১ ॥ ২৯৭)।

গল্পকথকের নিকট তার বাৎসল্যময় অভিযোগ — 'তুমি একদিনও এলে না গোপাল- অসুখ হয়েচে তাও দেখতে আস না—'।(১ ॥ ২৯৮)। তাকে দর্শনপূর্বক বৃদ্ধার অবরুদ্ধ আবেগ অশ্রুসিক্ত জলে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠায় সে অনুনয় জানায় — 'গোপাল, যদি মরি আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস'। (১ ॥ ২৯৮)। গল্পকথককে পেয়ে বৃদ্ধা তার প্রতি নাত-জামাইয়ের রূঢ় আচরণ সম্পর্কে শিশুসুলভ সরলতায় অভিযোগ প্রকাশের পাশাপাশি নিজের সংসারের আর্থিক অনটনের বৃত্তান্তও পরিবেশন করে। সেবার বৃদ্ধা ক্রমশই সুস্থ হয়ে ওঠে এবং দুই বছরের ব্যবধানে গল্পকথকের সঙ্গে তার সম্পর্কে তিক্ততা ও অসহিষ্ণু মনোভঙ্গির সৃষ্টি হয়। অবিবাহিত গল্পকথককে সংসারী করার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধা একটি সম্বন্ধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালালে একপর্যায়ে গল্পকথক তাকে রীতিমত তিরস্কার করে। কারণ কখনো কখনো বৃদ্ধার বাৎসল্য ও কর্তব্যজ্ঞান তার নিকট পীড়াদায়ক বিবেচিত হত। এ ঘটনার

ফলে উক্ত সম্বন্ধের ব্যাপারে গ্রামের মানুষ মুখরোচক আলাপের সুযোগ পায়। কিছুদিন পর বৃদ্ধা তার বাড়িতে বাতাবিলেবু নিয়ে আর্বিভূত হলে গল্পকথক কঠোরভঙ্গিতে তাকে স্পষ্ট জানায়— 'দরকার নেই বাতাবি নেবুতে। যাও এখন'। (১ ॥ ২৯৯)। বলাবাহুল্য, বৃদ্ধার অতিমাত্রিক বাৎসল্য ও মমত্ববোধের স্বতোৎসারিত বহিঃপ্রকাশের ঘটনা পরিচিতজনের নিকট গল্পকথককে কখনো কখনো বিব্রত করায় সে এভাবে নির্মম আচরণে বাধ্য হয়। লক্ষণীয়, বৃদ্ধা কখনোই গল্পকথক ও তার মধ্যে বিদ্যমান ধর্মীয় ভেদাভেদের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। অন্তর্গত মমত্ববোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই সে গল্পকথকের নিকট একাধিকবার অপমানিত হয়েও যেচে তার জন্য বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী নিয়ে তার বাড়িতে আসত। এরপর দেড় বছরের ব্যবধানে গ্রামে পুনরায় আর্বিভাবের মাধ্যমে গল্পকথক অবহিত হয় পূর্বরাতেই বৃদ্ধার মৃত্যু সম্পর্কে। স্বাভাবিকভাবেই তার উপলব্ধি ঘটে—

> ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কি ভাবে আহ্বান করে এনেছে। আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি। (১ ॥ ৩০০)।

সেকারণেই বৃদ্ধার অনুরোধ অনুযায়ী কাফনের কাপড়ের অর্থ প্রদানের পাশাপাশি সে বৃদ্ধার কবরে এক কোদাল মাটি দিয়ে তার অতৃপ্ত চিত্তকে প্রশমিত করে। 'সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।' (১ ॥ ৩০০)। ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে উক্ত বৃদ্ধার মাতৃস্নেহের অসামান্য আবেদনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যুবকের প্রতি ভালোবাসার নিঃসংকোচ বহিঃপ্রকাশে এভাবেই তার প্রান্তিকতার অবসান ঘটে এবং মানবতার চিরন্তন আহ্বানে গল্পকথকের মনোভূমিতে সে কেন্দ্রায়ত অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়। বিভূতিভূষণের আধুনিকতা এখানেই যে তিনি মানুষের অকৃত্রিম, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের রূপায়ণে ধর্মীয় কোনো সংকীর্ণমনস্কতায় আবদ্ধ থাকেননি। তাই তিনি এ গল্পে অবলীলায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি গ্রামীণ সমাজের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের আন্তঃমানবিক সম্পর্কের বিন্যাসে হিন্দু পুরাণের যশোদা জননী ও বালগোপাল কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার স্নিগ্ধ, অনুপম ভাবপরিবেশকে ব্রাহ্মণ গল্পকথক ও মুসলমান বৃদ্ধা জননীর চরিত্রসৃজনে নেপথ্যে সংযোজিত করেছেন। যশোদা যেমন মাতৃত্বের আহ্বানে অন্য নারীর পুত্র কৃষ্ণকেই আপন সন্তানের স্নেহবশত কাছে টেনে নিয়েছেন, তেমনিভাবে এ গল্পেও জমির করাতীর স্ত্রীর নিঃসঙ্গ চিত্তলোকে একমাত্র কন্যাকে হারানোর শোকদগ্ধ হাহাকার হয়ত গল্পকথককে পুত্রের আসনে অধিষ্ঠানের মাধ্যমে তার শূন্য হৃদয়ের অপূর্ণতাকে প্রশমনে উদগ্রীব। সাধারণ বিবেচনায়, একজন মুসলমান নারী তার মাতৃস্নেহজারিত বাৎসল্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সচরাচর নিজ ধর্মীয় ও পারিবারিক আবহে বহুল উচ্চারিত সম্বোধনেই অভ্যস্ত। অপরিচিত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যুবকের প্রতি তার 'গোপাল' অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের দেবতা-অবতার সম্পর্কিত সম্বোধন অস্বাচ্ছন্দ্যকর বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এ গল্পে লেখকের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত মানবসম্পর্কে বিদ্যমান শাশ্বত সম্প্রীতি, যা কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার ও আচরিত অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ নয়। লোকসমাজে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে

বহমান পুরাণগুলো সংবেদনশীল শিল্পিমানসে প্রাগ্রসর ভাবনার সৃজনে যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তা সন্দেহাতীত। *মহাভারতের কথা* গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন, 'পুরাণ-কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে—শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে—বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।' [৯] উক্ত পুরাণ বিভূতিভূষণের অবচেতনায় সম্ভবত নিজের অগোচরেই উপ্ত ছিল এবং এ গল্পে উপজীব্য ভাবানুষঙ্গের সূত্রে তা শিল্পিত অবয়ব পেয়েছে, যেমনটি লক্ষ্য করা যায় তাঁর *পথের পাঁচালী-অপরাজিত* উপন্যাসের খণ্ড-পরিকল্পনাগত নামকরণে।

এ গল্পে ব্রাহ্মণ চাকরিজীবী কলকাতাবাসী গল্পকথকের পুনঃপুনঃ গ্রামে প্রত্যাবর্তন ও বৃদ্ধার সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের টানে আবেগ-বাৎসল্য-অভিমানমিশ্রিত সম্পর্কের বন্ধন স্মরণ করায় পালক-সন্তান যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের গোকুলে নির্মল, আনন্দময় বাল্যজীবনের স্মৃতিবহ অনুষঙ্গরাজি। অনিচ্ছা বা ধর্মীয় ব্যবধানের চেয়ে মানবসম্পর্কে বিদ্যমান স্নেহ, মমত্ব, অনুকম্পা ও মাতৃত্বের চিরন্তন আবেদন গল্পকথকের মনোভূমিতে যে 'অভিজ্ঞতা'র জন্ম দিয়েছে, তারই অনুরণন প্রতিধ্বনিত হয় বৃদ্ধার মৃত্যুর পরবর্তী দিন আকস্মিকভাবে তার গ্রামে আবির্ভাবের পর কবরে মাটি দানের ঘটনায়। অতি পরিচিত ভঙ্গিতে সন্তানতুল্য আন্তরিকতায় 'গোপাল' ও 'তুই' সম্বোধনের সমান্তরালে গল্পকথকের তাকে 'তুমি' সম্বোধনে ঘুচে যায় ধর্ম-বর্ণগত বিভেদ, পুনরায় ঘোষিত হয় মানুষের প্রতি উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির নিঃসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ। বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের অহমে ব্রাহ্মণ তার অধস্তন জাতিসমূহের সঙ্গে সর্বদাই নির্দিষ্ট ব্যবধান বজায় রাখার মাধ্যমে অন্যদের ওপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে তৎপর, সামাজিক মর্যাদা অধিকারের অভীপ্সায়। তদুপরি গল্পকথক মহানগর কোলকাতার বাসিন্দা এবং শিক্ষিত যুবক। বাঙালি মুসলমান সমাজে করাতী বা কাঠমিস্ত্রি বা ছুতোরের অবস্থান নিঃসন্দেহে 'আতরাফ' হিসেবে সমাজের তলদেশবর্তী। গল্পে বর্ণিত জমির করাতীর নিঃসঙ্গ স্ত্রী অর্থলাঞ্ছনায় জর্জরিত বলেই অস্তিত্বরক্ষার বিকল্পহীনতায় প্রায় ভিখারিনীর জীবনযাপনে বাধ্য। এ-ছাড়া, নারী হিসেবেও তার অবস্থান নিঃসন্দেহে পুরুষের চেয়ে নিম্নস্তরে, যার প্রমাণ তার প্রতি নাতজামাতার বিবেচনাশূন্য আচরণ। বিভূতিভূষণ অত্যন্ত সচেতনভাবে বাঙালি গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে দুই বিপরীত ধর্মাবলম্বী নর-নারীর আন্তঃসম্পর্কে বিদ্যমান সমাজারোপিত অপরতাবোধের ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখর। তাই হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ গল্পকথকের বিপ্রতীপ অবস্থানে অবনমিত আতরাফ অথর্ব বৃদ্ধার চিত্তলৌকিক গ্রন্থিবন্ধন এ গল্পে পৌরাণিক পরিমণ্ডলে অর্জন করে প্রাতিস্বিক মাত্রা। গ্রামীণ জীবন-বাস্তবতার গতানুগতিক রূপায়ণের পরিবর্তে মানবধর্মের ভাস্বর মহিমার প্রতি লেখকের আগ্রহ গল্পটিতে সংযুক্ত করেছে স্বতন্ত্র আবেদন, যা পাঠকের মনোভূমিতে নতুন চিন্তার আলোড়ন সঞ্চারে অনন্যতার দাবিদার। এ গল্প সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়:

> জাতি-ধর্ম-সমাজের বাইরে অম্লান ভালোবাসা, অকৃত্রিম বাৎসল্যের অসামান্য গল্প 'আহ্বান'। অপূর্ব পবিত্র এই গল্প- মাতৃস্নেহের ধারায় অভিষিক্ত। ... গল্পটিই যেন বিভূতিভূষণের জীবনভাষ্যের প্রতীক–তাঁর সাহিত্যের মর্মবাণী। ধর্ম, সমাজ, শ্রেণীগত বৈষম্য সব কিছু ছাপিয়ে এই যে সমুদ্র-গভীর স্নেহ, মানুষে মানুষে এই যে আত্মীয়তার বন্ধন- বিভূতিভূষণ এরই সাধনা করে গেছেন। 'আহ্বান' গল্প পড়তে পড়তে জমির করাতীর বৃদ্ধা স্ত্রীর মুখ আমাদের চোখের সামনে র‍্যাফাএল্-এর মাদোনায় পরিণত হয়ে যেতে চায়, আজকের শ্রেণীগত ও সাম্প্রদায়িক বিকৃত-বুদ্ধি মুহূর্তে ছায়ার মতো মিলিয়ে যায়।[১০]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়:

> মর্মস্পর্শী গল্প 'আহ্বান'। জমির করাতীর বউ গল্পের কথককে 'গোপাল' বলে সম্বোধন করত। সম্বোধনটি বাৎসল্যরসে সিক্ত। সেই বাৎসল্যরসের কোনও ধর্মীয় সংজ্ঞার্থ নেই। জমিরের বিধবা জরতী জননী- খাঁটি বাঙালিনী। তার স্নেহার্দ্র সম্বোধনটি তার প্রমাণ। বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে কাফনের কাপড় কথক বা লেখকই কিনে দিলেন, কবর দেবার পর সকলে যখন এক এক কোদাল মাটি দিচ্ছে কবরে, তখন শুকুর মিঞা লেখককে বললেন, দাও বাবাঠাকুর, তুমিও দ্যাও, তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠাণ্ডা হবে। তিনি দিলেন এক কোদাল মাটি। লেখকের প্রতি আমাদের নমস্কার অথবা সালাম তখন স্বতঃস্ফূর্ত।[১১]

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়:

> শহুরে গ্রাম্য, হিন্দু মুসলমান, ধনী নির্ধন, ভদ্রলোক চাষালোক–সমস্ত বিভেদের প্রাচীর ভেঙে এক মহান মিলনক্ষেত্রে মিলেছে জমির করাতীর বুড়ী বৌ আর শিক্ষিত হিন্দু নায়ক। 'অ মোর গোপাল', এই আহ্বানে ধ্বনিত হয়েছে মহামিলন সঙ্গীত। এক সমুদ্র গভীর স্নেহে প্লাবিত হয়ে যায় আমাদের মন। শিক্ষিত নাগরিক মনের বিরক্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে বুড়ীর প্রতি নায়কের এক অপরূপ স্নেহ-ভালবাসা। মুসলমান বুড়ীর স্নেহের গ্রাম্য অভিব্যক্তিতে শেষ পর্যন্ত স্নাত ও অভিষিক্ত হয়েছে হিন্দু যুবক। ধর্ম-সমাজ শ্রেণীগত সব বিভেদ ব্যবধানকে ছাপিয়ে উঠেছে মানুষে মানুষে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক, জয়ী হয়েছে মাতৃত্বের মহিমা। বিভূতিভূষণ এক পরিণত শিল্প-সারল্যে রচনা করেছেন এই গল্প। 'আহ্বান' গল্প আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যে স্মরণীয় গল্পরূপে বিবেচনার যোগ্য। গল্পরচনার সমস্ত কৌশলকে সংহরণ করে নিয়ে বিভূতিভূষণ লিখেছেন মাতৃত্বের ধারায় অভিষিক্ত এই গল্প। একে ঘিরে আছে এমন এক শুচিতা, এমন এক মহিমা, এমন এক পবিত্রতা যার সফল শিল্পরূপ বিরলদর্শন।[১২]

জগদীশ ভট্টাচার্য:

> 'আহ্বান' গল্পটি শুধু বিভূতিভূষণের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটি দুর্লভ সম্পদ। হিন্দু-মুসলমানের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা এ গল্পের বিষয়বস্তু। জমির করাতীর জরতী বিধবা আর গল্পের বক্তা নরেশ বাঁড়ুজ্জের চল্লিশ বছরের ছেলেকে নিয়ে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক। বক্তা কলকাতাপ্রবাসী, গ্রামে বাড়িঘর নেই– তবু গ্রামের মায়া ভুলতে পারেননি, তাই মাঝে মাঝে আসেন। ... 'আহ্বান' গল্পে বিভূতিভূষণ বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্যের যে সুন্দর আলেখ্য রচনা করেছেন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দিনে তা যেমন আনন্দ-নিষ্যন্দী তেমনি সুপবিত্র। বাংলা কথাসাহিত্যে এ গল্পের দ্বিতীয় নেই।[১৩]

'বিপদ' (*অসাধারণ*, ১৯৪৬) গল্পে অস্তিত্বের তাড়নায় বাধ্যগত এক প্রবঞ্চিত গৃহবধূর পতিতা হিসেবে অবনমনের অন্তরালে নারীর প্রতি রক্ষণশীল সমাজের অবক্ষয়িত দৃষ্টিভঙ্গি ও

সুবিধাবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশের পাশাপাশি এ প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে- যে নারীকে তার অনিচ্ছাকৃত প্রতিকূলতার পরিণতিতে উদ্ভূত বিপন্নতার অন্তিম লগ্নে তথাকথিত সমাজ আশ্রয় দিতে অক্ষম, তাকে অবমূল্যায়নের যৌক্তিকতা কী? ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী রামচরণ বৈষ্ণবের সতের বছরের বিবাহিতা ও শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত কন্যা হাজু মলিন বস্ত্রে দুই বছরের ছেলে কোলে নিয়ে যখন গল্পকথক লেখকের নিকট গৃহ পরিচারিকা হিসেবে কাজের সুযোগ পাওয়ার অনুনয় দাবি করে, তখনও তার পক্ষে হাজুর বিপন্নতা ও অসহায়ত্ব অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। কর্মব্যস্ততার অবসরে সে অবহিত হয়, হাজুর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা চরম আর্থিক সংকটে জর্জরিত। নিজেদের অন্নের সংস্থান না হওয়ায় তার স্বামী তাকে পিতৃগৃহে পাঠায়। তবে এ-ক্ষেত্রে তার ওপর আরোপিত হয় আহারের প্রতি বুভুক্ষুতা ও চুরির অপবাদ — 'ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাড়ি থেকে খায়। দুধের সর বসবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েছে।' (১ ॥ ২৬২)। অথচ তার পিতৃগৃহের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। পাঁচ-ছয় বছর পূর্বে রামচরণের মৃত্যু ঘটায় সংসারের দায়ভার হাজুর মায়ের ওপর আরোপিত হয়। তখন সে অন্যের বাড়িতে ঝি-গিরি করে কোনো মতে অপোগণ্ড দুই ছেলেকে প্রতিপালন করে। এমতাবস্থায় এক বছর ধরে মাতৃআশ্রয়ে সন্তানসহ অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নিজের ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা হিসেবে কখনো ভিক্ষা, কখনো বা চৌর্যবৃত্তিতে বাধ্য হতে হয়। গল্পকথকের বাড়িতে কাজ না পেয়ে ভিক্ষা নিয়ে যাবার একপর্যায়ে আকস্মিকভাবে তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে খাদ্যের প্রতি হাজুর অনুরক্ত মনোভঙ্গি। দরিদ্র পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ায় তার উদরপূর্তির সুযোগ জোটে না। দৈবাৎ সে-রকম সুযোগ এলে সে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহারে তৎপর হয়ে ওঠে—

> একদিন দেখি রায়দের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউমাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ খাইতেছে। যে ভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, 'হাউমাউ' কথাটি সুষ্ঠু ভাবে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটা আমার মনে আসিল। অতি মলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি ওর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার উপরে দু-এক টুকরো পেঁপে ও একখণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রায়-বাড়ি কলসী-উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল। (১ ॥ ২৬১)

তার চরিত্রের একটি নেতিবাচক দিক হল চৌর্যকর্ম। সুযোগ পেলেই সে কারো বাড়ি থেকে চাল চুরি করে, কখনো বা দুধ চুরি করে খায় এবং সে কারণেই মুখুজ্যে বাড়ির ঝিয়ের কাজ থেকে তাকে বিতাড়িত হতে হয়। তার মায়ের পক্ষেও তার উদারপূর্তির সাধ মেটানো অসম্ভব হওয়ায় তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দেয়া হয়, 'আমি কনে পাবো? তুই নিজেরটা নিজে করে খা।' (১ ॥ ২৬১)। সে-কারণেই তাকে গ্রামের পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে ভিক্ষা করতে হয়। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও সুযোগ পেলেই সে চুরি করে। তাই মধু চক্রবর্তীর দ্বারা সে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। একদিন ভিক্ষার সুযোগে সে 'লঙ্কা গাছ থেকে কোঁচড় ভরে কাঁচা পাকা ঝাল চুরি করেছে প্রায় পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে ...

বাইরের উঠানের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙছে।' (১ ॥ ২৬২)। অবশেষে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিঘাতে যখন 'ধান চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরিকে মুষ্ঠি ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ', (১ ॥ ২৬২) তখন হাজুকে ছেলে কোলে নিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাগিদে পুনরায় পথে-ঘাটে ভিক্ষা করতে হয়। এমতাবস্থায় তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন গল্পকথক একদিন তার উদরপূর্তির অভিলাষ পূর্ণ করার সুযোগ দেয়ায় তার প্রতিক্রিয়া— 'হাজু খুব খুশি। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশি হয় জানি। কাঁটালতলার ছায়ায় রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়।' (১ ॥ ২৬২)। কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে আহারের বন্দোবস্ত সম্পন্ন করার জন্য সে যে পথে অগ্রসর হয়, তা তার পাড়ার 'বোষ্টম বৌ'র নিকট বিস্ময়কর 'কাণ্ড' হিসেবে প্রতিভাত হলেও তা হাজুর জীবনের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্ত। ক্ষুধা মানুষের আদিমতম মৌলিক প্রবৃত্তি, যার তাড়নায় মানুষ হারাতে পারে তার মনুষ্যত্ববোধ্যও। হাজুকে অবশ্য তা পরিত্যাগ করতে হয়নি। তবে উদরপূর্তির নিশ্চিত সংস্থানের জন্য তাকে গ্রাম ছেড়ে আসতে হয় শহরে, ভিখারিনী থেকে সে অবলীলায় স্খলিত হয় পতিতায়। আদিমতম মৌলিক প্রবৃত্তি জঠরাগ্নির কবল থেকে রক্ষা পেতে সে কামুক পুরুষের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির বাধ্যবাধকতায় পতিতাপল্লির বাসিন্দা হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর হাজুকে নতুনভাবে উদরপূর্তির সংকটে বিপন্ন করতে পারেনি। বরং এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়ই হাজু নারীসুলভ সংকোচ, লজ্জা ও সংস্কারকে উপেক্ষার মাধ্যমে অন্যদের দয়া-দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি ও অনুকম্পার পাত্রী হওয়ার অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি অর্জন করে। এ পর্যায়ে সে অন্যের দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা বা চুরি করে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে কম্পিত নয়। সমাজে প্রচলিত সতীত্বের ধারণা অনুযায়ী দেহকে বিক্রির মাধ্যমে হয়ত হাজু সতীত্বের অবমাননা ঘটায়। তবু সে এ পর্যায়ে আত্মনির্ভরশীল, নিজের সকল সাধ-আহ্লাদ অবলীলায় মেটাতে সক্ষম। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আকস্মিকভাবে এক মহকুমা শহরে গল্পকথকের আগমন ও নাটকীয়ভাবে হাজুর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রাপ্তির ঘটনায়। হাজুর জীবনের অন্ধকারময় পর্বে (অতীত) স্বল্প সময়ের জন্য আলোর ছটা এলেও (পতিতাবৃত্তি গ্রহণে) এর আড়ালেই নিহিত রয়েছে জীবনের অতলস্পর্শী অন্ধকার (বিগতযৌবনা হাজুর ভবিষ্যৎ পরিণতি)। প্রতীকী তাৎপর্যে এ বিষয়টি আভাসিত হয়েছে পতিতা হাজুকে গল্পকথকের প্রথম দর্শনের মুহূর্তটিতে। 'আধ অন্ধকার গলিপথে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙিন কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রং অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।' (১ ॥ ২৬৩)। গল্পকথকের নিকট অপরিচিত পতিতা হাজু পিতৃপরিচয় প্রদানের পাশাপাশি অবলীলায় দাম্ভিক কণ্ঠে নিজের অকল্পনীয় প্রতিষ্ঠার উচ্ছ্বাসে পুলকিত। জীবনে এই প্রথমবার তার আচরণে প্রকাশিত হয় আত্মবিশ্বাসযুক্ত পরম পরিতৃপ্তি।

> আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।
> এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন সে জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য সে গর্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড় শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কি কম কথা, না যার তার ভাগ্যে তা ঘটে? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুক তার কৃতিত্বের বহরখানা। (১ ॥ ২৬৩)

ব্রাহ্মণ গল্পকথক সেই ক্লেদাক্ত ঘরে প্রবেশের প্রস্তাবে অসম্মত হলেও নেহাতই মানবিক বিবেচনার কারণে অবশেষে তাকে হাজুর কক্ষে উপস্থিত হতে হয়। শুধু তাই নয়, হাজুর পুনরোনুরোধে তাকে পরিবেশিত জলখাবারও গলাধঃকরণ করতে হয়। এভাবেই তার ভাবনায় প্রতীয়মান হয় জীবনের বাঁক পরিবর্তনের সমান্তরালে হাজুর নারীত্বের স্ফুরণ ও আত্ম-আবিষ্কারের বিস্ময়বিমুগ্ধ অনুভবের স্বরূপ—

> কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ ও পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা-পিরিচে–যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। (১ ॥ ২৬৪)

নিজের অবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন ঘটলেও হাজু তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল, সচেতন। সে-কারণেই সে গোপনে মাকে কাপড় ও টাকা পাঠালেও সেগুলো তার মা পাচ্ছে কি না, সেই চিন্তা তার সরল মনে আসেনি। গল্পকথকের নিকট টাকা পাঠানোর মাধ্যমে সে মায়ের কষ্ট লাঘবে সচেষ্ট। পাশাপাশি জননী হিসেবে মায়ের নিকট প্রতিপালিত শিশুপুত্রকে নিজের কাছে নিয়ে আসার পরিকল্পনাও তার রয়েছে। নারীসুলভ সরলতা, মমত্ববোধ ও আন্তরিকতা তার স্বভাবের গৌরবান্বিত দিক। গল্পকথকের অভিজ্ঞ ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে হাজুর নিকট স্বগ্রামের প্রতারক, ভণ্ড, কামুক পুরুষদের আগমন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চরিতার্থতার প্রসঙ্গটি ধরা পড়লেও এতে হাজুর কোনো আক্ষেপ নেই। পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে অবলম্বনে বাধ্য হলেও সততা ও মনুষ্যত্ববোধের মানদণ্ডে সে অবলীলায় অতিক্রম করে যায় সামাজিক অবজ্ঞা, নৈতিক অশুচিতা ও 'পতিতা'র অভিধায় আরোপিত অপরতাবোধ। প্রান্তিক অবস্থানে থেকেও সে হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরতার অনন্য দৃষ্টান্ত। গৃহবধূ থেকে পতিতাবৃত্তিতে অবনমনের বাধ্যবাধকতায় যে নারীর সামাজিক অবস্থান প্রান্তিকতর, তার উপযোগিতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তখনো গ্রহণযোগ্য—ভোগবৃত্তিকে যথেচ্ছভাবে চরিতার্থ করার অভিলাষে। পিতৃহীন পরিবারের বোঝা হাজুর বিয়ে সম্পাদিত হলেও গৃহবধূর মর্যাদা ও অধিকার সে স্বামীর কাছে পায়নি। বরং তার অন্নপ্রীতিকে দোহাই দিয়ে হাজুকে বিতাড়িত হতে হয় স্বামীগৃহ থেকে। নিজের ও শিশুপুত্রের ব্যয়ভার মেটানোর সঙ্গতি না থাকায় মায়ের কাছেই হাজুকে আশ্রয় গ্রহণ ও প্রাণধারণের তাগিদে কখনো দাসীবৃত্তি, অতঃপর আরো শোচনীয় পরিস্থিতিতে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারস্থ হতে হয়। এ সমাজে আর্থিক সঙ্গতিই যেহেতু মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূর্ণ হওয়ার প্রধানতম শর্ত, তাই হাজুও অবশেষে অন্যের গলগ্রহ হওয়ার অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসে শরণাপন্ন হয়

পতিতাবৃত্তির। এ পর্যায়ে নারীর প্রতি সমাজারোপিত তথাকথিত সতীত্বের ধারণা কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচ্য হতে পারে। কারণ এটিও তার প্রান্তিকতর অবস্থান নির্ধারণের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। হাজু যতদিন গৃহবধূ হিসেবে গ্রামে পরিচিত ছিল, ততদিন তার চারিত্রিক শুদ্ধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তবু মানুষ হিসেবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার ও স্বীয় সন্তানসহ উদরপূর্তির জন্য হাজুর প্রচেষ্টা তখনো অপূর্ণই থেকে যায়। সুতরাং হাজুর মত পারিবারিকভাবে বিপন্ন, সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত নারীর নিকট সতীত্বের বা চারিত্রিক শুদ্ধতার চেয়ে অন্নসংকটের সমাধান অধিক জরুরি। সে-কারণেই মন্বন্তরের নির্মম অভিঘাত গ্রামীণ জীবনে বিপন্নতা সঞ্চারে সমর্থ হলেও এরই প্রতিক্রিয়ায় হাজুর জীবনে ঘটে অভাবনীয় পরিবর্তন। খাদ্যাভাব হাজুর জীবনে যেহেতু অতি পরিচিত সংকট, তাই মন্বন্তর হাজুকে পীড়িত করেনি। বরং গ্রামীণ জীবনের সব সংস্কার, সনাতন মূল্যবোধের শৃঙ্খল অতিক্রম করে মহকুমা শহরে অবলীলায় সে হয়ে ওঠে আধুনিক মনোভাবাপন্ন, দ্বিধাশূন্য এক নাগরিকায়, অথবা তার উচ্চারিত 'নটী'তে। স্বগ্রামের যে পুরুষরা একসময় ভিখারিনী হাজুর প্রতি অনুকম্পাসূচক মনোভঙ্গি পোষণ করত, অর্থের বিনিময়ে তারাই এখন হাজুর খদ্দের। অন্য দিক থেকে চিন্তা করলে, হাজুও এ পর্যায়ে কারো অনুনয়প্রার্থী নয়। ক্ষুদ্রপরিসর গ্রামে নারীর প্রতি আরোপিত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি শহরে অচল বলেই হাজুর ব্যক্তিত্বে ঘটে অভাবিত পরিবর্তন, জীবনধারায় সংযুক্ত হয় জীবনের অতৃপ্ত সাধ-আহ্লাদ পরিতৃপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা। এরই পরিণতিতে তার সামাজিক অবস্থান চরমভাবে অবনমিত হয়। যে সমাজে নারীর ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা সর্বদাই রক্ষণশীল সমাজের মর্জিমাফিক নির্ধারিত, সেখানে শেষ পর্যন্ত গৃহবধূ থেকে পতিতা—কেউই যে পুরুষের সঙ্গে প্রতিতুলনায় প্রান্তিকতার আগ্রাসন থেকে মুক্ত নয়, এ গল্পের হাজু তারই অসামান্য দৃষ্টান্ত। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত —

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়:

> ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় গ্রামের বৈষ্ণবের মেয়ে হাজু শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। তার এই অধোগতিকে বিভূতিভূষণ ধিক্কার দেননি। বরং দেখেছেন, গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে তার ক্ষুধা মিটেছে, তার জীবনের বহু অপূর্ণ বাসনা-কামনা পূর্ণতা লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে রূপোপজীবিনীর বিচিত্র রূপায়ণ আমরা পেয়েছি—পেয়েছি সহানুভূতি পেয়েছি জ্বালা—পেয়েছি সমাজ-জিজ্ঞাসার 'pointed finger' কিন্তু এমন সহজভাবে হাজুর অপরাধের এমন সত্য সমর্থন বাংলা সাহিত্যে আগে আর আমরা দেখেছি বলে আমার মনে হয় না। বিভূতিভূষণ সংযত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সৎসাহসের যে বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না—তাঁর শান্ত নম্রতার মধ্যে ... বজ্রশক্তি সংহত ছিল ... মানুষের প্রতি সহজ ভালোবাসাই হাজুর পদস্খলনকে এমনভাবে সমর্থন করবার শক্তি বিভূতিভূষণকে দিয়েছে। ... তাই কলঙ্কিনী হাজু আমাদের মমতারই অভিসেচন লাভ করে— প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগরের' মেয়েটির মতো অপরিসীম শূন্যতায় হারিয়ে যায় না।[১৪]

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য:

> একটি পতিতাকে নিয়ে আলোচ্য গল্পটি রচিত হয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ এখানে কোন পতিতার জীবন-কাহিনী অঙ্কন করেন নি। সমাজের সমস্ত দিক থেকে অবহেলিত এবং

> অধঃপতিত রমণীর মনের মধ্যেও যে স্নেহ, মমতা এবং ভালবাসা আছে এই গল্পটির মাধ্যমে বিভূতিভূষণ তাই চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। আসলে কোন চরিত্রের কুৎসিত বা ঘৃণ্য দিকটি বিভূতিভূষণের কাছে কখনোই বড় হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে নারীচরিত্রের ক্ষেত্রে তা একেবারেই ঘটে না। তাই 'বিপদ' ছোট গল্পের নায়িকা হাজু গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করলেও সে লেখকের সহানুভূতির পাত্র হয়েছে। শিশুসুলভ সারল্য বিভূতিভূষণের অঙ্কিত অধিকাংশ চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ... সমাজের অধঃপতিত, দরিদ্র মানুষের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি বিভূতিভূষণের সহজাত ছিল তাই তাঁকে হাজু চরিত্রটি সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে সাহায্য করেছে। ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য হাজুকে শেষ পর্যন্ত এই ঘৃণ্য জীবিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেই তার উদরের ক্ষুধা মিটেছে, জীবনের অনেক অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাই লেখকের পক্ষে তাকে দোষ দেওয়া সম্ভবপর হয়নি।[১৫]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অস্তিত্বসংকটে বিপন্ন হাজুর প্রতি লেখকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা সত্ত্বেও পরিস্থিতির শিকার হয়ে তার পতিতাবৃত্তিকে 'অপরাধ', ও 'পাপ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র গল্প বিশ্লেষণপূর্বক আমরা দেখিয়েছি, হাজুর মত নারীর পতিতাবৃত্তি অবলম্বনের বিষয়টি স্বৈরিণী হিসেবে তার যথেচ্ছ স্বাধীন মনোভঙ্গি ও সামাজিক অনুশাসন-বহির্ভূত মদমত্ততার অনুরাগপুষ্ট নয়। গৃহবধূ থেকে কুলবধূতে তার স্খলনের মূলে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছে পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ ও মন্বন্তরের অভিঘাত; সর্বোপরি পেটের দায়ে অন্য বৃত্তি গ্রহণের বিকল্পহীনতা। ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ প্রণয়নের মৌল উদ্দেশ্যই হল সমষ্টিমানুষের হিত সাধন। যেখানে হাজুর মত নারীর পরিশ্রমের বিনিময়ে সম্মানসূচক জীবিকা নির্বাহের কোনো সুযোগ নেই, সেখানে পতিতাবৃত্তি ব্যতীত তার একমাত্র বিকল্প হল আত্মহত্যা অর্থাৎ জীবনবিমুখতা বা পলায়নপর মনোভঙ্গি। কিন্তু জীবনের শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হাজুর চেতনালোকে এর স্থান নেই। বরং প্রবল জীবনতৃষ্ণা তার স্বভাবের বিশিষ্ট দিক। পিতৃগৃহে যে সাধ অপূর্ণ ছিল, আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সে তা পরিপূর্ণ করতে অভিলাষী। বৈষম্যপূর্ণ সমাজে নিজের দেহ বিক্রিপ্রাপ্ত অর্থটুকুও তার থাকে না। দরিদ্র মায়ের জন্য সমব্যথী হাজু গোপনে টাকা পাঠালেও তা যথাস্থানে পৌঁছে না, এমনকি তাকে যথেচ্ছ ভোগ করেও প্রতারক, লম্পট পুরুষরা তা স্বীকারে অসম্মত। সে-কারণেই বিভূতিভূষণ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজের অন্তেবাসী, ঘৃণ্য ও অবজ্ঞাত পতিতা নারীকেই উচ্চকিত করেছেন, যে মাতৃত্বের মহিমা ও কন্যাসুলভ ভালোবাসার সহজাত গুণে অর্জন করে লেখক ও সংবেদনশীল পাঠকের হৃদয়। পূর্বোক্ত সমালোচকের অভিমত আমাদের নিকট তাই যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ বিবেচিত হয়নি।

উপর্যুক্ত গল্পসমূহে গ্রামীণ পরিসরে অবস্থানরত নারীর প্রান্তিকতার স্বরূপ বিস্তৃত পরিসরে বিশ্লেষিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী শুধু পুরুষের দ্বারাই অপরতাবোধে আক্রান্ত নয়। বরং রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্রের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে প্রণীত বিভিন্ন প্রথা-মূল্যবোধ ও সংস্কারের শৃঙ্খলে পিষ্ট নারীর অপরতাবোধ কখনো বা তার গৃহ-পরিবারসংলগ্ন অন্য নারীর

দ্বারাও আরোপিত হয়। এভাবেই সেই সমাজে নারীর অবনমন তাকে ক্রমশই প্রান্তিকতর অবস্থানে বিচ্যুত করে। যেহেতু এ সমাজে নারীর পক্ষে স্বাধীনভাবে অবস্থান নিষিদ্ধ এবং আজীবন কোনো পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থাকার বাধ্যবাধকতা তার ওপর যুগ যুগ ধরেই প্রযুক্ত, তাই প্রাপ্য অধিকারবোধ ও মর্যাদার চেয়ে বরং কোনোমতে অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা প্রায়শই তার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর প্রান্তিকতার রূপরেখা নির্দেশের পাশাপাশি বিভূতিভূষণ বাঙালি নারীর আত্মমর্যাদাবোধ ও তেজস্বী মনোভঙ্গির চিত্রও বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করেছেন। কেননা, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে জীবিকা নির্বাহের বাধ্যবাধকতা ও আত্মসম্ভ্রম রক্ষা—এ দুই বিবেচনায় নারীর অনমনীয়, প্রতিবাদী অবস্থান অনস্বীকার্য। যেহেতু শোষিত ও নিষ্পেষিত হওয়ার একপর্যায়ে নিম্নবর্গের মানুষের চেতনালোকে উচ্চবর্গের প্রতি ঘৃণ্য ও বিরুদ্ধ মনোভঙ্গির স্ফুরণ দুর্বার রূপ ধারণ করে, তাই অবহেলিত নারীও পরিবার, সংসারের বৃত্তাবদ্ধ বলয়কে উপেক্ষার মাধ্যমে কখনো তার প্রতিস্পর্ধী মানসিকতার বাস্তবায়নে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সমাজের প্রান্তিক নারীর অসহায়ত্ব ও লাঞ্ছিত জীবনচিত্রই শুধু নয়, বরং তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ, প্রিয়জনের জন্য সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুঃসহ যন্ত্রণাকে অবলীলায় মেনে নেয়ার পাশাপাশি রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্রের আরোপিত রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও জরাজীর্ণ সংস্কারকে অস্বীকারপূর্বক তার স্বাধীন মনোবৃত্তির রূপায়ণও বিভূতিভূষণের শিল্পিমানসের প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য।

তথ্যনির্দেশ

১. গল্পটির বাস্তব পটভূমি সম্পর্কে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে মৌসুমী পালিত জানিয়েছেন —

> 'উপেক্ষিতা' গল্প প্রকাশের কিছুকাল পরেই 'প্রবাসী' পত্রিকার পক্ষ থেকে আরেকটি গল্প চাওয়াতে (বিভূতিভূষণ) "উমারানী" নামে দ্বিতীয় গল্প পাঠালেন। গল্পটি ১৩২৯-এর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রাম্য-ঘোঁট পাকানো কায়দায় প্রচার করা হয় "উপেক্ষিতা"র নায়িকা নিভাননী হলে "উমারানী" নিশ্চয়ই নিভাননীর বারো বৎসর বয়সী কন্যা অন্নপূর্ণা ওরফে ফুলি। এই ঘটনার বিষয়টি এত মুখরোচক কায়দায় প্রকাশ করা হল যে সরল কবি-স্বভাব মানুষটি কাজে ইস্তফা দিলেন। অথচ "উমারানী" গল্পটি ছিল একটি সরল দুঃখিনী বালিকাবধূর করুণ কাহিনী। (*আমাদের বিভূতিভূষণ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭, পৃ. ২৫)

২. বিভূতিভূষণের গল্পে "মৃত্যু", *বিভূতিভূষণের ছোটগল্প : আকাশ, মাটি, পাথর*, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০০০, পৃ. ৭৭-৮০

৩. *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (নবম খণ্ড), দ্বিতীয় প্রকাশ : অগ্রহায়ণ : ১৪০২, পৃ. ৩৫৯-৩৬০

৪. বিভূতিভূষণের গল্পে "মৃত্যু", *বিভূতিভূষণের ছোটগল্প : আকাশ, মাটি, পাথর*, পৃ. ৮৭, ৯০

৫. *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : ২০০০, পৃ. ১৩৬-১৩৮

৬. *রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্প সমীক্ষা,* কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ২০১১, পৃ. ৬০-৬২

৭. *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (নবম খণ্ড), পৃ. ৩৫৯

৮. *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, পৃ. ১৪৫, ১৪৮-১৪৯

৯. উদ্ধৃত, সৈয়দ আকরম হোসেন, 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত : শৈলিবিচার', *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭, পৃ. ৮০

১০. *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (নবম খণ্ড)*, পৃ. ৩৬১-৩৬২

১১. 'সরাটির চরের ঝিঙে ফুল', *আলাপ : সংলাপ : সম্ভাষ*, পৃ. ৯৭

১২. *কালের পুত্তলিকা,* কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৯৯, পৃ. ২৩৮

১৩. 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী,* পৃ. ২০০-২০১

১৪. *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (নবম খণ্ড)*, পৃ. ৩৬৩

১৫. *ছোটগল্পে ত্রয়ী : তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৮, পৃ. ১২২-১২৩

বি.দ্র. বিভিন্ন গল্পের উদ্ধৃতি হিসেবে মূলপাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা 'গল্পসমগ্রে'র দ্বারস্থ হয়েছি। এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত গল্পসমূহের মূল পাঠের সঙ্গে *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্রের* খণ্ডসংখ্যা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা শুধু সংক্ষেপে নির্দেশিত। যেমন- *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্রের* প্রথম খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠা বোঝাতে লেখা হয়েছে '১ ॥ ৩০'।

এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত গল্পসমূহের উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য:

বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র (১ম খণ্ড): তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতেন্দ্রনাথ রায় ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা.) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৩

বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড): তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতেন্দ্রনাথ রায় ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা.) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৩

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

সামাজিক জীবনে বৃহদ্ধর্মপুরাণের ভূমিকা

বিথীকা বণিক*

সারসংক্ষেপ

পুরাণ বলতেই আমরা শুধু অতীত কাহিনীকে বুঝি। কিন্তু আসলে তা নয়। পুরাণেরও রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও মানবিক মূল্যবোধ। মহাপুরাণ ও উপপুরাণ ভেদে পুরাণ দুই প্রকারের। বৃহদ্ধর্মপুরাণ উপপুরাণের শ্রেণিভুক্ত। এই পুরাণটিতে শুধুমাত্র কাল্পনিক কিংবা দেব-দেবীর কাহিনীই বর্ণিত হয়নি। এতে বিবৃত হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক। মানবিক মূল্যবোধের সঠিক দিক নির্দেশনায় আলোকিত হয়েছে পুরো পুরাণ গ্রন্থটি, যা আমাদের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভূমিকা

পুরাণ শব্দের অর্থ প্রাচীন বা পুরাতন। বেদ ও বেদোত্তর যুগের ইতিহাস, আখ্যায়িকা, উপকথা, ধর্মীয় আলোচনা ইত্যাদি বহু বিষয় একত্র করে রচিত যে মিশ্র গ্রন্থ, তাকেই পুরাণ বলে।[১] এর লক্ষণ পাঁচ থেকে একাদশ সংখ্যক হয়ে শেষাবধি অসীমের মধ্যে পৌঁছেছে। প্রথম পর্যায়ে বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণে পাঁচটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো পুরাণের অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এগুলো হলো- সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নবসৃষ্টি), বংশ, দেবতা-ঋষিদের বংশাবলী মন্বন্তর (মনু+অন্তর অর্থাৎ এক এক মনুর শাসনকাল) এবং বংশানুচরিত (রাজবংশের চরিতকথা)।[২] ভাগবতপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দশটি লক্ষণ এবং মৎস্যপুরাণে এগারোটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে।[৩] পুরাণের দ্বিধা বিভক্তি রয়েছে। যেমন– মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। অপেক্ষাকৃত আগে রচিত পুরাণসমূহকে মহাপুরাণ এবং পরে রচিত পুরাণসমূহকে উপপুরাণ বলা হয়। মহাপুরাণের সংখ্যা আঠারো এবং উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারো। তবে বিভিন্ন মতানুযায়ী উপপুরাণ প্রায় একশ'র কাছাকাছি। আঠারোটি মহাপুরাণের মধ্যে যেমন ভাবগতপুরাণ শ্রেষ্ঠ, ঠিক উপপুরাণের মধ্যেও বৃহদ্ধর্মপুরাণ শ্রেষ্ঠ। নামকরণ দেখে মনে হয়, যে পুরাণে ধর্ম সম্পর্কে বৃহৎ বা ব্যাপকভাবে আলোচনা রয়েছে, তাই বৃহদ্ধর্মপুরাণ। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় বৃহৎ+ধর্ম=বৃহদ্ধর্ম। কিন্তু পুরাণটির বিষয়স্তর দিকে তাকালে তা সম্পূর্ণ দৃশ্যমান নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ তিনটি খণ্ডে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিভক্ত (পূর্ব, মধ্যম ও উত্তর) এবং এর তিনটি খণ্ডে মোট অধ্যায়সংখ্যা একাশিটি। তন্মধ্যে পূর্বখণ্ডে ত্রিশ, মধ্যমখণ্ডে ত্রিশ এবং উত্তরখণ্ডে একুশটি অধ্যায়সহ এতে মোট ৫১৬১টি শ্লোক রয়েছে। উল্লেখ্য, পুরাণের (মহাপুরাণ ও উপপুরাণের) রচয়িতা হিসেবে পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের নাম বলা হয়ে থাকে। এ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। তবে মূল পুরাণ যে একটি ছিল, সে ব্যাপারে অনেক পণ্ডিতই একমত।

পুরাণের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বৃহদ্ধর্মপুরাণেও সর্গ বা সৃষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রতিসর্গ-লক্ষণটি পূর্বখণ্ডের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এবং বংশ ও মনুদের শাসনকাল বর্ণিত হয়েছে পূর্ব ও মধ্যম খণ্ডে। বংশানুচরিতের মধ্যে সগর, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকথাচরিত বর্ণিত। এ বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, বৃহদ্ধর্মপুরাণটি একটি পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত পুরাণ। এ ছাড়া মৎস্যপুরাণে উলি–খিত এগারোটি লক্ষণের মধ্যে এই পুরাণে উৎপত্তি (পীঠোৎপত্তি, গঙ্গোৎপত্তি, নৈমিষারণ্যোৎপত্তি, পুরাণ- রামায়ণোৎপত্তি), প্রলয় (সগরবংশ ধ্বংস); দানধর্ম; বর্ণাশ্রম বিভাগ; দেবতাপ্রতিষ্ঠা, লক্ষ্মীর শিবপূজা ও শিবস্তব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকর্তৃক শক্তিস্তব, অদিতির বিষ্ণুস্তব, গঙ্গার শিবপূজা; গণেশজন্ম বিবরণ; ব্রহ্মাকৃত দেবীস্তব, শ্রীরামের দেবীপূজা ও বরলাভ, বৃক্ষলতা; ঋষিদের বর্ণনা রয়েছে।

পুরাণের পঞ্চলক্ষণের বাইরেও বৃহদ্ধর্মপুরাণে অনেকগুলো লক্ষণই রয়েছে, যেগুলো ভাগবতপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের দশবিধ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে বৃহদ্ধর্মপুরাণ নিঃসন্দেহে পুরাণের বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও একে উপপুরাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মহাপুরাণসমূহের মধ্যে যেমন ভাগবতপুরাণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, তেমনি উপপুরাণের মধ্যে বৃহদ্ধর্মপুরাণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।[৪] বৃহদ্ধর্মপুরাণ সম্পর্কে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত মরিস উইনটারনিট্স্ (Maurice Winternitz) তাঁর বিখ্যাত *A History of Indian Literature* (খণ্ড-১) গ্রন্থে বলেছেন-

> The Brhad-Dharma Purāna is consists of first, middle and last khanda and "the Great Purāna of the Duties", which appears as the eighteenth in a list of the Upapurānas, only devotes the beginning of its section, and its last section to Dharma, with the glorification of which it begins. The greater portion of the first section is in the form of a conversation between the Devi and her two friends Jayā and Vijayā, which gives it a Tantric stamp. In the opening chapters the duties towards one's percents especially the mother and the Gurus in general are inculcated in great detail. The last section deals with the duties of casts and Aśrams, the duties of women, the adoration of various gods, the festivals of the year, the worship of the sun, the moon and the planets, with the Yugas, the origin of evil and wickedness in the world (III, 12) and with the inter-mixture of castes (III, 13-14)।[৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে বৃহদ্ধর্মপুরাণে তিনটি খণ্ড এবং ৮১ টি অধ্যায় রয়েছে। ধর্মবিষয়ক[৬] আলোচনা নিয়ে অনেকগুলো অধ্যায় থাকলেও আমাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে,

যেমন সঠিকভাবে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশে এই পুরাণ প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে এই পুরাণ কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে, তা বিশে–ষণ করাই মূলত আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।

(১) নান্দী: বৃহদ্ধর্মপুরাণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়টি মঙ্গলাচরণ দিয়ে শুরু হয়েছে। যে-কোন সাহিত্য সৃষ্টিতে যেমন নাটক, কাব্য, মহাকাব্য কিংবা যে-কোন গ্রন্থের শুরুতে নান্দী ব্যবহার করা হয়। নান্দী অর্থাৎ যাতে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের আশীর্বাদযুক্ত বাক্য সর্বদা প্রযুক্ত হয়, তার নাম নান্দী।[৭] নাটক, যাত্রা, কাব্যাদির শুরুতে মঙ্গলবাচক শ্লোক ব্যবহৃত হয় গ্রন্থটির সর্বসাফল্য কামনা করে। শুধু তাই নয়, আমরা দৈনন্দিন জীবনেও এই 'নান্দী বা মঙ্গলবাচক শব্দ ব্যবহার করে থাকি। যেমন সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ 'নমস্কার' বলেন, মুসলমানগণ বলেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম্'। আবার একজন শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেন, তখন তিনি শিখনকার্যের প্রারম্ভে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কুশল বিনিময় করেন। এই শিষ্টাচারগুলো মূলত নান্দীরই ব্যবহার, যা আমাদের নিত্যদিনের সদাচরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৃহদ্ধর্মপুরাণের নান্দী হলো-

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জময়মুদীরয়েৎ ॥

অর্থাৎ- নারায়ণ, নর, নরোত্তম (রাজা/ শ্রেষ্ঠ মানব), দেবী, সরস্বতী (বিদ্যার দেবী) এবং ব্যাসদেবকে (পুরাণের রচয়িতা) নমস্কার করে জয়গ্রন্থটি পাঠ করবে।

(২) পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপালন: এই পুরাণের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'পিতৃমাতৃভক্তি কীর্ত্তন' নামক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে ৪৭টি শ্লোক পিতামাতাসহ বড় বোনের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত তা বলা হয়েছে। গুরুজন বলতে এই পুরাণে বলা হয়েছে— মাতা, পিতা, আচার্য, গুরু, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতামহ, ভূস্বামী (রাজা), মাতুল, পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতার কনিষ্ঠভ্রাতা, নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পিতৃস্বসা (পিসিমা), মাতৃস্বসা (মাসিমা), এঁরা গুরুজন। পিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে— পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা প্রীতিযুক্ত হলে সমস্ত দেবতাই সন্তুষ্ট হন। পিতাকে কষ্ট দিলে সেই সন্তানের বিশেষ করে পুত্রের কোথাও গতি থাকে না, এমনকি তার জপ, দান, তপস্যা, হোম, স্নান, তীর্থসেবাসহ সমস্ত কর্মই বিফল হয়। পিতার উপাসনা না করে কোন ধর্মকার্য করলে পিতার অনুতাপরূপ তীব্রবিষ পুত্রকে দগ্ধ করে। পিতার সামগ্রিক মঙ্গলার্থে পুত্রকে সর্বদাই পুণ্যকাজ করা উচিত।

মাতা সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে— মাতা পিতার চেয়েও অধিক গুরু। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন বলেই মাতা অধিক গুরু। ত্রিলোকে (স্বর্গ, মর্ত, পাতাল)

মায়ের মতো আর গুরু নেই।[৮] পিতামাতা একত্রে থাকলে আগে মাতাকেই প্রণাম করবে। এই পুরাণে মাতৃজাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে এবং মাতাকে একুশ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই একুশটি নাম যথাক্রমে- মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শিবা, দেবী, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, নির্দোষা, সর্বদুঃখহা, পরমারাধ্যা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি,স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া এবং দুঃখহন্ত্রী।[৯] এখানে আরো বলা হয়েছে, স্ত্রীর ন্যায় আর মিত্র নেই, বড় বোনের সমান মান্যা আর নেই এবং মাতার ন্যায় গুরু নেই। 'মা' শব্দকে একুশ নামে অভিহিত করার কারণ বুঝতে পারলেই আমরা জাতি হিসেবে নিজেদেরকে উন্নত স্তরে উন্নীত করতে পারব। তাইতো নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন "Give me a good mother and I will give you a good nation." বৃহদ্ধর্মপুরাণে মাতৃজাতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে, বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে যা অনুসরণ করলে আমাদের সমাজ শান্তিতে ভরে ওঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(৩) বিভিন্ন ধর্মাঙ্গের পরিচয়: ধর্মের অঙ্গ প্রধানত চার প্রকার, যেমন— সত্য, দয়া, শান্তি এবং অহিংসা। প্রথম অঙ্গ সত্য, এটা বারো প্রকার— (১) মিথ্যাকথা না বলা, (২) অঙ্গীকার প্রতিপালন করা, (৩) প্রিয়বাক্য কথন, (৪) গুরুসেবা, (৫) দৃঢ়ব্রত, (৬) আস্তিক্য, (৭) সাধুসঙ্গ, (৮) মাতা-পিতার প্রীতি উৎপাদন, (৯) বাহ্য শৌচ, (১০) আন্তর শৌচ, (১১) লজ্জা এবং (১২) অকার্পণ্য।[১০]

দ্বিতীয় অঙ্গ দয়া ছয় প্রকার: (১) পরোপকার, (২) দাতৃতা (বদান্যতা, দানশীলতা), (৩) সর্বদা ঈষৎ হাস্যসহকারে বাক্য প্রয়োগ, (৪) বিনয়, (৫) নম্রতা এবং (৬) সমদর্শিতা ।

তৃতীয় অঙ্গ শান্তি। এটি ত্রিশ প্রকার: (১) অসূয়া না করা, (২) অল্পেই সন্তোষ, (৩) ইন্দ্রিয় সংযম, (৪) নিঃসঙ্গতা, (৫) মৌন, (৬) দেবপূজা, (৭) নিত্যকর্মে প্রবৃত্তি, (৮) অকুতোভয়তা, (৯) গাম্ভীর্য, (১০) স্থিরচিত্ততা, (১১) রুক্ষভাব না থাকা, (১২) সর্বত্র নিস্পৃহতা, (১৩) দৃঢ়চিত্ততা, (১৪) অকার্য বিসর্জন, (১৫) মানাপমানে সমজ্ঞান, (১৬) পরগুণে শ–াঘা, (১৭) ব্রহ্মচর্য, (১৮) ধৈর্য, (১৯) ক্ষমা, (২০) আতিথ্য, (২১) জপ, (২২) হোম, (২৩) তীর্থসেবা, (২৪) পূজ্য-পূজা (পূজনীয়দের পূজা করা বা মান্য করা), (২৫) মাৎসর্যহীনতা, (২৬) বন্ধ মোক্ষজ্ঞান, (২৭) সন্ন্যাসভাবনা, (২৮) দুঃখসহিষ্ণুতা, (২৯) অদৈন্য এবং (৩০) অমূর্খতা।[১১]

ধর্মের চতুর্থ অঙ্গ অহিংসা। অহিংসা আট প্রকার, যথা— (১) অহিংসা, (২) ইন্দ্রিয়জয়, (৩) পরপীড়ন না করা, (৪) শ্রদ্ধা, (৫) অতিথিসেবা, (৬) শান্তভাব প্রদর্শন, (৭) সর্বত্র আত্মীয়তা এবং (৮) অপরাত্মাতেও আত্মবুদ্ধি (অপরকেও আপন ভাবা)। উক্ত বিষয়গুলো যদি প্রতিটি মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে, তাহলে সমাজে চিরশান্তি বিরাজ করতে পারে।

মানবসমাজ শান্তি-শৃঙ্খলায়, প্রেম-ভালবাসায়, মায়া-মমতায় ভরে থাকতো। ফলে সমাজে হিংস্রতা, হত্যা, ধ্বংস, হানাহানি, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের মতো অপরাধ থেকে বিশ্ব মুক্তি লাভ করতো। তাই বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লিখিত গুণাবলী মানবসমাজ-উন্নয়নের চাবিকাঠি বললে অত্যুক্তি হবে না।

(৪) গো-পালন ও কৃষিকাজ: কৃষক কতক্ষণ পর্যন্ত মাঠে হালচাষ করবেন, সে সম্পর্কে আলোচ্য পুরাণে বলা হয়েছে— একজন কৃষক দিনের দেড় প্রহর কাল পর্যন্ত মাঠে হাল চাষ করবেন। তার বেশি সময় চাষ করলে গো-বধের পাপভোগ করতে হবে। উল্লেখ্য, ৮ প্রহর (দিনে ৪ প্রহর+রাতে ৪ প্রহর) মিলে ১ দিন হয়। ১ দিন= ২৪ ঘণ্টা, তাহলে ১ প্রহর কাল=(২৪ ভাগ ৮)=৩ ঘণ্টা। সুতরাং দেড় প্রহর কাল=(৩+১+অর্ধেক ঘণ্টা) ঘণ্টা=সাড়ে ৪ ঘণ্টা। এছাড়া গরু পালনের জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলা হয়েছে। মানুষের উচ্ছিষ্ট অন্ন গরুকে খাওয়ানো যাবে না। বিশেষ করে গাভীকে কখনও দণ্ড দেওয়া যাবে না। গোয়ালঘরে ধূম (ধোঁয়া) দেওয়া, ক্ষৌরকর্ম, আমিষ ভোজন, গরুর পীঠের ওপর বসা, প্রাণিদাহ, ব্যায়াম, মৈথুন, মিথ্যাকথা বলা, প্রাণিহিংসা, ভ্রষ্টদ্রব্য ভোজন (ভাজা-পোড়া খাবার), পরান্ন-ভক্ষণ অর্থাৎ অন্যের দেওয়া খাবার খাওয়া যাবে না।[১২]

(৫) অতিথিসেবা: অতিথিসেবা সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে— যাগ-যজ্ঞ, তপস্যাসহ যে-কোন সুকর্মের চেয়ে অতিথিসেবা শ্রেষ্ঠ। অতিথিকে গোপন করে গৃহস্থ কোন কিছু গ্রহণ করবেন না এবং অতিথিকে সেবা করিয়ে নিজে সেবা (ভোজন) করবেন। অতিথিসেবা করলে গৃহস্থের যশ, আয়ু এবং স্বর্গ লাভ হয়।[১৩] বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে— অতিথি দ্বার থেকে ফিরে গেলে গৃহস্থের সমস্ত পুণ্য নিয়ে তার নিজের পাপ দিয়ে চলে যান। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের নবম অধ্যায়েও একই কথা বলা হয়েছে।[১৪]

(৬) নারী-পুত্র-ভৃত্যের সম্পর্ক: বৃহদ্ধর্মপুরাণের আলোকে হিন্দু সমাজব্যবস্থায় ভার্যা (স্ত্রী, বহুদর্থে নারী), পুত্র এবং ভৃত্য (চাকর,অনুচর)— এরা কখনও স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। এর কারণ পুরুষতান্ত্রিকতা, শঙ্কা, প্রভুশক্তির প্রয়োগ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি। এ বিষয়েও বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হয়েছে-

ভার্য্যা পুত্রশ্চ ভৃত্যশ্চ ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন।[১৫]

কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেই কেবল উক্ত বাক্যের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে কোন ধনী, গরিব, লিঙ্গ কিংবা পেশাভিত্তিক মানুষের অবমূল্যায়ন সে দেশের উন্নতির ধারা ব্যাহত করে, যা মোটেই কাম্য নয়। উক্তিটি শুধুমাত্র সেকালের রক্ষিত কিছু মানুষেরই চিন্তাধারার ফসল, যেটি আলোচ্য পুরাণের আদর্শের অন্তরায়।

(৭) গুরুনির্ণয়: সঠিকভাবে পথ চলার জন্য যেমন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নতুবা গন্তব্যে যাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি একটি মানুষের জীবন সঠিকভাবে গড়ে তুলতে কোন না কোন দিক থেকে তত্ত্বাবধায়ক, পথপ্রদর্শক, গুরু, অভিভাবক দরকার হয়। আর এঁরাই গুরুজন বলে কথিত। কারা গুরুজন সে সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। যে কোন সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে নিতে গেলে আমরা একা যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি তখনই আমরা গুরুর দ্বারস্থ হই। এ-জন্য একজন মানুষের জীবনে গুরু থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হলো— গুরু হিসেবে কাকে গ্রহণ করা যাবে? আর এই প্রশ্নোত্তরেই 'গুরুনির্ণয়' বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য আমরা বৃহদ্ধর্মপুরাণের প্রথম খণ্ডে উপনীত হতে পারি। মন্ত্রদাতা এবং জ্ঞানদাতাই গুরু।[১৬] শান্ত, দান্ত, সুশীল, ধর্মজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, দয়ালু, পুত্রবান গৃহস্থকে গুরু মনোনীত করতে হয়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং শত্রুকে গুরু হিসেবে মান্য করা যাবে না। বয়োজ্যেষ্ঠ, অজ্ঞানশূন্য, শঠতাবর্জিত, অন্তরে-বাইরে সমজ্ঞান, সর্বদাই সস্মিতভাষী, সরল বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অনাসক্তভাবে গৃহে অবস্থিত ব্যক্তিকে গুরু হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।[১৭] এ সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হয়েছে— বয়ঃকনিষ্ঠ, জ্ঞানহীন, বিদ্যাহীন, জাতিহীন, মূর্খ, আশ্রমহীন, পিতা, সন্ন্যাসী, রোগী, বংশহীন, ভার্যাহীন এবং মন্ত্রক্ষিপ্ত (মন্ত্র নিয়েও নিয়ম না মানা ব্যক্তি) ব্যক্তিকে গুরু হিসেবে মনোনীত করা যাবে না। সেখানে কারণ হিসেবে বলা হয়েছে— বয়োহীন অর্থাৎ একেবারে বৃদ্ধদেরকে গুরু মানলে শিষ্যের স্বল্পায়ু হয়, জ্ঞানহীনকে গুরু করলে অপণ্ডিত হয়, বিদ্যাহীনকে গুরু করলে মূঢ় হয়, জাতিহীনকে গুরু করলে বিনাশ হয়, আশ্রমহীন গুরু থেকে দুঃখী, পিতাকে গুরু করলে যশহানি, সন্ন্যাসীকে করলে মৃত্যু, রোগীকে করলে ব্যাধিগ্রস্ত, বংশহীনকে করলে নির্বংশ, ভার্যাহীনকে গুরু করলে ভার্যাহীন হয় এবং মন্ত্রক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে গুরু করলে তাকেও মন্ত্রক্ষিপ্ত হতে হয়।[১৮]

গুরুর সাথে শিষ্য কেমন ব্যবহার করবে, সে সম্পর্কে আলোচ্য পুরাণে বলা হয়েছে—

> গুরুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে, গুরুর আজ্ঞা পাইলে পৃথক আসনে বসিবে। গলায় কাপড় দিয়া সভায় সবিনয়ে গুরুর সম্মুখে থাকিতে হয়। গুরু দণ্ডায়মান থাকিলে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। গুরু উপবেশন করিলে, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে শিষ্য উপবেশন করিবে।[১৯]

গুরুর সাথে শিষ্য কোন চপলতা দেখাবে না, নারীঘটিত কোন কথাবার্তা বলবে না এবং অহংকারী হবে না। গুরুকে জিজ্ঞাস না করে কোন কথা বলবে না, এমনকি গুরুকে কখনো নিষেধ করবে না। কিন্তু আমরা বর্তমান সমাজে এর উল্টো চিত্রটাই দেখতে পাই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের ঔদ্ধত্য আচরণ, শিক্ষকের সাথে বেয়াদবি, হুমকি দেওয়া ইত্যাদি অনভিপ্রেত আচরণ করতে মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থী দ্বিধাবোধ করে না। তবে সব শিষ্য, শিক্ষার্থী একই রকম নয়। গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, শিক্ষক-ছাত্র কিংবা বড়-ছোট এদের মধ্যে পারস্পরিক পরিশীলিত আচরণ, শ্রদ্ধাবোধ,

সম্মান, ভালবাসা থাকলেই একটি পরিবার, প্রতিষ্ঠান কিংবা সমাজ উন্নতি ও শান্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে।

(৮) লতাপাতা ও বৃক্ষের গুরুত্ব: সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে তুলসী পাতা অত্যন্ত উপকারী একটি ভেষজ ঔষধ। তুলসী পাতার রস সর্দি, কাশিসহ নানাবিধ রোগের উপশম ঘটায়। শুধু ভেষজ চিকিৎসাক্ষেত্রেই নয়, আধুনিক চিকিৎসাক্ষেত্রে যেমন— জ্বর, কাশি, সর্দিসহ বিভিন্ন রোগের জন্য সিরাপ তৈরিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। তুলসী পাতা নিয়ে বৃহদ্ধর্মপুরাণের প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও তুলসীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীফলবৃক্ষের (বেল গাছের) উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা নিয়ে একই খণ্ডের নবম অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। শ্রীফল বা বেল প্রধানত গ্রীষ্মকালের ফল। চৈত্র-বৈশাখের খড়দাহে বেলের শরবত অত্যন্ত উপকারী, যা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। তাই সারাদিন উপবাস বা রোজা শেষে বেলের শরবত আবশ্যিক পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই পুরাণে ধর্মীয় ব্যাখ্যাই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— গৃহস্থের বাড়ির ঈষাণকোণে শ্রীফলবৃক্ষ থাকলে তাদের কোন প্রকার বিপদ ঘটেনা। সামাজিক জীবনে একথা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এই বৃক্ষের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে গৃহস্থের কল্যাণ-অকল্যাণ সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য পুরাণে বলা হয়েছে— বাড়ির পূর্বদিকে থাকলে সুখপ্রদ, দক্ষিণে ভয়নাশক ও পশ্চিমদিকে থাকলে সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি হয়।[২০] একথা সত্য যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দর্শন ও বিশ্বাসমতে প্রকৃতিতে বিল্বপত্র অত্যন্ত মূল্যবান এবং পূজার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণিত অনেকগুলো বৃক্ষের মধ্যে আমলকী বৃক্ষ অন্যতম। মূলত এই পুরাণে বর্ণিত সবগুলো বৃক্ষেরই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন রয়েছে। তন্মধ্যে আমলকী শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী ফল। এটি চুল পড়া বন্ধে অত্যন্ত হিতকর ও সুস্বাদু। খাওয়ার শেষে জল পান করলে মিষ্টি লাগে। আমলকীর পাতা ও বৃন্ত শ্যামবর্ণের, স্কন্ধ ও মূলদেশ ধূসর বর্ণ, পাতাসমূহ শিরায় গ্রথিত এবং এর প্রতিটি পাতার তিনটি ভাগ। শঙ্করী (পার্বতী) ও কমলার (লক্ষ্মীর) অমল নেত্রজল থেকে এর জন্ম বলে এর নাম আমলকী।[২১] এ ছাড়া আধুনিক চিকিৎসাক্ষেত্রেও আমলকীর সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষণীয়।

(৯) তীর্থ: হিন্দু ধর্মাবলম্বিগণ বিভিন্ন তীর্থে গিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করেন। ভারতবর্ষেই প্রায় সব তীর্থের অবস্থান। বারাণসী, কামাখ্যা, দ্বারকা, পুরুষোত্তম, প্রয়াগ, গয়া, বৃন্দাবন তীর্থই প্রধান। এ ছাড়া প্রভাসতীর্থ, পৃথুদকতীর্থ, বিন্দুঃসরতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ এবং নৈমিষারণ্যতীর্থের নাম বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লেখ আছে।[২২] তন্মধ্যে সর্বোত্তম তীর্থ নৈমিষারণ্যতীর্থ।[২৩] এই

তীর্থক্ষেত্রেই লোমহর্ষণপুত্র মহাজ্ঞানী সূত উগ্রশ্রবা ঋষিগণকে পুরাণশাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়েছিলেন। শুধুমাত্র হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষই নয়, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যে- কোনও পর্যটকই আজকাল তীর্থস্থান পরিদর্শনে গিয়ে থাকেন।

(১০) জ্ঞাতিবর্গের প্রতি কর্তব্যনির্ণয়: বৃহদ্ধর্মপুরাণের প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় 'জ্ঞাতিকর্তব্য নিরূপণ'। মানুষ সামাজিক জীব। একাকী জীবনযাপন সম্ভব নয় বলে তাকে জ্ঞাতি-আত্মীয়স্বজন নিয়ে সামাজিকভাবে বসবাস করতে হয়। জ্ঞাতিগণের প্রতি হিংসা করা ঠিক নয় বরং তাদের সর্বদা সম্মান করা উচিত। এই পুরাণে একজন জ্ঞাতিকে সহস্র ব্রাহ্মণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যিনি জ্ঞাতিগণের কাছে প্রিয়পাত্র, তিনি স্বর্ণতুল্য আদরের পাত্র। জ্ঞাতিদের থেকে কোন সুদ নেওয়া যাবে না, সুদ নিলে সুদ গ্রহীতার বংশ লোপ পাবে। জ্ঞাতির সমস্যা সমাধানের জন্য রাজদ্বারে হলেও গমন করা উচিত, কারণ রাজদ্বারে ও শ্মশানে যে সাহায্য করে থাকে, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বান্ধব বলা হয়েছে।[২৪] জ্ঞাতিগণের আবাসস্থলকে পরমতীর্থ বলে এই পুরাণ স্বীকৃতি দিয়েছে "জ্ঞাতিদেশঃ পরমং তীর্থমুচ্যতে"।[২৫] জ্ঞাতির প্রতি কর্তব্যপালনের প্রয়োজনীয়তা আমরা আমাদের নিত্যদিনের জীবনযাপনেই উপলব্ধি করতে পারি। বিয়ে থেকে শুরু করে যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে এমনকি মৃত্যুর পরে দাহ করা পর্যন্ত সব কাজেই জ্ঞাতি দরকার। যে-কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানেই জ্ঞাতিবর্গের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। যে-কোন ধর্মেই হোক না কেন, কথাটি সর্বাঙ্গীণভাবে সত্য। সেদিক থেকে বিচার করলে আমরা নির্দ্বিধায় এই পুরাণকে সামাজিক পুরাণ বলে দাবি করতে পারি।

(১১) বৃহদ্ধর্মপুরাণের আলোকে সৌরজগৎ: বৃহদ্ধর্মপুরাণের আলোকে বাংলা বারোমাসের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা রয়েছে প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে। সেখানে বলা হয়েছে— ষষ্ঠি (ষাট) দণ্ডে এক অহোরাত্র অর্থাৎ রাতদিন হয়, পনেরো রাতদিনে এক পক্ষ এবং দুই পক্ষে এক মাস ধরা হয়। চাঁদের প্রতি কলায় এক এক তিথি । যখন চাঁদের কলা বৃদ্ধি পায় তখন সেই পঞ্চদশ তিথিকে শুক্লপক্ষ বলে। আর চন্দ্রকলা যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, সেই পঞ্চদশ তিথিকে বলে কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ মিলে পিতৃগণের এক অহোরাত্র। চিত্রা নক্ষত্র থেকে চৈত্রমাস, বিশাখা থেকে বৈশাখমাস, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে জ্যৈষ্ঠমাস, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়মাস, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপাদ থেকে ভাদ্রমাস, অশ্বিনী থেকে আশ্বিনমাস, কৃত্তিকা থেকে কার্ত্তিকমাস (কার্তিকমাস), মৃগশিরা (মার্গশীর্ষ) নক্ষত্র থেকে অগ্রহায়ণমাস, পুষ্যা নক্ষত্র থেকে পৌষমাস, মঘা নক্ষত্র থেকে মাঘমাস এবং ফাল্গুনী নক্ষত্র থেকে ফাল্গুনমাসের উৎপত্তি হয়েছে। বছরের এই বারো মাস মিলে ছয় ঋতু গণ্য করা হয়েছে। দুই অয়ন (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন) বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। সৌরজাগতিক বিষয় নিয়ে বর্ণিত এই অধ্যায়টি বিশেষ তাৎপর্যবহ। গ্রহসমূহ পৃথিবী থেকে ১৬,০০০ (ষোল

হাজার) যোজন ওপরে স্থির বায়ুতে অবস্থিত। তার থেকে সহস্রযোজন ওপরে রাহু যা সূর্য এবং চন্দ্রকে গ্রাস করতে ধাবিত হয়। সূর্যের লক্ষযোজন ওপরে চন্দ্র এবং চন্দ্রের লক্ষযোজন উপরিভাগে তারকামণ্ডল অবস্থিত। তার থেকে এক লক্ষযোজন ওপরে শুক্রগ্রহ, তার থেকে দুই লক্ষযোজন ওপরে মঙ্গলগ্রহ, মঙ্গলগ্রহের দুই লক্ষযোজন ওপরে বুধগ্রহ, তার থেকে দুই লক্ষযোজন ওপরে বৃহস্পতি, তার থেকে দুই লক্ষযোজন ওপরে গ্রহরাজ শনির অবস্থান।[২৬] আমরা জানি, চাঁদের ওপর নির্ভর করেই হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যাবলী পালিত হয়। ঈদ, পূজা থেকে শুরু করে যাবতীয় অনুষ্ঠানই চাঁদের ওপর নির্ভর করেই ধার্য করা হয়। তাই এককথায় বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৃহদ্ধর্মপুরাণের গুরুত্ব রয়েছে।

(১২) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা: এই অনুষ্ঠানটি হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এদিনে যমুনা (মৃত্যুরাজ যমরাজার বোন) গৃহাগত ভাই যমের দীর্ঘায়ু কামনায় অর্চনা করেছিলেন। সে রীতি অদ্যাবধি হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু নারীদের উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভাই-বোন উভয়ে ব্রাহ্মণভোজন করাবে এবং পরস্পর কোন প্রকার কলহ, পাপকাজ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করবে না।[২৭]

(১৩) চতুর্বর্ণোৎপত্তি: বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— বিষ্ণুর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, প্রজাপালনার্থে বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ধনরক্ষার্থে উরুদেশ থেকে বৈশ্য এবং উক্ত তিন বর্ণের মানুষের সেবার জন্য পাদদ্বয় থেকে শূদ্রগণের উৎপত্তি হয়েছে।[২৮] শ্রীমদ্ভগবতগীতায়ও চতুর্বর্ণোৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ এক কর্মকে ভিত্তি করে সৃষ্ট হয়েছে চতুর্বর্ণ।[২৯] এ পুরাণে যদিও চতুর্বর্ণোৎপত্তি বিষয়ে গীতার সাথে সামঞ্জস্য নেই, তথাপি চতুর্বর্ণের সব লোকের মধ্যেই অনসূয়া (অহিংসা), দয়া, ক্ষমা, শৌর্য (বীরত্ব), সরলতা, অলোভ, অকার্পণ্য এবং আলস্যহীনতা— এই আট প্রকার সদ্‌গুণাবলী থাকা উচিত।[৩০]

(১৪) কর্মযোগ অর্থাৎ মানুষের করণীয় বিষয়: আলোচ্য অধ্যায়ে কর্মযোগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিই কর্ম না করে ক্ষণকালও অবস্থান করতে পারে না। তত্ত্বলাভ অর্থাৎ লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত জীবমাত্রই কর্মের অধীন।[৩১] মোক্ষপ্রার্থী বা তত্ত্বপ্রার্থী ব্যক্তির কোনভাবেই বৈধকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবতগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন— কর্মফলের আশা ত্যাগ করে সর্বদাই করণীয় কাজ করতে হবে।[৩২]

(১৫) প্রণামপদ্ধতি: হিন্দুসমাজে নমস্কার ও প্রণামপ্রথা এবং মুসলমান সমাজে সালাম দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে নমস্কার ও প্রণামপদ্ধতি ভিন্ন। কখন কখন প্রণাম করতে হয়, সে প্রসঙ্গে এই পুরাণে বলা হয়েছে— জলহস্তে, বহ্নিহস্তে, অধ্যয়নকালে,

ভোজনকালে, জপরত সময়ে, রন্ধন করা অবস্থায়, ফুলহস্তে, ধ্যানরত সময়ে, নিদ্রাকালে, বেগে ধাবমান অবস্থায়, ক্রোধান্বিত সময়ে, বদ্ধাবস্থায়, সিক্তবস্ত্রে থাকা অবস্থায়, শস্ত্রহাতে, পতিত হলে, উন্মাদ হলে, নীচে বসলে, অন্যমনস্ক হলে, স্নানরত অবস্থায় এবং অন্যদের দ্বারা তাড়িত অবস্থায় প্রণাম করা নিষেধ। এ ছাড়া পেছন থেকে এবং অপবিত্র চিত্তে প্রণাম করা নিষেধ। পরোক্ষে গুরুজনদের নামগ্রহণ (নাম ধরে ডাকা), নিন্দা করা সুশীল সমাজ যেমন গ্রহণ করেন না, তেমনি এই পুরাণেও তা স্বীকৃতি পায়নি।

(১৬) নিদ্রা যাওয়া এবং ব্রাহ্মণের করণীয়: উত্তর খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিদ্রাকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে— দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিবসে সায়ংসন্ধ্যা অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে নিদ্রা নিষেধ। অন্যথায় তাঁকে পিতৃহত্যাপাপ ভোগ করতে হয়।[৩৩] ব্রাহ্মণকে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালভেদে তিনবার গায়ত্রী জপ করতে হয়। সত্য, দান, শান্তি, ক্ষমা, অহিংসা, বৈধহিংসা, অল্পে সন্তোষ, দয়া, অন্যের কষ্ট না হয় এমন ভিক্ষা, সৌজন্য, বিনয়, যজন, যাজন, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পরিমিত আহার, নিরামিষ ভোজন, উপবাসাদি ব্রতপালন, সূর্যের আরাধনা, অগ্নিসেবা, গুরুসেবা ও গো-সেবা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য।[৩৪] শুধু ব্রাহ্মণ কেন, সকল বর্ণের মানুষের জন্যই উক্ত কার্যাবলী পালন করা উচিত। এ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণকর্তব্য বিষয়ে যে-সব শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে, তা বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্ব মিলবে না।

(১৭) রাজধর্ম: রাজধর্ম আলোচনায় রাজার কর্তব্য বিষয়ে এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে— শোক, বিষাদ, মোহ, ব্যয়শঙ্কা ও মূর্খতা পরিত্যাগ করে রাজা প্রজাদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকবেন। দেবতারাই রাজা হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। রাজার উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে— বিধাতা ইন্দ্র থেকে প্রভুত্ব, বহ্নি থেকে প্রতাপ, যম থেকে ক্রোধ, চন্দ্র থেকে সৌন্দর্য, কুবের থেকে ধন এবং ভগবান বিষ্ণু থেকে মধুর সত্ত্বগুণ নিয়ে রাজশরীর সৃজন করেছেন।[৩৫] রাজা দণ্ডার্হদিগের বিধিমতে দণ্ড দেবেন। সমস্ত জগদ্বাসী জীবমাত্রেই দণ্ডান্বিত হলেই তারা রাজার বশীভূত হয়ে থাকেন। এ অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে— ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালককে রাজা কোন প্রকারেই বধ করতে পারেন না।[৩৬] সত্য, দান, মানুষসেবা, দর্প, বিরোধ, নিয়ত যুদ্ধসামগ্রীসংগ্রহ, পরিখা-খনন, গুপ্তচরের মাধ্যমে রাজ্যের অবস্থা অবহিত হওয়া, মন্ত্রীদের সাথে মন্ত্রণা, বহুলোক বা একজনের সাথে মন্ত্রণা না করা, সাবধানে দণ্ডপ্রয়োগ ও প্রজাদের রক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা, করগ্রহণ ইত্যাদি রাজার ধর্ম।[৩৭]

বর্তমান সমাজে রাজ্য পরিচালনায় রাজাকে আমরা বিভিন্ন প্রকার সৈন্য ব্যবহার করতে দেখি। কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি এই চার প্রকার সৈন্যের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে— একটি রথ, একটি হস্তী, তিনটি অশ্ব, পঞ্চজন

পদাতিকের একত্রিত নাম পত্তি। তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক যুগ্ম, তিন যুগ্মে একটি গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমু, তিন চমুতে এক অনীকিনী এবং দশ অনাকিনীতে হয় এক অক্ষৌহিণী।[৩৮] এক অক্ষৌহিণীতে একুশ হাজার আটশত সাতটি (২১,৮০৭) রথ, একই সংখ্যক হস্তী এবং রথের তিনগুণ অর্থাৎ ৬৫,৪২১ টি অশ্ব থাকবে এবং হস্তী-রথের পাঁচগুণ অর্থাৎ ৩,২৭,১০৫ জন পদাতিক থাকবে। একজন রাজাকে সর্বদাই এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সঞ্চিত রাখতে হবে যাতে কোষাগারের ব্যয়শঙ্কা এবং যুদ্ধশঙ্কা না থাকে।

রাজাদের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।[৩৯] রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে সৎকুলজাত, সচ্চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের মন্ত্রীত্ব প্রদান করা উচিত এবং একই ব্যক্তিকে বহুকাল মন্ত্রীপদে নিযুক্ত রাখা ঠিক নয়। কেননা অধিককাল মন্ত্রীত্ব পেলে রাজাকে অমান্য করে। এর প্রভাব আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া গৃহকর্মী বেশি দিন যদি একই বাড়িতে থাকে, তাহলে সে গৃহস্থের কথা শুনতে চায়না। এভাবে বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত রাজধর্ম থেকে আমরা রাজা, মন্ত্রী ও প্রজাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারি। নারীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই পুরাণে বলা হয়েছে— স্ত্রীর বুদ্ধি অনুসারে এবং শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী রাজার যে কোনও কাজ করা অবশ্য কর্তব্য।[৪০] এদিক থেকে অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, মহাভারতে উল্লিখিত রাজধর্মের আলোকে নারীর প্রতি প্রদত্ত মর্যাদার দিক থেকে বিচার করলে বৃহদ্ধর্মপুরাণকেই অধিকতর অগ্রসর বলে মনে হয়।

(১৮) ব্যবসা-বাণিজ্য: আলোচ্য গ্রন্থের উত্তরখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যবসায়ীদের (বৈশ্যদের) জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ নির্ধারণের একটি সুস্পষ্ট নিয়মের কথা বলা হয়েছে। কোন বস্তু যে দামে কেনা হবে, তার ষোলভাগের এক ভাগ লাভ করবে, তার অতিরিক্ত লাভ করলে অধর্ম অর্থাৎ পাপ হবে। কাউকে ঋণ দিলে তার জন্য প্রতিমাসে ঋণদাতা প্রদত্ত টাকার ষোড়শাংশ কুশীদ (সুদ) নিতে পারবে।[৪১] বৈশ্যগণ কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা, কুশীদ ও বৃত্তিগ্রহণ, রাজার সন্তুষ্টিসাধন, ধান-পান-বস্ত্র-মণি-মুক্তা-সোনা-ঘি-তেল ইত্যাদি সঞ্চয়, ক্রয় এবং বিক্রয় করবে। কোন দ্রব্য পরিমাপের জন্য বর্তমানকালে কিলোগ্রাম বা গ্রাম ব্যবহার করা হয়। যদিও গ্রামের কিছু কিছু যৌথ পরিবারে সেটক বা সের দিয়ে চাল মাপতে দেখা যায়, তবে সর্বত্রই প্রায় কেজিতে পরিমাপ করা হয়। এই অধ্যায়ে মাষ, তোলক (তোলা), দ্রোণ, আঢ়ক, সেটকের কথা উদ্ধৃত আছে। ষট্‌ত্রিংশৎ (ছত্রিশ) তাম্রে এক সেটক (সের) এবং তার অর্ধেকে এক তোলক (তোলা) হয়।[৪২]

(১৯) খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি: হিন্দুধর্মাবলম্বীদের জন্য এই পুরাণে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, রবিবার, রবিসংক্রান্তি, দ্বাদশীসহ পুণ্যদিনে মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে।

রবিবারকে গুরুবার বলে গণ্য করা হয়েছে। এদিনে মাছ, মাংস, মসুর ডাল, মাষকলাই, নিমপাতা, আদা খাওয়া ঠিক নয়। এগুলো আমিষেরই অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত ব্রাহ্মণগণের জন্য মাছ খাওয়া নিষেধ। কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রাহ্মণ রোহিত (রুই), শকুল (শোল) এবং শফর (পুটি) মাছসহ সাদা বর্ণের মাছ খেতে পারবেন।[৪৩] আগে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আলোচ্য পুরাণে এসব খাওয়া বৈধ করা হয়েছে। মানবশরীরের জন্য মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি প্রোটিনের প্রধান উৎস। আর প্রোটিন মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান। তাই সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য বৃহদ্ধর্মপুরাণ আধুনিক সমাজে বিশেষ অবদান রেখেছে।

খাদ্যগ্রহণপদ্ধতি সম্পর্কে এই পুরাণে বলা হয়েছে— সবগুলো আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া বিধিসম্মত, দু'হাতে খাওয়া নিষেধ, খাওয়ার সময় নিরব থাকতে হয় এবং আঙ্গুলের উল্টো দিক দিয়ে খাওয়া নিষেধ।[৪৪] শুরুতেই খাদ্যের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে খাওয়া শুরু করবে।[৪৫] খাওয়ার শুরুতেই ঘি-ভাত, পরে শাক-সব্জি, অতঃপর সুপাদি এবং সবশেষে ক্ষীরান্ন ভোজন করা উচিত। ক্ষীরে লবণ এবং টকে (অম্লে–) গুড় মেশানো উচিত নয়। আমিষ খেয়ে কখনও ক্ষীর বা পায়েস খেতে নেই।[৪৬] পাষাণময় পাত্রে বা পাতায় ভোজন করা ভাল। গৃহস্থ ভাঙ্গা কাঁসার বা তামার পাত্রে ভাত খাবেন না। তামার পাত্রে জলপান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বহুক্ষণ যাবৎ ভোজন করলে পাপ হয় এবং তাড়াতাড়ি খেলে পুণ্যলাভ হয়। অনেক মানুষের সাথে একত্রে খেতে বসলে একা তাড়াতাড়ি খাওয়া, অন্ন ছিটিয়ে বা ফেলে এবং উচ্ছিষ্টমুখে বা খেতে খেতে কোথাও যাওয়া নিষেধ।

এই পুরাণে সিক্তবস্ত্রে বা এক কাপড় পরিধান করে এবং ভগ্নাসনে বসে, শুয়ে, পা-লম্বা করে অথবা শয্যাসংলগ্ন বস্ত্রে খেতে বসা এবং শয্যা বা বিছানা ছুঁয়ে খাওয়া নিষেধ। হাত জোড় করে (অঞ্জলি দ্বারা) জল পান করা এবং জলে মুখ দেওয়া অবৈধ। সকালে, সন্ধ্যায় এবং প্রথম প্রহর রাত ব্যতীত দ্বিতীয় প্রহর শেষে এবং অনাবৃত বা খোলা জায়গায় কখনও খাওয়া ঠিক নয়। সিদ্ধ চাল খাওয়া অবশ্য কর্তব্য। পুড়ে যাওয়া, পঁচা-বাসি, অবহেলায় পরিবেশিত, পর্য্যুষিত (পঁচা) অন্ন এবং চোখে ও জিহ্বার জন্য অরুচিকর অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ। খাওয়া শেষে হাত, মুখ, দাঁত মাজতে হয়। মুখ ধোয়া শেষ হলে মুখশুদ্ধির জন্য পান বা তুলসীপাতা খাওয়া উচিত।[৪৭]

পিতামাতাহীন আয়ুষ্কামী ব্যক্তি পূর্বদিকে মুখ করে, সত্যপ্রার্থী উত্তরদিকে, শ্রীপ্রার্থী পশ্চিমদিকে এবং যশোপ্রার্থী দক্ষিণদিকে মুখ করে ভোজন করবে।[৪৮] উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, এখানে খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং খাওয়ার শুরু থেকে হাত-মুখ ধোয়া পর্যন্ত যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানসম্মত। আগে দেখা

যেতো মাটি দিয়ে সাবানের কাজ করা হতো কারণ সাবান তখনও তৈরি হয়নি। মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে পান এখনও বহুলপ্রচলিত। রাতে যে-সব খাদ্য খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর, সে সম্পর্কেও এই পুরাণে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাতে দই, তিতা, ছাতু ও তিল খেতে নেই।[৪৯] এ সব প্রথার প্রচলন বর্তমান সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য পরিপাকের জন্য রাতে কখন খাওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পেট ভালো রাখার জন্য বাসি-পঁচা খাবার খাওয়া ঠিক নয় এবং খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এই পুরাণে।

(২০) সামাজিক জীবনে মাঙ্গলিক কর্মকাণ্ড: সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য আমাদের সমাজে এখনও সন্ধ্যাকালে কোথাও যাওয়া, শুয়ে থাকা, খাওয়া, খেলা করা, মৈথুন ইত্যাদি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে— যা এখনও অধিকাংশ মানুষই মেনে চলতে চেষ্টা করে। এছাড়া রাতে নতি, প্রণতি, দান এবং আশীর্বাদ করতে নেই।[৫০] কোথাও যাত্রাকালে সবধর্মের মানুষই মন্ত্র বা সুরা ইত্যাদি পাঠ করেন। এই পুরাণের তৃতীয়খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শুভযাত্রা কামনায় বলা হয়েছে— যাত্রাকালে সবৎসা ধেনু (বাছুরসহ গাভী), দধি, শুক্লপুষ্প (সাদাফুল), সুন্দরী নারী, হস্তী, অশ্ব, দূর্বা, শুক্লধান্য (সাদা ধান), জলপূর্ণ ঘট, শিবা (দুর্গা),বিপ্র (ব্রাহ্মণ), শঙ্খচিল, খঞ্জনপাখি এবং সজ্জন (সৎ লোক) দেখে সুখে গমন করবে। বিদেশে যাওয়ার সময় মঙ্গলবাক্য, বিল্ববৃক্ষ, মুক্তা এবং শঙ্খের কথা মনে করবে। এছাড়া একাকী বা তিনজনে দূরদেশে যাওয়াও ঠিক নয়। ব্যাপারটি আমরা এখনও মেনে চলি। শুভকাজ যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্যই একথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া সবসময় বারবেলা, তিথি, বার এবং দিকশূল বিবেচনা করে যাত্রা করা শ্রেয়।[৫১] কেমন শয্যায় শয়ন করা উচিত, সে বিষয়ে আলোচ্য পুরাণে বলা হয়েছে— কাঠের সুচারু শয্যায় পা ধুয়ে শয়ন করতে হয়। অপ্রশস্ত, ভাঙ্গা, বিষম (উচুঁ-নীচু), মলিন, অনাবৃত বা জন্তুময়ী (জীবজন্তু বিছানায় নিয়ে বা রেখে) শয্যায় শয়ন করা ঠিক নয়। পূর্বদিক কিংবা দক্ষিণদিকে মাথা দিয়ে শয়ন করতে হয়। একাকী নির্জন গৃহে শোয়া ঠিক নয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো উচিত নয়।৫২ শব্দদূষণসহ পরনিন্দা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই অকপটে একথা স্বীকার্য যে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন স্বাস্থ্যে , মঙ্গলচিন্তায়, শান্তিতে, নিদ্রায়, গন্তব্যে, খাদ্যগ্রহণে, শয্যাক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসাক্ষেত্রে এমনকি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে বৃহদ্ধর্মপুরাণের অবদান অনস্বীকার্য।

(২১) পুত্রের শ্রেণিবিভাজন: এই পুরাণে বারো প্রকার পুত্রের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে- (১) ঔরস, (২) ক্ষেত্রজ, (৩) দত্ত বা দত্তক, (৪) কৃত্রিম, (৫) গূঢ় সম্ভব, (৬) অপবিদ্ধ,[৫৩] (৭) কানীন (৮) সহোঢ় (৯) ক্রীত (১০) পৌনর্ভব (১১) স্বয়ংদত্ত এবং (১২) শৌদ্র (পরশব)। তন্মধ্যে প্রথম ছয় প্রকারের পুত্রই কেবল পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী। উক্ত পুত্রদের উৎপত্তি বিষয়েও এই গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে।[৫৪]

(২২) মাতৃজাতির পরিচয়: সমাজে নারীদের কোথাও মাতা, কোথাও বা কন্যা হিসেবে মনে করা হয়। এই পুরাণে নয়জন মাতা এবং নয়জন কন্যার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নয়জন মাতা যথাক্রমে— জননী, গুরুপত্নী, জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্ত্রী, শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পিতৃব্যপত্নী (কাকিমা, জেঠিমা), মাতুলানী, মাতৃস্বসা (মাসি) এবং পিতৃস্বসা (পিসি)। নয়জন কন্যা যথাক্রমে— কন্যা , ছোটবোন , পুত্রবধূ , ভাইঝি , ভাগিনী , ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, শিষ্যা, পুত্রের অসবর্ণ জাতীয় স্ত্রী এবং শরণাপন্ন নারী। এদেরকে স্নেহ ও শাসন করা উচিত।[৫৫]

(২৩) গার্হস্থ্য আশ্রম: গৃহস্থের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। হিন্দুশাস্ত্রে চার প্রকার আশ্রমের কথা বলা হয়েছে; যেমন— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। সমস্ত আশ্রমবাসী গৃহস্থের সাহায্যেই অবস্থান করেন। জলজন্তুসমূহ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে জীবিত থাকে, তেমনি ব্রহ্মচর্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমবাসীরা গৃহস্থকে অবলম্বন করে জীবনধারণ করেন। এ-জন্যই গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠতম আশ্রম। মানবহিতৈষী গৃহস্থই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এবং গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল।[৫৬] বর্তমান হিন্দুসমাজের মূলমন্ত্র গার্হস্থ্য আশ্রমকে প্রাধান্য দিয়েই রচিত। যেমন-

হাতে কর গৃহ কর্ম, মুখে বল হরি।
অনায়াসে দিতে পারবে ভব নদী পাড়ি ॥

(২৪) কর্মযোগ: আলোচ্য পুরাণমতে কর্ম এবং মানবতাবাদকেই অধিকতর মূল্যায়ন করা হয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিকভাবে বসবাস করতে হলে তাকে কিছু নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। আমাদের মতে মানবকল্যাণে সে-সব নিয়ম-নীতিই মনে ধারণ করা উচিত, যার নাম ধর্ম। ধৃ-ধাতুর সাথে মন্ প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। তাহলে 'একজন মানুষ কী ধারণ করবে'— এ প্রশ্নের উত্তর সকলেরই জানা দরকার। ধর্ম কেবল পুঁথিগত বিষয়ই নয়, সমাজকল্যাণে যা কিছু কাঙ্ক্ষিত তাই ধর্ম। মানুষ জন্মসময়ে কোন ধর্ম নিয়ে জন্মে না, তাকে একটি ধর্মের মধ্যে জন্ম নিতে হয়, হতে পারে সেটি সনাতন, ইসলাম, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টানধর্ম। কিন্তু সমস্ত ধর্মেরই মূলকথা শান্তিস্থাপন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" উদ্ধৃতিটি অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ বিনির্মাণে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু আমরা বিশ্বায়নের এই যুগেও দেখছি ধর্মে-ধর্মে হানাহানি, মারামারি, মন্দির পোড়ানো, মসজিদ ভাঙ্গা ইত্যাদি মানবেতর কাজে মানুষকে লিপ্ত থাকতে। আর সেজন্যই আমাদেরকে বৃহদ্ধর্মপুরাণে উলি–খিত ধর্মের দশবিধ লক্ষণ জানা এবং সেগুলো জীবনে মেনে চলা আবশ্যক। এগুলো হলো— সন্তোষ, ক্ষমা, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব, সহিষ্ণুতা, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্যকথা এবং ক্রোধত্যাগ।[৫৭]

মানুষের মধ্যেই তার আত্মশত্রু বিদ্যমান। ষড়রিপুকে জয় করে জীবনকে চালিত করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই ষড়রিপু হলো: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। আর এরই সাথে রয়েছে পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) ও পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ)। মানুষ ষড়রিপু ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের জয়-পরাজয়েই হার মানে অথবা বিকশিত হয়। তখনই দশ-দশায় উপনীত হয় এবং সর্বশেষ দশা মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করে। দশ-দশা সম্পর্কে মানবকুলকে সজাগ হতে বৃহদ্ধর্মপুরাণ বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই পুরাণে বলা হয়েছে— কাম থেকে শরীরের উৎপত্তি, অধর্ম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে আশা, আশা থেকে ব্যামোহ, ব্যামোহ থেকে লোভ, লোভ থেকে চিন্তা, চিন্তা থেকে জ্বরা, জ্বরা থেকে ব্যাধি এবং ব্যাধি থেকে মরণের উৎপত্তি হয়।[৫৮] সকল ব্যাধির মধ্যে জ্বর শ্রেষ্ঠ।[৫৯] আমরা জানি প্রায় সমস্ত রোগের পূর্ব লক্ষণ জ্বর। একটি মানুষ যখন চিন্তা বা দুশ্চিন্তা করতে থাকে, তখন তাকে বিষণ্নতায় আঁকড়ে ধরে। ফলে আজকাল মানুষকে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদ্‌রোগসহ জটিল রোগে ভুগতে হয়। সেজন্যই সমস্ত চিকিৎসকই প্রথমে রোগীকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেন। এছাড়া সুস্থ থাকার জন্য বলা হয়েছে– প্রত্যেক মানুষের জন্যই বৃথা চেষ্টা ও বৃথা বাক্যব্যয় অযৌক্তিক।[৬০] তাই মানবজীবনকে সুস্থতায় ভরে তুলতে আলোচ্য পুরাণের শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যক।

(২৫) সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি: একজন মানুষের শরীর থেকে সংক্রামক ব্যাধি যাতে না ছড়ায়, সেজন্য বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বিশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে— সংক্রামক ব্যাধি আছে এমন কারও সাথে আলাপ করলে, তার গাত্র স্পর্শ করলে, কাছে থেকে নিঃশ্বাস নিলে, তার সাথে এক সাথে খেলে, একই যানে আরোহণ করলে এবং পংক্তিতে (একই সারিতে বসে) ভোজন করলে অন্যের মধ্যে রোগ সংক্রমিত হয়।[৬১]

(২৬) সংকরজাতির উৎপত্তিসহ শ্রেণিভেদ ও জীবিকানির্ধারণ: হিন্দুসমাজে জাতি-বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন রয়েছে। এই পুরাণের উত্তরখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সঙ্করজাতি নিরূপণ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে জাতিসমূহের জীবিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারবর্ণের স্ত্রী-পুরুষ থেকে মোট ছত্রিশটি জাতির উদ্ভবের কথা এই পুরাণে আলোচিত হয়েছে। সঙ্করজাতির জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হলেও অদ্যকার সমাজ ও জীবিকাব্যবস্থায় কেউই তার পিতৃপেশাকে টিকিয়ে রাখতে পারছে না। এখন যে কেউ যে কোনো ধরনের পেশা গ্রহণ করছে। ছত্রিশ জাতির জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিন্যস্ত করতে আলোচ্য পুরাণে সঠিক দিক নিদের্শনা দেওয়া হয়েছে।[৬২]

(২৭) ভবিতব্য নির্ধারণ: হিন্দুশাস্ত্রে চারযুগের উলে–খ আছে। যেমন— সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রথম তিনটি যুগ শেষ হয়ে এখন কলিযুগ চলছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে কলিযুগের

সামাজিক অবক্ষয় সম্পর্কে অত্যন্ত নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যার প্রমাণ আমরা বর্তমান সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হয়েছে—

> কলিযুগে লোকে সতত দুতিসম্পন্ন হইবে, শিষ্য গুরুকে, ভার্যা স্বামীকে, পুত্রাদি পিতামাতা প্রভৃতিদের দুর্বাক্যবিষে সতত অবমাননা করিবে। খল, পিশুন, দাম্ভিক এবং মাৎসর্যশালী লোক সাধুগণের অবমাননা করিবে । এই সব হইল কলির মহৎ কার্য। কলিকালে সকল স্ত্রীলোকই দীর্ঘাকায়, দন্তুরা, বিবর্ণা, নিতান্ত খর্বাকৃতি (বামন, বেঁটে), ক্রোধবহুল, দুষ্টা বা অলক্ষণা ইহার একটা না একটা হইবেই। কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণবর্ণ, দন্তুর, ক্ষীণদেহ এবং শাঠ্যপূর্ণ হইবে। শূদ্রেরা অত্যন্ত গৌরাঙ্গ, অল্পশ্মশ্রুধারী, দন্তুর এবং বিশেষভাবে শাঠ্যযুক্ত হইবে। কলিকালে চতুর্বর্ণের মধ্যে অনেকেই কুব্জ, নিম্নদৃষ্টি, দীর্ঘজঙ্ঘ, স্থূলোদর (বহ্বারী= বহু + আহারী) এবং দম্ভপূর্ণ হইবে।[৬৩]

এ ছাড়া কলিকালে দেবতারা পৃথিবী ত্যাগ করবে এবং ব্রাহ্মণেরা বেদত্যাগ করে মদ্যপান করবে। পৃথিবীর শস্য অল্প হবে, লোকক্ষয়ে বা আয়তনহ্রাসে পৃথিবী সঙ্কুচিতা হবে, গাভীর দেহ ক্ষুদ্র হবে এবং দুগ্ধ অল্প হবে। মানুষের মৃত্যুকালের কোনো নিয়ম থাকবে না। পৃথিবী ঝঞ্ঝাবাতে জলমগ্ন হবে।[৬৪] উলি–খিত বর্ণনা থেকে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, বর্তমান সমাজে যেভাবে মানবিক মূল্যবোধ লোপ পেয়েছে এবং পাচ্ছে, পরস্পরের সাথে হানা-হানি, কাটা-কাটি, বড়দের প্রতি অসম্মান, স্ত্রীহত্যা, নারী নির্যাতন, মাতৃজাতিকে অবমাননাসহ যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কাণ্ড প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, তার থেকে মুক্তি পেতে বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণিত সদাভ্যাস, সদাচরণ, ধর্মাঙ্গাদি অধ্যয়ন ও চর্চা আবশ্যক বলে মনে করি।

(২৮) সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফলাফল নির্ধারণ: উত্তরখণ্ডের বিশ অধ্যায়ে মানুষের সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, বিমাতৃগমন, সোনাচুরি, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মান না করা, শাস্ত্র না জেনে শাস্ত্রোপদেশ দেয়া ও দেবতানিন্দা দেবহত্যারই সামিল। অপরের শ্লোককে যে নিজের শ্লোক বলে দাবি করে, তাকে সুরাপায়ী (মদ্যপানকারী) বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়,তাকে বাঁন্তাশী (বমি-ভোজী) বলা হয়েছে। অন্যের সুনাম বা কীর্তিক্ষয়কারী ব্যক্তিকে ব্রহ্মঘাতী বলা হয়েছে। আবার পরোপকারীকে যে হত্যা বা অসম্মান করে, তার মুখ দেখাও মহাপাপ—বৃহদ্ধর্মপুরাণে এ-সব কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে।[৬৫]

উপসংহার: মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিকতা রক্ষা করা সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সৌজন্য, আচরণ, ন্যায়-নিষ্ঠাবোধ, সততা, বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করা, শিক্ষকদের ও পিতা-মাতাকে গুরু বলে মান্য করা, নিজধর্মে অনুরাগ, ধর্মাঙ্গসমূহের চর্চা করা, অতিথিসেবা, নারী-পুত্র-ভৃত্যের প্রতি কর্তব্য পালন, কৃষকের প্রতি আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করা, বিভিন্ন ওষধি বৃক্ষের উপকারিতা, তীর্থভ্রমণ, সৌরজাগতিক ঘটনার বর্ণনা, চতুর্বর্ণোৎপত্তি, কর্মানুরাগ, প্রণামপদ্ধতি, নিদ্রাকাল, খাদ্য গ্রহণ

পদ্ধতি ও সময় নির্ধারণ, রাজধর্ম, মাঙ্গলিক কর্মানুষ্ঠান, পুত্রের শ্রেণিভেদ, আশ্রমাদির গুরুত্ব, ভবিতব্য বিষয়াদি নির্ধারণ, বিভিন্ন রোগ ও সংক্রামক ব্যাধির কারণ, কর্মের ফলাফল নির্ণয়, জাতির প্রকারভেদ ও তাদের জীবিকা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বৃহদ্ধর্মপুরাণ একটি পরিপূর্ণ সামাজিক পুরাণের মর্যাদা বহন করে। সমাজোন্নয়নার্থে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো— 'মাতৃশ্রেণিবিভাজন' বিষয়ক জ্ঞান অর্জন, যে জ্ঞানের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের ইভটিজিং, ধর্ষণ, নির্যাতনসহ যাবতীয় ঘৃণ্য কাজগুলো করা থেকে অপরাধীরা বিরত থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা যেমন— রোগের কারণ, সংক্রামক রোগের কারণ, পবিত্রতা রক্ষার্থে খাওয়া অবস্থায় যত্রতত্র গমন, বিছানায় খাদ্যদ্রব্য পড়ে যাতে পিপঁড়াসহ বিভিন্ন পোকামাকড়ের কামড় খেতে না হয়, বৃক্ষাদির পাতার রস, শিকড়, ছাল (বাকল) ও ফলের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার এবং বার-মাস-তিথি-মলমাস-বছর প্রভৃতি আলোচনা নিয়ে বৃহদ্ধর্মপুরাণ একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থের দাবিদার। যদিও পুরাণটিকে ধর্মসংহিতা বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে গ্রন্থটিকে সামাজিক জীবন বিকাশে অধিক উপযোগী বলে মনে হয়। ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ইত্যাদি কুসংস্কারসমূহের বর্ণনা এ গ্রন্থে স্থান পায়নি। তার প্রমাণ— এই পুরাণেই প্রথম ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তা'ছাড়া নারীজাতির প্রতি যে নির্যাতনমূলক আচরণের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণসহ বিভিন্ন পুরাণে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে-সব বিষয় নিয়ে আলোচ্য পুরাণে খুব বেশি আলোকপাত করা হয়নি। বৃহদ্ধর্মপুরাণ বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তশাস্ত্র; এটি সাংখ্যাযোগাত্মক ও পরম আত্মজ্ঞানপ্রদ।[৬৬] তাই বিস্তৃত পরিসরে একজন সমাজবিশ্লেষক হিসেবে সামাজিক জীবনে বৃহদ্ধর্মপুরাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

১ ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি।" মহাভারত, আদি, ১/১/২০৪
Vishnu S. Sukthankar (ed.), *The Mahabharata (The Adiparvan*), Vol.1 (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933), p.31

২ ক. সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ বায়ু. ৪.১০
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.) *বায়ুপুরাণম্,* কলিকাতা, ১৩১৭, পৃ. ১২।

খ. সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্ব্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥ বিষ্ণু. ৩.৬.২৫
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.) *বিষ্ণুপুরাণম্,* কলিকাতা : বঙ্গবাসী, ১৩১৪, পৃ. ১৭১।

৩ ক. অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ভাগবত: ২.১০.১
অর্থাৎ (১) সৃষ্টি, (২) বিসৃষ্টি, (৩) স্থান, (৪) পোষণ, (৫) ঊতয়ঃ=কর্মবাসনা, (৬) মন্বন্তর (৭) ঈশানুকথা (৮) প্রলয় (৯) মুক্তি এবং (১০) আশ্রয়।
শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী (অনূ), *শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধ,* ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ৪৫৭

খ. সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চেৎ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনম্।
কর্মণাং বাসনাবার্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্।
উৎকীর্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ৪.১৩৩.৮-৯
অর্থাৎ (১) সৃষ্টি, (২) বিসৃষ্টি, (৩) স্থিতি, (৪) পালন, (৫) কর্ম, (৬) বাসনা, (৭) ক্রমানুসারে মনুগণের বর্ণনা, (৮) প্রলয় বর্ণন, (৯) মোক্ষ নিরূপণ এবং (১০) শ্রীহরি ও অন্যান্য দেবগণের পৃথক গুণকীর্তন।
শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্, *শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্,* শ্রীশ্রী ভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ ও শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ (সম্পা.), কলিকাতা, ১৩৯০, পৃ. ১৭২১।

গ. উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ ।
বংশ্যানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্ ॥
দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্ ।
বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্। ॥
দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যদ্ বিদ্যতে ভুবি ।
তৎ সর্বৎ বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ মৎস্য. ২, ২২-২৪
উৎপত্তি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভুবনবিস্তার, দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম বিভাগ, ইষ্টপূর্ত ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা।
ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা,* কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৬।

৪ অয়ং হ্যপপুরাণৈকঃ শ্রীমদ্ভাগবতং যথা ॥ বৃহ. ৩.২১.৬(খ)
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.) *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্,* কলিকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ৩৭১।

৫ Maurice Winternitz, *A History of Indian Literature,* Vol. 1 (Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2003), pp. 554-555.

৬ প্রাবর্ত্তয়ৎ তথা পুণ্যং পুরাণং ধর্ম্মসংজ্ঞিতম্ ॥ বৃহ. ১,১.১২(ক)
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.) *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২।

৭ আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্য যস্মাৎ প্রবর্ততে ॥
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্ নান্দীতি সংজ্ঞিতা। ১/৫/২৪(খ)-২৫(ক),
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *ভরত নাট্যশাস্ত্র,* ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১০৫।

৮ পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥ বৃহ. ১/২/৩৩
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.) *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭।

৯ মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।
দেবী ভুরবনিঃ শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা ॥
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥
দুঃখহন্ত্রীতি নামানি মাতুরেবৈকবিংশতিম্ । বৃহ. ১/২/৪১-৪৩(ক)
প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১০ অমিথ্যাবচনং সত্যং স্বীকারপ্রতিপালনম্ ।
প্রিয়বাক্যং গুরোঃ সেবা দৃঢ়ঞ্চৈব ব্রতং কৃতম্ ॥
আস্তিক্যং সাধুসঙ্গশ্চ পিতুর্মাতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
শুচিত্বং ত্রিবিধঞ্চৈব হ্রীরসঞ্চয় এব চ ॥ বৃহ. ১.২.২-৩
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১১ অনসূয়াল্পসন্তোষ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অসঙ্গমো মৌনমেবং দেবপূজাবিধৌ মতিঃ ॥
অকুতশ্চিন্তয়ত্বঞ্চ গাম্ভীর্য্যং স্থিরচিত্ততা।
অরুক্ষভাবঃ সর্ব্বত্র নিস্পৃহত্বৎ দৃঢ়া মতিঃ ॥
বিবর্জ্জনং হ্যকার্য্যাণাং সমঃ পূজাপমানয়োঃ ।
শ্লাঘা পরগুণেঽস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং ধৃতিঃক্ষমা ॥
আতিথ্যঞ্চ জপো হোমস্তীর্থসেবার্য্য সেবনম্ ।
অমৎসরো বন্ধমোক্ষজ্ঞানং সন্ন্যাসভাবনা ॥
সহিষ্ণুতা সুদুঃখেষু অকার্পণ্যমমূর্খতা ।
এবমাদিগুণা বিপ্র শান্তিত্বেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ বৃহ. ১/২/৬-১০,
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১২ তাড়নং ম্রিয়তাংবাক্যং স্পর্শনং তালপত্রতঃ ।
পাদাঘাতং ভক্ষরোধং বর্জ্জয়েদ্গোষু মানবঃ ॥
গোগৃহেষু সধূমঞ্চ ক্ষৌরঞ্চামিষভোজনম্ ।
পীঠাসনং প্রাণিদাহং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা ॥
মিথ্যাবাক্যং প্রাণিহিংসাং ভৃষ্টদ্রব্যস্য ভোজনম্ ।
পরান্নভোজনঞ্চৈব দ্বাদশৈব বিবর্জ্জয়েৎ ॥
গবাপরাধদণ্ডঞ্চ গৃহস্থানাং ন কারয়েৎ ।
এতান্ দ্বিজেন্দ্র গোধর্ম্মান্ গৃহী কুর্য্যাৎ সুখং লভেৎ ॥
কৃষকস্ত্ত বাহয়েদ্গাং সার্দ্ধপ্রহরমেব হি ।
ততোঽধিকং বাহয়ন্ গাং গোবধ্যপাতকী ভবেৎ।
উচ্ছিষ্টান্নং তথা গোভ্যো ন দদ্যান্মানবঃ ক্বচিৎ ॥ বৃহ. ৩,৬,৪১-৪৫
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১।

১৩ স্বাধ্যায়েনাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞেন তপসাপি বা ।
ন প্রাপ্নোতি গৃহী লোকান্ যথা চাতিথিপুজনাৎ ॥
ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন পূজয়েৎ ।
ধন্যং যশাস্যমায়ুষ্যং স্বর্গঞ্চাতিথিপূজনম্ ॥ বৃহ. ৩/৫/৩৫-৩৬
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

১৪ ক. অতিথির্যস্য ভবনান্নিরাশো যাতি সর্ব্বথা।
সর্ব্বপুণ্যপরিত্যক্তো ভজেৎ পাপানি স ক্ষণাৎ ॥ বৃহ: ১/৩/২৯
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* ১০।

খ. অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ বিষ্ণুপুরাণম্; ৩/৯/১৫।
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বিষ্ণুপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৬।

১৫ বৃহ: ১/৩/৩৮(ক)
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১।

১৬ ইতোহপি কথিতঃ শ্রেয়ান্ মন্ত্রজ্ঞানপ্রদো গুরুঃ ।
ন তে স্বে পতিপুত্রাদ্যা যে ন মৃত্যোর্বিমোচকঃ ॥ বৃহ: ১.৪.১
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১৭ শান্তং সুশীল ধর্ম্মজ্ঞং শাস্ত্রজ্ঞং চারুদর্শনম্ ।
দয়ালুং পুত্রিণং দান্তং গৃহস্থং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥
বয়োজ্যেষ্ঠমপিতরমভ্রাতরমবৈরিণম্ ।
অমাতামহমজ্ঞানশাঠ্যশূন্যং তথা যতিম্ ॥
অন্তর্ব্বহিস্ত্যুল্যচেষ্টং সদা সস্মিতভাষণম্ ।
গৃহেঽনাসক্তবৎসন্তং স্বয়ং যোগ্যো গুরুং ভজেৎ ॥ বৃহ. ১/৪/৬-৮
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১৮ বয়োহীনাজ্জ্ঞানহীনাদ্ বিদ্যাহীনাৎ তথৈব চ ।
জাতিহীনাদ্ গুরোর্মন্ত্রং গৃহ্নীয়ান্ন কদাচন ॥
মুর্খাদাশ্রমহীনাচ্চ পিতুঃ সন্ন্যাসিনস্তথা ॥
রোগিণো বংশহীনাচ্চ ভার্য্যাহীনাৎ তথৈব চ।
মন্ত্রক্ষিপ্তাত্তথা মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ কদাচন ॥
বিষ্ণুমন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদ্ বিষ্ণুভক্তিবিহীনতঃ।
ন চ শৈবান্ন শাক্তাচ্চ গৃহ্নীয়াদবৈষ্ণবাদ্ দ্বিজাৎ ॥
বয়োহীনাৎ তথাল্পায়ুর্জ্ঞানহীনাদপণ্ডিতঃ।
বিদ্যাহীনাদ্ ভবেন্মূঢ়ো জাতিহীনাৎ ক্ষয়ো ভবেৎ ॥
মুর্খান্ মুর্খো ভবেৎ সদ্যো দুঃখী স্বাশ্রমহীনতঃ ।
যশোহানিঃ পিতুশ্চৈব মৃত্যুঃ সন্ন্যাসিনস্তথা ॥
রোগিণো ব্যাধিযুক্তশ্চ নির্বংশোর্বংশাহীনতঃ ।
ভার্য্যাহীনোঽস্ত্রীহীনান্মন্ত্রক্ষিপ্তাৎ তু তৎসমঃ ॥ *ব্রহ্মবৈবর্ত:* ৩/৮৩/৪২-৪৮
শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্, *শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্,* শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ ও শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪২৪।

১৯ উর্দ্ধতিষ্ঠেদ্গুরোরগ্রে লব্ধানুজ্ঞো বসেৎ পৃথক।
নিবীতবাসা বিনয়ী ভীতস্তিষ্ঠেদ্গুরোঃ পুরঃ ॥
গুরৌ তিষ্ঠতি তিষ্ঠেত উষিতেংয়াজ্ঞয়া বসেৎ ॥ বৃহ: ১/৪/১৩
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭।

২০ যত্র বাট্যাং গৃহস্থস্য কোণ ঈশাননামকে।
জায়তে শ্রীফলতরুর্ন তত্র বিপদঃ ক্বচিৎ ॥
পূর্ব্বস্যাং সুখদঃ স স্যাদ্দক্ষিণে যমভীতিহা।
পশ্চিমে চ প্রজাদায়ী বৃক্ষো বিল্ব উদাহৃতঃ ॥ বৃহ: ১/১১/২৮-২৯
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

২১ ক. নামতোঽমলক ইত্যপি সখ্যৌ
রোপিতঃ কমলয়াথ ময়াপি ॥ বৃহ. ১.১২.৩.
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

খ. ততো জাতা দ্রুমাঃ পৃথ্ব্যাং চত্বারো বিমলপ্রভাঃ ।
খ্যাতা ত্বামলকীনাম্না জাতাঃ কাদমলাদ্‌যতঃ ॥
শ্যামলচ্ছদবৃত্তান্তে কর্ব্বুরস্কন্ধমূলকাঃ।
শিরাগ্রথিপর্ব্বালী পত্রমালৈকপত্রকাঃ ॥ বৃহ: ১/১২/২২-২৩
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

২২ প্রভাস ইতি বিখ্যাতো দেশঃ পুণ্যতমঃ সখি ।
যত্র চন্দ্রো দক্ষশপ্তো বিমুক্তো যক্ষ্মণা বভৌ ॥
ততঃ পশ্চিমতো নাম্না তীর্থং সখৌ পৃথুদকম্ ।
যত্রাব্ধিঃ স্বয়মাগত্য স্নাতি প্রতিদিনং দিনম্ ॥
ততো বিন্দুসরো নাম তীর্থং সখ্যৌ সুবিশ্রুতম্ ।
বিধের্যত্র গতস্যাভুদানন্দাশ্রুস্রবো বহুঃ ॥
যত্র স্বয়ং তপস্তেপে কর্দ্দমো বৈ প্রজাপতিঃ ।
তত উত্তরতস্তীর্থং ব্রহ্মতীর্থমিতি শ্রুতম্ ।
যত্র পুর্ব্বমুখী দেবী নদী যাতি স্বরস্বতী ॥
তস্য পশ্চিমতো নাম নৈমিষ্যারণ্যমুত্তমম্ ।
সততং যত্র মুনয়স্তিষ্ঠন্তি সৎক্রিয়ান্বিতাঃ ॥ বৃহ.১/১৩/২-৬
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২৩ জম্বুদ্বীপক্ষিতৌ তত্র ভারতং বর্ষমুত্তমম্ ।
তত্রাপি নৈমিষারণ্য তীর্থং পরমমুচ্যতে ॥ বৃহ: ১/১৩/৩১
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

২৪ রাজদ্বারং বান্ধবার্থে প্রগচ্ছেৎ পারগোঽপি চেৎ।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ বৃহ: ১/৪/২৩
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭ ।

২৫ বৃহ: ১/১৪/২৫,
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

২৬ বৃহ: ৩/১০/৫৭-৬৩,
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪-৩২৫।

২৭ আয়ুর্ব্বৃদ্ধিশ্চ ভবিতা ধর্ম্মবৃদ্ধির্দিনে দিনে।
ন চাপি কলহং দ্বেষং পাপকর্ম্ম চ কিঞ্চন ॥
পৈশুন্যাদি চ নো কুর্য্যান্ন চাধ্যয়নপাঠনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভ্রাতৃন্ ভগিনীরপি পূজয়েৎ ॥ বৃহ: ১/১৫/৩৭-৩৮
প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

২৮ তস্যাভবন্ মুখাদ্বিপ্রাঃ সর্ব্ববেদসমাশ্রয়াঃ ।
বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ প্রজাপালনহেতবে ॥
উরুতো বণিজো জাতা ধনরক্ষণহেতবে ।
ত্রয়াণাং সেবনার্থায় শূদ্রো জাতস্তু পাদতঃ ॥ বৃহ: ৩/১/৫-৬
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

২৯ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ গীতা, ৪/১৩
অর্থাৎ-

ক. প্রকৃতি কে তিনোং গুণোং ওর উনসে সম্বন্ধ কর্ম কে অনুসার
মেরে দ্বারা মানব সমাজ কে চার বিভাগ রচে গয়ে।
যদ্যপি মৈং ইস ব্যবস্থা কা স্রষ্টা হুঁ, কিন্তু তুম যহ
জান লো কি মৈং ইতনে পর ভো অব্যয় অকর্তা হুঁ।
শ্রীশ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (সম্পা.), এবং ডা. শিবগোপাল মিশ্র (অনু.),
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মুম্বাই, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ১৬০।

খ. চারিবর্ণ সৃষ্টি মোর গুণ কর্ম ভাগে।
যার যাহা গুণ হয় কহিব সে আগে ॥
তথাপি সে নহি আমি গুণ কর্ম মাঝে।
যদ্যাপি নিয়ন্তা আমি সকলের কাজে ॥
শ্রীশ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (সম্পা.) এবং শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী (অনু.),
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, লণ্ডন, ১০ম সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ২৮৩।

৩০ অনসূয়া দয়া ক্ষান্তিঃ শৌর্য্যমার্জ্জবনিঃস্পৃহা ।
অকার্পণ্যমনালস্যং তথান্যৎ সার্ব্ববর্ণিকম্ ॥ বৃহ: ৩/১/১৯
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯০ ।

৩১ ক. নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
জীবঃ সদা কর্ম্মবশো যাবৎ তত্ত্বং ন গচ্ছতি ॥
তস্মাৎ তত্ত্বার্থিনা বিপ্র সদা জীবেন কর্ম্ম বৈ।
কর্ত্তব্যং ন তু তৎ ত্যক্ত্বা দূরতস্ত্বো হ্যধঃ পতেৎ ॥ বৃহ: ৩/১/১১
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

খ. ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতির্জৈগুণৌঃ ॥ গীতা, ৩/৫
শ্রীশ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (সম্পা.), এবং ডা. শিবগোপাল মিশ্র (অনু.),
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

অর্থাৎ-

খ(১) প্রত্যেক ব্যক্তি কো প্রকৃতি সে অর্জিত গুণোং কে অনুসার বিবশ হোকর কর্ম করনা পড়তা হৈ, অতঃ কোই ভী এক ক্ষণভর কে লিএ ভী বিনা কর্ম কিয়ে নহোং রহ সকতা ॥
প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

খ(২) ক্ষণেক সময় মাত্র না করিয়া কর্ম ।
থাকিতে পারে না কেহ স্বাভাবিক ধর্ম ॥
প্রকৃতির গুণ যথা সবার নির্বন্ধ ।
সেই কার্য করে যাতে করমের বন্ধ ॥
শ্রীশ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (সম্পা.) এবং শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী (অনু.),
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

খ(৩) Everyone is forced to act helplessly accornding to the qualities he has acquired from the modes of material nature; therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, *BHAGAVAD-GITA AS IT IS* (Mumbai: The Bhaktivedanta Book Trust, 34th printing, September, 2008), p. 151.

৩২ কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ গীতা, ২/৪৭
শ্রীশ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (সম্পা.) এবং শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী (অনু.),
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।
অর্থাৎ-

ক. নিজ অধিকার মাত্র কর্ম করে যাও।
কর্মফল নাহি চাও আসক্তি ঘুচাও ॥
কর্মফল হেতু সদা না হইবে তুমি
অনুকূল কর্ম যেই সেই কর্ম ভূমি ॥
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

খ. তুম্হেং অপনা কর্ম (কর্তব্য) করনে কা অধিকার হৈ, কিন্তু কর্ম কে ফলোং কে তুম অধিকারী নহোং হে।
তুম ন তো কভী অপনে আপকো অপনে কর্মোং কে ফলোং কা কারণ মানো, ন হি কর্ম ন করনে মেং কভী আসক্ত হোয়ো।
শ্রীশ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (সম্পা.), ডা. শিবগোপাল মিশ্র (অনু.),
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথারূপ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯৩।

৩৩ দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্বীত কুর্বাণঃ পিতৃহা ভবেৎ ॥ বৃহ: ৩/২/২২
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩।

৩৪ সত্যং শান্তিঃ ক্ষমাহিংসা বৈধহিংসাল্পতোষিতা।
দয়া দানঞ্চ ভিক্ষা চ পরানুদ্বেগকারিণী ॥
সৌজন্যং বিনয়শ্চৈব যজনং যাজনং তথা।
প্রতিগ্রহশ্চাধ্যয়নাধ্যাপনে স্বল্পভোজনম্ ॥

অনামিষাশনঞ্চৈব ব্রতং সূর্যস্য সেবনম্ ।
অগ্নিসেবা গুরোঃ সেবা গোসেবা নীচতোঽর্থনা ॥ বৃহ: ৩/২/২-৪
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

৩৫ প্রতাপমগ্নেঃ প্রভুতামিন্দ্রাচ্চন্দ্রাচ্ছ্রিয়ৎ যমাৎ ।
ক্রোধং ধনং কুবেরাচ্চ নীত্বা সত্ত্বং জনার্দ্দনাৎ ।
রাজ্ঞঃ শরীরং ক্রিয়তে বিধাত্রা ধরণীতলে। বৃহ: ৩/৩/৮-৯
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

৩৬ ন বধ্যো ব্রাহ্মণো বিপ্র স্ত্রী বৃদ্ধো বাল এব চ । বৃহ: ৩/৩/২১(খ)
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

৩৭ বৃহ: ৩/৩/১-৯
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

৩৮ সৈন্যানাং ভরণং কুর্য্যাৎ সেনাঙ্গং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্ ।
রথো হস্তী ঘোটকশ্চ পদাতিশ্চ দ্বিজোত্তম ॥
একো হস্তী রথশ্চৈকস্ত্রয়োঽশ্বাঃ পঞ্চ পত্তয়ঃ ।
পত্তিরেষা সমুদ্দিষ্টা ততস্ত্রিগণনাঃ পরে ॥
সেনামুখং যুগ্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ ।
অনীকিনী চ দশভিস্তাভিরক্ষৌহিণী তথা ॥ বৃহ: ৩/৩/৪৩-৪৫
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

৩৯ রাজ্ঞাং হি যুদ্ধমরণং স্বর্গদং পরমং মতম্ ॥ বৃহ: ৩/৩/৪৮(খ)
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

৪০ স্ত্রীবুদ্ধ্যা কর্ম্ম কুর্ব্বীত শাস্ত্রবুদ্ধ্যাবিশেষতঃ। বৃহ: ৩/৩/৫৩,
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

৪১ ক্রীণীতে যেন মূল্যেণ তস্য ষোড়শমংশকম্ ।
বিক্রীতলভ্যং কুর্য্যাৎ তু অধিকে ধর্ম্মহানিকং ॥
ঋণং দত্ত্বা মাসি মাসি দত্তষোড়শপাদকম্ ।
গৃহ্নীয়াদ্বদ্ধিমিত্যেবমিতিশাস্ত্রমতং হতম্ ॥ বৃহ: ৩/৪/৭-৮
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

৪২ দ্রোণাঢ়কাঙ্গুলীহস্তকুড়বাদি তথৈব চ।
মাষতোলকবুদ্ধ্যর্থং মানং কুর্য্যাৎ পৃথক ॥
কুর্য্যাৎ তাম্রৈঃ সেটকঞ্চ ত্রিংশতা ষড়ভিরেব চ।
তদর্দ্ধং তোলকং জ্ঞেয়মেতেন ক্রয়বিক্রয়ৌ ॥ বৃহ: ৩/৪/১১-১২
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

৪৩ অমাবস্যাপৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ ।
রবিবারে তথা ভানুসংক্রান্তাং দ্বাদশীতিথৌ ॥
পুণ্যাহেষু চ সর্ব্বেষু মৎস্যমাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥
মৎস্যং মাংস্যং মসূরঞ্চ মাষং নিম্বং তথার্দ্রকম।

রোহিতং শকুলঞ্চৈব তথৈব শফরাদিকম্ ।
শুক্লবর্ণং সশল্কঞ্চ মৎস্যং ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ ॥ বৃহ: ৩/৫/৪৪-৪৬
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

৪৪ সর্ব্বাঙ্গুলীভিরশ্নীয়াৎ কল্পয়েন্ন করৌ ক্বচিৎ।
নিঃশব্দং ভোজনং কুর্য্যান্নাঙ্গুলীপৃষ্ঠমাবহেৎ ॥ বৃহ: ৩/৫/৪৭
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

৪৫ বৃহ: ৩/৫/৩৭-৪১(ক)
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৬।

৪৬. আদৌ ঘৃতান্নমাহার্য্যং ব্যঞ্জনং শাকমাদিত। ।
ততঃ সুপাদি ভুঞ্জীত ক্ষীরান্নভোজনং চরেৎ ॥
ন ক্ষীরে লবং দদ্যন্নাম্লেষু গুড়মেব চ।
ক্ষীরং তথামিষং ভুক্ত্বা ন ভুঞ্জীত কদাচন ॥ বৃহ: ৩/৫/৪৮-৪৯
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

৪৭ মুখশুদ্ধিং ততঃ কুর্যাৎ তাম্বুলতুলসীদলৈঃ। বৃহ: ৩/৫/ ৬৫
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

৪৮ তে স্বাহান্তেন চাদৌ তু ব্যাহৃত্য প্রণবাক্ষরম্ ।
আয়ুষ্কামঃ প্রাঙ্মুখঃ সন্ সত্যকাম উদঙ্মুখঃ ॥
শ্রীকামঃ পশ্চিমাস্যশ্চদক্ষিণাস্যো যশোহর্থকঃ ।
জীবন্ পিতাবামাতা বা যস্য নাস্তি বিধিস্তথা ॥
পীঠে পাদং সমারোপ্য জলাধারঞ্চ বামতঃ ।
নাশ্নীয়াৎ পঙ্‌ক্তিমধ্যস্থোনত্যজেৎ পঙ্‌ক্তিমেব হি ॥ বৃহ: ৩/৫/৪১-৪৩
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

৪৯ ক. শক্তু অর্থ যবাদি চূর্ণ
শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সংস্কৃত বাংলা অভিধান,* কোলকাতা, ১৪০৮, পৃ. ৪১০।

খ. ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত তিক্ত-শক্তু-তিলাংস্তথা। বৃহ: ৩/৬/৯৮(ক)
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১৩।

৫০ ক. নতিঃ- নমস্কার, নম্রীভাব
শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সংস্কৃত বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩২।

খ. প্রণতি- প্রণাম, নম্রতা
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

গ. ন কুর্য্যান্নমনং দানং প্রণামঞ্চাশিষাৎ বচঃ ॥ বৃহ: ৩/৬/৯৮(খ)
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১৩।

৫১ যাত্রাকালে সবৎসঞ্চ ধেনুং দৃষ্টা সুখং ব্রজেৎ ।
দধি শুক্লঞ্চং কুসুমং সুন্দরীং হস্তিনং হয়ম্ ॥
দূর্ব্বাঞ্চ শুক্লধান্যঞ্চ জলপূর্ণ ঘটং তথা ।
শিবাং বিপ্রং শঙ্খচিল্লং খঞ্জনং সজ্জনং তথা ॥

পরার্থঞ্চ পরেণোক্তং মঙ্গলং বচনন্তু যৎ ।
বিল্ববৃক্ষং মৌক্তিকঞ্চ শঙ্খং জিগমিষুঃ স্মরেৎ ॥
দূরদেশং ন চৈকাকী তৃতীয়ী চ নহি ব্রজেৎ ।
ভদ্রাঞ্চ বারবেলাঞ্চ রিক্তাং পাপদিনানি চ ।
তিথিবারেষু দিগ্দোষান্ বর্জ্জয়িত্বা সুখং ব্রজেৎ ॥ বৃহ: ৩/৬/৪৬-৫০
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

৫২ নৈকঃ স্বপ্যাচ্ছন্যগেহে সুপ্ত নৈব প্রবোধয়েৎ ॥ বৃহ: ৩/৬/৬৪(ক)
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

৫৩ মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র অন্য কর্তৃক পালিত হলে সে পুত্রকে অপবিদ্ধ পুত্র বলে।
শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সংস্কৃত বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৬।

৫৪ বৃহ: ৩/৬/৬৮-৭৫
আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১১-৩১২।

৫৫ জননী গুরুপত্নী চ জ্যেষ্ঠসোদরপত্নিকা ।
শ্বশ্রূর্জ্যেষ্ঠা সোদরা চ পিতৃব্যস্ত্রী চ মাতুলী ॥
মাতুঃ পিতুঃ স্বসা চৈব নবেমা মাতরঃ স্মতাঃ।
পুত্রী কনিষ্ঠসোদর্য্যা পুত্রভার্য্যা তথৈব চ।
কনিষ্ঠসোদরস্ত্রী চ শিষ্যা পুত্রবধুস্তথা ॥
ভ্রাতুষ্পুত্রী ভাগিনেরী নবমী শরণাগতা।
সুতাপর্য্যায়কাস্ত্বে তাঃ স্নেহ-শাসনভাজনম্ ॥ বৃহ: ৩/৬/৮৪-৮৭
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩।

৫৬ গৃহস্থপ্রভবদ্বারা আশ্রমাঃ সর্ব্ব আবহি
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং হি গৃহস্থঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
যথানদ্যো নদ্যাশ্চাপি সাগরং যান্তি সংস্থিতিম্ ।
এবমাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থং যান্তি সংস্থিতিম্ ॥
যথা সমুদ্রমাশ্রিত সর্ব্বে জীবন্তি জন্তরঃ ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি ভিক্ষুকঃ ॥ বৃহ: ৩/৭/৩৪-৩৬
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬ ।

৫৭ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
হ্রীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশমং ধর্মলক্ষণম্ ॥ বৃহ. ৩/৭/ ৩৭
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।

৫৮ শরীরং কামসম্ভূতং ক্রোধশ্চাধর্ম্মসসম্ভবঃ ।
ক্রোধাদ্ভবতু সম্মোহ আশা তস্মাদ্ভবিষ্যতি ॥
ততোভবেৎ তুব্যামোহোব্যামোহাল্লোভ উদ্ভবেৎ ।
লোভাদ্ভবেৎ তথাচিন্তাচিন্তয়াজায়তে জ্বরা ॥
জরায়াজায়তেব্যাধির্ব্যাধিতো মরণং ভবেৎ । বৃহ.৩/১২/৪৪-৪৬ (ক)
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।

৫৯ তত্র জ্বরোঽভবজ্জ্যেষ্ঠস্ত্রিশিরানবলোচনঃ ।
ষড়্ভুজো হ্যষ্টদন্তশ্চ ভস্মবর্ণঃ কৃচেলক ॥ বৃহ.৩/১২/৬০(ক)
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

৬০ বৃথাচেষ্টাং বৃথাবাক্যং ন গৃহস্থঃ সমাচরেৎ ॥ বৃহ. ৩/৬/৫৯ (খ)
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

৬১ আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শন্নিশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ ।
একযানাসনাভ্যাঞ্চ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্ ॥ বৃহ.৩/২০/১৪
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।

৬২ বৃহ.৩/১৪/৩০-৭০
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৬

৬৩ গুরুং শিষ্যাঃ পতিং ভার্য্যাং পিতরৌ চ সুতাদয়ঃ ।
অবমংস্যন্তি সততং দুর্ব্বাচোভির্বিষোপমৈঃ ॥
খলাশ্চ পিশুনাশ্চৈব দাম্ভিকা মৎসরা অপি ।
সাধুংশ্চৈবাবমংস্যন্তি তন্মহং কলিকস্পিতম্ ॥
দীর্ঘাকারাঃ স্ত্রিষুঃ সর্ব্বা দন্তর বা বিবর্ণিকাঃ ।
খর্ব্বা বা ক্রোধকহুলা দুষ্টাঃ স্ত্রীলক্ষণাঃ কলৌ ॥
ব্রাহ্মণাস্তু শ্যামবর্ণা দন্তরাঃ ক্ষীনদেহিনঃ ।
শঠত্বলক্ষণা বিপ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥
শূদ্রা অত্যন্তগৌরাঙ্গা অল্পশ্মশ্রুধরাস্তথা ।
দন্তরাশ্চ বিশেষেণ ভবেয়ুঃ শঠলক্ষণাঃ ॥
কুজা নিম্নদৃশশ্চৈব দীর্ঘজঙ্ঘী মহোদরঃ ।
বহ্বাহারাঃ সদাদম্ভাঃ কলৌ বর্ণ দ্বিজোত্তম ॥ বৃহ: ৩.১৯./৩১-৩৬
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭।

৬৪ দেবাস্ত্যক্ষ্যন্তি পৃথিবীং ম্লেচ্ছমাত্রসমাবৃতাম্ ॥
ততো ভবেদনাবৃষ্টিরতিবৃষ্টিঃ পুনঃপুনঃ ।
পরস্পরবিরোধেন তে সুবিষ্যন্তি সর্ব্বশঃ ॥
ততো হরিঃ স্বয়ং দেবঃ কল্কিনামা ভবিষ্যতি।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছান্ বলাদ্ধত্বা হ্যন্তর্দ্ধানং করিষ্যতি ॥
ততঃপৃথ্বী পূর্ব্বজীর্ণা দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ।
ঝঞ্ঝাবায়ুক্ষীণভূতা জলে মগ্না ভবিষ্যতি ॥ বৃহ.৩.৩./১৯ (খ)
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮।

৬৫ পরোপকারকর্ম্মাদৌ যো হন্তা স্যাৎ কুধীর্জ্জনঃ।
স এবাধর্ম্মবহুলো মুখং তস্য ন দৃশ্যতে ॥ বৃহ.৩.২০/১১
প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৯।

৬৬ ইদং হি বৈষ্ণবং শাস্ত্রং শৈবং শাক্তং তথৈব চ ।
সাংখ্যযোগঃ পরঞ্চৈতৎ সাধ্বাত্মাজ্ঞানদং দ্বিজ ॥ বৃহ. ৩.২১./৫
প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭১।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

আবুল মনসুর আহমদের সংস্কৃতিচিন্তা ও বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

মো: চেঙ্গীশ খান*

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) একটা নিজস্ব মতাদর্শ ছিল, যা প্রচলিত ধারণা থেকে ব্যতিক্রম। বিভাগপূর্ব বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলার মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা সৃষ্টির আন্দোলনকে বেগবান করতে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটা বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে এ সম্পর্কিত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান পর্বের শেষদিকে তিনি এই আন্দোলনকে একটা ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছিলেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পকিস্তানের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পশ্চিম-বাংলা ও পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র বিবেচনা করেছেন অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত অখণ্ড বাঙালি জাতিকে যেমন ধর্মের বিচারে খণ্ডিত করতে চেয়েছেন, তেমনি আবার ধর্মকে অস্বীকারের মাধ্যমে পাকিস্তানি জাতীয়তাকে ভ্রান্ত প্রতিপাদন করে পূর্ব- পাকিস্তানকে একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদও নয়, পাকিস্তানি মুসলিম জাতীয়তাবাদও নয়— এর মাঝামাঝি একটা ধারা অর্থাৎ বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদের মতাদর্শই তাঁর মননের ভিত্তি। ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর এই মতাদর্শকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বলা না গেলেও ১৯৭১-পরবর্তী স্বাধীন-সার্বভৌম ও ধর্মনিরেপেক্ষ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সার্বিক বিচারে এটাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিতর্কিত বলা যায়। তবে প্রবন্ধ লেখাকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে প্রবন্ধগুলো বিবেচনা করলে তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে সঙ্গত বলেই মনে হবে। কিন্তু মোহমুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে 'আয়না'র স্রষ্টার সাম্প্রদায়িক মনোভাব কোনোক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। যদিও সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলো আলোচনার দাবি রাখে।

ক. সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কালচার ও সভ্যতা: পারস্পরিক সম্পর্ক

আবুল মনসুর আহমদ সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে বিভাগ-পূর্ব বাংলা, পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক

* সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ক্রান্তিলগ্নে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও এসব পরামর্শ ছিল সমকালীন প্রেক্ষাপটে নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে অনেকটা পক্ষপাতমূলক। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা মোট চারটি: *বাংলাদেশের কালচার* (১৯৬৬), *শেরে-বাংলা হইতে বংগবন্ধু*, (১৯৭৩) *End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution* (১৯৭৫) ও *বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা* (১৯৮২)।

বাংলাদেশের কালচার গ্রন্থের (*পাক-বাংলার কালচার* নামে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সনে) নামপ্রবন্ধ 'বাংলাদেশের কালচার' নামকরণ থেকে তাঁর সংস্কৃতি-বিষয়ক চিন্তার মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডকেই তিনি আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির আধার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 'বাংলাদেশের কালচার', 'সাহিত্যের প্রাণ, রূপ ও আংগিক', 'পাক-বাংলার রেনেসাঁ', 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি', 'বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা' ও বিভিন্ন ইংরেজি প্রবন্ধে লেখক বাঙালির কালানুক্রমিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করেছেন এবং পশ্চিমবাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান তথা অখণ্ড ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যলোচনা করে তা থেকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে ইংরেজি শব্দ 'কালচারে'র (Culture) প্রতিশব্দ হিসেবে 'কৃষ্টি' শব্দকেই ব্যবহার করেছেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে কালচারই ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কিত তাঁর মত—

> কালচারের প্রতিশব্দরূপে আমরা সাধারণত 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি', 'তহ্যিব' ও 'তমদ্দুন' শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকি। ধাতুগত অর্থের দিক হইতে বিচার করিলে কিন্তু এর একটাও কালচারের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে 'কৃষ্টি' শব্দটা কর্ষণ, কালটিভেশন বা চাষ অর্থে কালচারের পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হয় বলিয়া অন্য দুইটি শব্দের চেয়ে এটাই কালচারের বেশি কাছাকাছি— ইংরেজিতে যাকে বলা হয় রিফাইনমেন্ট, আরবীতে যাকে তহযীব বলা হয়, সংস্কৃতি শব্দটা সেই অর্থে কালচার অপেক্ষা সিভিলিযেশনের প্রতিশব্দ রূপেই অধিকতর উপযোগী।[১]

অবশ্য কালচার শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতদের মধ্যেও কালচারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় কালচারের প্রতিশব্দ ও তার পরিধি নিয়ে উনিশ শতকের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি কালচারের বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'অনুশীলন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) গ্রন্থে গুরু-শিষ্যের তাত্ত্বিক আলোচনার ছলে ধর্মজিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্বতত্ত্ব, অনুশীলন, সুখ, শান্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতির মাধ্যমে ধর্মের সাথে কালচারের সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন।

> বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কালচারের ধারণাটিকে নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং তাকে বাঙ্গলায় রূপান্তরিত করেছিলেন 'অনুশীলন' নামে। অনুশীলন বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন উন্নতির ও উৎকর্ষের

> লক্ষ্যে মানুষের চিন্তার ও কর্মের ব্যাপার একত্র যুক্ত করলে যে ধারণাটি দাঁড়ায়, সেই রকম একটি ধারণা। ...বঙ্কিমচন্দ্র যে-অনুশীলনের কথা বলেছিলেন তার অন্তর্ভুক্ত ছিল মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের প্রয়াস— শুধু ব্যক্তিমানুষ নয়, সামাজিক মানুষ, রাষ্ট্রীয় মানুষ, বৈশ্বিক মানুষ। অনুশীলনতত্ত্ব উদ্ভাবনে তাঁর অভীষ্ট ছিল ব্যক্তিকে পুনর্গঠিত করা, সমাজকে রাষ্ট্রকে জাতিকে পুনর্গঠিত করা, বিশ্বব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা।[২]

গুরুরূপী বঙ্কিমচন্দ্র শিষ্যকে তাই বলেছেন—

> যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য উদ্ভিদ ছিল— কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলোর অনুশীলন তাই। এ জন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম Culture. এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, 'The substance of Religion is Culture.' 'মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম।' ...যে শিশু দেখিতেছ, তাহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুক্ত, সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।[৩]

মানুষের বৃত্তিগুলোর অনুশীলন বা কর্ষণ থেকেই কালচার অর্থে কৃষ্টি শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছিল। "কালচার অর্থে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অনুশীলনের বদলে 'কৃষ্টি' শব্দটি চালু করতে চেয়েছিলেন, এবং তা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। পাশাপাশি বৈদগ্ধ্য, শিক্ষা— এসব শব্দও ব্যবহৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দটির সঙ্গে কৃষির অনুষঙ্গ দেখে কালচার অর্থে কৃষ্টির ব্যবহারে বিরক্তবোধ করতেন। বহুদিন ধরে একটি যুৎসই শব্দ খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় মারাঠী ভাষার 'সংস্কৃতি' শব্দটির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং কালচার অর্থে সংস্কৃতি শব্দটিকে তিনি বাংলাভাষায় চালু করেন। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন, "সংস্কৃতি শব্দটি চালু করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দটির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন।"[৪] **'কৃষ্টি'** শব্দটি 'কৃষ্' ধাতুর সঙ্গে 'ক্তি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ও ল্যাটিন Col ধাতু থেকে Culture শব্দটি উৎপন্ন হওয়ায় এবং এই শব্দের সঙ্গে কৃষি, কর্ষণ, চাষ প্রভৃতির সম্পর্ক থাকায় রবীন্দ্রনাথ Culture-এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'কৃষ্টি' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের এই আপত্তির কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠিতে লিখেছিলেন—

> সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ প্রকর্ষ শব্দের ধাতুগত অর্থে চাষের ভাব আছে, কিন্তু ব্যবহারে সেই অর্থ কেটে গেছে। কৃষ্টিতে তা কাটেনি। সেই জন্য তোমাদের সম্পাদকবর্গের কাছে আমার এই প্রশ্ন, চিত্তপ্রকর্ষ চিত্তোৎকর্ষ শব্দটাকে কালচার অর্থে চালালে দোষ কি? কালচারড্ মানুষকে প্রকৃষ্টচিত্ত লোক বলা যেতে পারে। কালচারড্ ফ্যামিলিকে প্রকর্ষবান পরিবার বললে সে পরিবার গৌরববোধ করে। কিন্তু কৃষ্টিমান বললে চন্দনের সাবান মেখে স্নান করতে ইচ্ছে হবে।[৫]

নীহাররঞ্জন রায় 'কৃষ্টি' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন— " 'কৃষ্টি' শব্দটি 'সংস্কৃতি' শব্দটির চেয়ে বেশি অর্থবহ এবং সেই হেতু বেশি যুক্তিসিদ্ধ।"[৬] তবে সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় কালচারের প্রতিশব্দরূপে কৃষ্টির পরিবর্তে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সে-কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শক্রমে 'সংস্কৃতি' শব্দ ব্যবহারের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সনে 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'সংস্কৃতি' শব্দটি Culture বা Civilization অর্থে আমি প্রথমে পাই ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। Culture- এর বেশ ভালো প্রতিশব্দ বলে শব্দটি আমার মনে লাগে। আমার বন্ধু শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন— তিনি বললেন যে তাঁরা তো বহুকাল ধরে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার করে আসছেন। ১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। ...আমার বেশ মনে আছে, Culture এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, কৃষ্টি শব্দটি আর ব্যবহার করা ঠিক হয় না, এ কথাও বলেন।[৭]

এর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যবহার শুরু করেন এবং কালক্রমে এই শব্দটিই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আবুল মনসুর আহমদ 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার না করে কালচার শব্দটিই বেশি ব্যবহার করেছেন এবং বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'কৃষ্টি' শব্দের ব্যবহারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে লক্ষ্য করা যায় যে, এক সময় কালচার ও সিভিলিযেশন এক অর্থে ব্যবহৃত হতো কিন্তু এই দু'টি শব্দ যে এক নয় এবং এ দু'টি শব্দের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে লেখক তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কালচার ও সভ্যতার সংজ্ঞা-পার্থক্য ও তার সীমারেখা নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোনও এক ব্যাপারে একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার-বিধি, মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টর, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করলেই সেটাকে ঐ ব্যাপারে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হইয়া থাকে। ...সহজ কথায় ব্যষ্টি বা ইন্ডিভিজুয়্যালের যা ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি, সমষ্টি বা কমিউনিটির তা-ই কালচার। সকল লোকসমষ্টির অর্থাৎ সব কমিউনিটি বা জাতির একটা নিজস্ব সমবেত ব্যক্তিত্ব বা কর্পোরেট পার্সন্যালিটি আছে। তারই নাম ঐ লোকসমষ্টি বা কমিউনিটির কালচার। এই লোকসমষ্টি বা কমিউনিটিকে আমরা অবস্থানভেদে জাতি বা নেশন, উপজাতি বা ন্যাশন্যালিটি, সমাজ বা সোসাইটি এমনকি পরিবার বা ফ্যামিলি বলিতে পারি বলিয়া থাকি।
>
> ...কালচার আমাদের সামাজিক আমিত্ব। আমরা যা আছি তা-ই কালচার। কালচারকে মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করিলে সিভিলিযেশনকে মানুষের সম্পদের সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ আমাদের যা আছে, তা-ই আমাদের সিভিলিযেশন। ...এক জাতির একাধিক কালচার থাকিতে পারে বটে, কিন্তু একাধিক সিভিলিযেশন থাকিতে পারে না। অপর দিকে তেমনি বহু জাতির এক সিভিলিযেশন থাকিতে পারে বটে কিন্তু এক কালচার থাকিতে পারে না। কারণ কালচারের নিজস্বতা বা জাতীয় বা জাতীয় রূপ থাকিতেই হইবে, পক্ষান্তরে সিভিলিযেশনের কোন জাতীয় রূপ থাকিতে পারে না।[৮]

এছাড়া লেখক কয়েকটি চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে কালচার ও সভ্যতার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করেছেন। যেমন, বিয়ে-প্রথাটা একটি সভ্যতা। প্রাচীনকালে যখন এই বিবাহ-প্রথা ছিল না, তখন সেটা ছিল অসভ্যতা। এখনও কোনো জাতির মধ্যে যদি বিয়ে-প্রথা না থাকে তাকে আমরা অসভ্য বলি। কিন্তু সকল দেশে সকল জাতিতে বিয়ে করার রীতি এক রকম নয় বা এক-এক ধর্মে এক-এক রীতিতে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়— এই বিয়ে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন রীতিকে বলা হয় কালচার এবং সে-কারণে বিভিন্ন দেশ-জাতি-ধর্মের ভিন্নতায় কালচারের ভিন্নতাও দেখা যায়। তাই বিয়ের বিভিন্ন রীতিকে বলা হয় কালচার, আর বিয়ে-প্রথাকে বলা হয় সভ্যতা। তেমনি মানুষের জন্মের বা মৃত্যুর সময়েও কালচার ও সভ্যতার সীমারেখা নির্দেশ করা যায়। জন্মের পর বিভিন্ন রীতিতে যেমন নবজাতককে বরণ করা হয়, তেমনি মৃত্যুর পরও বিভিন্ন রীতিতে মৃতদেহের সৎকার করা হয়— জাতি-ধর্ম-বর্ণের এই বিভিন্ন রীতিকে বলা হয় কালচার। কিন্তু কোনো মেয়ে বা ছেলে সন্তানের জন্মের পর যদি জীবন্ত পুতে ফেলা হয়, তবে তা হবে অসভ্যতা। অপরদিকে বর্তমান হিন্দু-শাস্ত্র অনুযায়ী কোন স্বামীর মৃত্যুর পর যদি তার স্ত্রীকেও একই সাথে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবে তা হবে অসভ্যতা। সতীদাহ প্রথা এক সময়ে হিন্দু ধর্মীয় কালচার ছিল কিন্তু বর্তমানে তা নেই। তাই কালের পরিবর্তনে এক সময়ের কালচার পরবর্তী সময়ে অসভ্যতা হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং হয়েও থাকে। আবার কিছু বিষয় আছে যার খানিকটা কালচার ও খানিকটা সভ্যতা। লেখকের ভাষায়—

> মানুষ আদি কালে বনে-জঙ্গলে গুহায় বাস করত। স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া তারা সভ্য হইয়াছে। স্থপতি বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করিয়া অধিকতর সভ্য হইয়াছে, কাজেই আবাসগৃহ নির্মাণ সভ্যতা। কিন্তু স্থাপত্যের রূপ কি হইবে, দালান-ইমারত চূড়াওয়ালা বা গম্বুজওয়ালা হইবে, না চৌকোণা বা চ্যাপ্‌টা হইবে, ইট-পাথরের হইবে, না কাঠ বাঁশের হইবে— এ সব কালচারের ব্যাপার। কাপড় পরা-না-পরাটা সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি ধরনের পোশাক পরা হইবে, প্যান্ট না পাজামা, কোট না কোর্তা, শাড়ি-সেলওয়ার না স্কার্ট-গাউন — সেটা কালচারের প্রশ্ন। ...মন ও মস্তিষ্ক মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে পৃথক করিয়াছে, সেই মনের বিকাশের নাম কালচার, মস্তিষ্কের বিকাশের নাম সিভিলযেশন। ...সিভিলিযেশন একটা র‍্যাশনাল কনস্ট্রাকশন; আর কালচার একটা ইমোশন্যাল গ্রোথ।[৯]

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিল-অমিল নিয়ে বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যেও মতদ্বৈততা রয়েছে। গোপাল হালদার তাঁর *সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙালির সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ও বাঙালি সংস্কৃতির রূপ* গ্রন্থে সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্মের বিভিন্ন রূপ, পার্থক্য, সীমারেখা ও তার ইতিহাস সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পণ্ডিতের মতভেদ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কালচার অর্থে সংস্কৃতি, কৃষ্টি অর্থে লোকসংস্কৃতি বা প্রাথমিক কৃষিজীবীদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতা অর্থে পৌরসদাচার বা পৌরসংস্কৃতি বুঝিয়েছেন।[১০]

খ. গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি

বিভিন্ন যুগের সভ্যতার অবদানে কোনো সমাজের সংস্কৃতির গতি ত্বরান্বিত হলেও তার মূল প্রভাব পড়ে শহরাঞ্চলে এবং ধীরে ধীরে পল্লী অঞ্চলে তা পরিব্যাপ্ত হয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও যাতায়াত-যোগাযোগ থাকে শহরাঞ্চলের এবং সেই সূত্র ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে শহরে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, বিজ্ঞানের আধুনিক ব্যবহার, উন্নত জীবন-ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নত পরিবেশ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ও বিভিন্ন অফিস-আদালতের বদৌলতে শহরের মানুষ গ্রামের মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকে এবং সেখানেও এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যা কখনো স্থায়ী হয় না। তাই শহরের একই মহল্লার বা একই বাড়ির বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে মন-মানসিকতা, আচার-ব্যবহার ও অভ্যন্তরীণ রীতি-নীতির মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা সবাই তার নিজের গ্রামের সামাজিক সংস্কৃতি দ্বারা লালিত-পালিত। আবুল মনসুর আহমদের মতে— সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক ব্যক্তিত্ব, আর সে কারণে শহরে কোনো স্থায়ী সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির কারণে শিক্ষা-দীক্ষা ও আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া শহরাঞ্চলের মানুষ প্রথমেই সে-সবের ব্যবহার ও ভোগ-উপভোগ করতে পারে বলেই তাদের মধ্যে মনের বিকাশ ও দৃষ্টির প্রসারতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমেই তা পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। লেখকের মতে—

> শহরবাসীর চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, ভাবগতিক এক হইতে পারে না। ফলে শহরের বাসিন্দারা হয় মাল্টিকালার; শতরংগা, রং-বেরং এর লোক। পক্ষান্তরে পল্লীর লোকেরা হয় ইউনিকালার বা একরংগা। শহরের জনতার পরিবর্তন ঘটিতেছে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে। পল্লীর লোক দাদা-পরদাদা আমল হইতে চৌদ্দ পুরুষ ধরিয়া একই জায়গায় একই ধরনে বসবাস করিতেছে। এই কারণেই পল্লী-গ্রামের লোকদের মধ্যে সুখে-দুঃখে হাসি কান্নায় একটা আন্তরিক সমবেদনা ও আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আত্মীয়তা হইবে তাদের আনন্দে-উল্লাসে, আমোদে-প্রমোদে, শোকে-মাতমে, অভাবে-অনটনে, আচারে-ব্যবহারে পোশাকে-পরিচ্ছদে, চিন্তায়-ভাবনায়, প্রথায়-সংস্কারে, কাহিনী-কিংবদন্তিতে, এমনকি ভূত-প্রেত দর্শনে-শ্রবণে একটা একাকারত্ব বা ইউনিফর্মিটি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পল্লী-জীবনের অচঞ্চলতার মতই এই ইউনিফর্মিটি অচঞ্চল ও স্থায়ী। উপরে বর্ণিত সামাজিক আচারের সমাবেশ ও সমষ্টিই জাতির কালচার। পল্লী জীবনের ঐ ইউনিফর্মিটিই কালচারের বুনিয়াদ। এই জন্যই কালচারটা মূলত এবং প্রধানত পল্লীর সম্পদ। পল্লী জীবনই সে সম্পদের ধারক ও বাহক।[১১]

অন্যদিকে লেখক শহরকে কালচারের স্রষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন। শহরের মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় না হলেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফল শহরের মানুষই প্রথম গ্রহণ করে থাকে। শহরের কালচার নিত্যই পরিবর্তিত হয় এবং সে-কারণে শহরে কোনো স্থায়ী কালচার গড়ে ওঠে না। গ্রামের অগ্রসর শ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষা, অফিস-আদালত, ব্যবসায়-

বাণিজ্য এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় কাজে শহরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার তথা বিভিন্ন কালচারের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তা থেকে ভাল জিনিসগুলো নিজস্ব কালচারের অঙ্গীভূত হয়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। 'এই ভাবে শহরে কালচার সৃষ্টি হইয়া বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছুরিত হয় পল্লী-জীবনে। শহর যা করে সৃষ্টি, পল্লী করে তা ধারণ ও পালন।'[১২]

গ. ভূখণ্ডগত সংস্কৃতি

শহর ও গ্রামাঞ্চলের সংস্কৃতির এই আদান-প্রদান বা গ্রহণ-বর্জন মূলত সব যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। ভারতের ক্ষেত্রে বড়জোর বলতে গেলে তা বৃটিশ-শাসনের দু'শ বছর ও তার পরবর্তী কালের জন্য প্রযোজ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ক্ষেত্রে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে শুধু গ্রামই ছিল সংস্কৃতির স্রষ্টা, ধারক ও বাহক এবং একবিংশ শতাব্দীতে যেখানে তথ্য প্রযুক্তির তথা ইন্টারনেট-স্যাটেলাইটের বদৌলতে গ্রাম ও শহর একাকার হয়ে গেছে, সেখানে আকাশ-সংস্কৃতিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। আবুল মনসুর আহমদের সংস্কৃতি-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি তাই শুধু বৃটিশ শাসনকাল ও তার পরবর্তী পাকিস্তান-পর্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লেখক সুদূর অতীতের মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন আমল থেকে মুসলিম শাসনামল পর্যন্ত বাঙালি-মুসলমান সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস তুলে ধরে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। সেদিক থেকে লেখক শুধু বাঙালি মুসলিম সভ্যতার ক্রমবিকাশকে একচোখা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে বর্তমান বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে শুধু ভূখণ্ডগত বাঙালি-মুসলিম সংস্কৃতিই বলতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতির একজন ইতিহাসকার হিসেবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার না করে নিজেকে একজন শুধু মুসলমান বাঙালি হিসেবে সংস্কৃতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশকে শুধু বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ভূখণ্ড হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:

> জনগণের স্তরে বাংলায় দুইটি কৃষ্টি ছিল: একটা বাংগালী হিন্দু কালচার, অপরটা বাংগালী মুসলিম কালচার। বাংগালী হিন্দু কালচারটার সংগে যেমন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুদের কালচারের কোনও মিল ছিল না, বাংলার মুসলিম কালচারের সাথে তেমনি বাংলার বাহিরের ভারতীয় বা অন্য দেশের মুসলমানদের কালচারের কোনও মিল বা সম্পর্ক ছিল না। বাংলার অভ্যন্তরে কালচারের ভেদাভেদটা ধর্মভিত্তিক ছিল বটে, কিন্তু বাংলার বাহিরের সাথে এই দুই বাংগালী কালচারের ধর্মভিত্তিক কোনও মিল বা সম্পর্ক ছিল না। এখানেই কালচারের স্বকীয়তা ও নিজস্ব শক্তি। কালচার একই ভূখণ্ডে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, কিন্তু ভৌগোলিক এলাকার বাহিরে কালচারকে টানিয়া নিবার কোনও শক্তি ধর্মের নাই।[১৩]

বর্তমান বাংলাদেশ যে হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণের সমন্বয়ে সকলেরই আবাসভূমি- এ বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে শুধু বাঙালি মুসলমানের ভূখণ্ড হিসেবে প্রমাণ করতে যাওয়া মুক্তবুদ্ধির পরিচায়ক নয় বলে মনে করা যায়। এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষে লেখক কিছু যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে বর্তমান পাকিস্তানে দ্রাবিড়

নামক এক প্রাচীন সভ্য জাতির অধিবাস ছিল এবং ভারত উপমহাদেশে আর্যদের আগমনের দুই হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড়রা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দ্রাবিড়দের একটা অংশ বাংলাদেশের মাটির উর্বরতায় আকৃষ্ট হয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। এখান থেকেই লেখক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "বাংলার জনসাধারণ প্রধানত দ্রাবিড় জাতীয়। দ্রাবিড়রা আদিতে সেমেটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা বাবিলন অঞ্চল হইতে ইরান, মাকরান ও সিন্ধু হইয়া দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চল দিয়া বাংলায় আসে।"[১৪] এ কারণেই বাঙালি হিন্দুরা উত্তর ভারতীয় আর্য-হিন্দু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অনেকখানি স্বতন্ত্র। বাংলার আদিবাসীরা ধর্মগত দিক থেকে বৌদ্ধ হওয়ায় এবং বৌদ্ধরা সাম্যবাদী অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা সহজেই ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে সপ্তম-অষ্টম শতকেই বাংলার অনেক অধিবাসী মুসলমান হয়ে যায়। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে খলিফা হারুনর রশীদের আমলের (৭৮৪-৮০৯ খ্রিস্টাব্দ) একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়া থেকে বোঝা যায় যে, বখতিয়ার খিলজির বাংলা দখলের (১২০১-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় তিনশ বছর আগেই বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের (৭০৮-৭১১ খ্রিস্টাব্দ) মাধ্যমে সিন্ধুদেশে তথা ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ শুরু হয়। আবুল মনসুর আহমদ দেখিয়েছেন—

> পাক-ভারতের পশ্চিম-মধ্য উভয় অঞ্চলেই রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠার সাথে যেরূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পাক-বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাক-বাংলায় ইসলামের আগমন হইয়াছিল পাকিস্তানে ইসলাম প্রচারের প্রায় তিনশ বছর আগে। এটা ঘটিয়াছিল চাটগাঁ বন্দরের দওলতে এবং তার মধ্য দিয়া। চাটগাঁর এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ ১৫২১ সালে চাটগাঁর নাম রাখেন ফতেহাবাদ অর্থাৎ ইসলামের দরজা।[১৫]

লেখকের মতে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তেরো শতকের প্রথমে বখতিয়ার খিলজির মাধ্যমে বাংলায় প্রথম মুসলিম শক্তি প্রবেশ করে এবং তখন থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলায় মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়; কিন্তু তার অনেক আগেই চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে ও জনগণের একটা বড় অংশ সে-ধর্মে দীক্ষিত হয়। অর্থাৎ বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে উত্তর ভারত থেকে প্রবেশ করে, পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে দক্ষিণের সমুদ্রপথ দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। এজন্যই লেখক 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি' প্রবন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে চট্টগ্রামকেই বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি বলেছেন। আর সে কারণেই বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল মুসলিম শাসকের হাতে নয়, সুফি-দরবেশদের হাতে। সুফি সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইরানের জন্মগ্রহণ করেন ও ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন) ইরান, ইরাক ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করতে-করতে আরব বণিকদের সাথে চট্টগ্রামে আসেন। এভাবে সুফি-দরবেশদের দ্বারা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকেই চট্টগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের একটা

ভিত্তি গড়ে ওঠে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে মুসলিম শাসকদের সহায়তায় তা একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর মুসলিম বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে বাঙালি জাতির সৃষ্টি ও তাতে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তার সঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—

> প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলিম অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত — এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও বাঙালী জনসমষ্টির মূল কাঠামো গড়িয়া উঠে। এই সময়ে বঙ্গদেশ বিশাল ভূ-ভাগ। ...এই বিশাল ভূ-খণ্ডের জনসমষ্টি প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রধানতঃ আদি-অষ্ট্রেলীয় (Proto–Australoid) ও আলপাইনীয় (Alpinus) এই দুই প্রধান জনসমষ্টির সংমিশ্রণ।
>
> উক্ত দুই জনসমষ্টির সহিত প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মঙ্গোলীয় (Mongoloid) জনসমষ্টিভুক্ত মানুষের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ...ইহার পর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে বাঙালীর রক্তে এক নতুন মানবগোষ্ঠীর রক্ত মিশিতে লাগিল। এই সময় হইতে সেমীয় (Semitic) গোত্রের লোক বাঙলায় আসিতে থাকে। খলীফা হারুনু-র-রশীদের (৭৮৬-৮০৯) একটি মুদ্রা রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়া এই তথ্য প্রকাশ করিয়া দিতেছে। দেখা যায়, সেমীয় গোত্রের আরবেরা বাংলায় ধর্ম ও পণ্য প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন: আমীর বা সুলতানের অধীনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাহাদের একটি ক্ষুদ্র শাসনব্যবস্থাও (Pricipality) স্থাপিত হইয়াছে। সুলতান বায়িজিদ বিস্‌তামী (মৃত্যু ৮৭৪ খ্রী:), মীর সৈয়্যিদ সুলতান মাহমুদ মাহী-সওয়ার (১০৪৭ খ্রী:), শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমী (১০৫৩ খ্রী:), বাবা আদম শহীদ (১১১৯ খ্রী:), শাহ নিয়ামতুল্লাহ্ বুৎশিকন্ প্রভৃতি দরবেশ বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার করিতেছেন।[১৬]

এরই ধারাবাহিকতায় বিখ্যাত পীর-দরবেশ শাহ জালাল ১৩০৩ সনে সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট জয় করেন। অর্থাৎ এর বহু পূর্বেই সিলেটে মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এভাবেই আবুল মনসুর আহমদ বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলিম-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগেই এদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে এবং এ-কারণেই বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। অস্ত্রের জোরে নয়, বরং সুফি ও পীর-দরবেশদের প্রচেষ্টায় ইসলামের সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই আকৃষ্ট হয়ে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঘ. বাঙালি জাতি ও তার সংস্কৃতি

আবুল মনসুর আহমদ বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতির অতীত ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় বাঙালি জাতির উদ্ভব ও তার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সম্পৃক্ততা খুঁজে বর্তমান বাংলাদেশকে বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। তবে এটা ঠিক যে, বর্তমান বাংলাদেশই প্রাচীন কালের বঙ্গ এবং আর্য সভ্যতার খুব কম ছোঁয়াই এই ভূখণ্ডে এসে পড়েছে। মহেঞ্জদারো ও হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের পরে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্রাবিড়ভাষী জাতিই ভারতের প্রাচীনতম সভ্য জাতি। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ অব্দেরও

আগে ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশ ঘটে; পক্ষান্তরে ভারতে আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে।[১৭]

> সে সময় বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। একেকটি কোমের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল একেকটি জনপদ। প্রায় ক্ষেত্রে কোমের নামে জনপদের নাম হয়েছে— বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় নামের কোমেরা যে অঞ্চলে বাস করত, পরে সেই অঞ্চলের নাম হয়েছে যথাক্রমে বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ়। এদের ছিল আলাদা আলাদা রাষ্ট্র।[১৮]

তবে খ্রিস্টজন্মের পাঁচ-ছয়শো বছর আগে থেকেই বাংলাদেশের কৌমসমাজ ভেঙে গিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে এই কৌমসমাজ বা রাষ্ট্রগুলো কখনো বৃহৎ সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে, আবার কখনো স্বাধীনভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সম্রাট অশোকের (২৭৩-২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সময়ে উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপি থেকে জানা যায় মৌর্য যুগে (৩২৪-১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পুণ্ড্রনগর একটা সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সম্রাট অশোক এদেশকে একটি ধর্ম, একটি ভাষা এবং একটি লিপি দিয়ে বেঁধেছিলেন।[১৯] সম্রাট অশোকের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল এবং সে-সময়ের জনপ্রিয় জৈনধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্মের দিকেই মানুষ বেশি ঝুঁকেছিল।[২০] তবে গুপ্তযুগে (৩২০ থেকে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) এসে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে সামন্ত শাসক নতুন নতুন রাজ্য স্থাপন করলেও উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এ সময় শাসকবর্গের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা পায়। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে—

> জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রাজকীয় উদারতা থাকলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মই বিশেষ প্রশ্রয় পেয়েছিল। তারই ফলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং এঁরাই হয়ে ওঠেন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নিয়ন্তা। এঁদের অবলম্বন করেই বাংলাদেশে আর্যভাষা, আর্যধর্ম ও আর্য-সংস্কৃতির স্রোত বাংলাদেশে সবেগে আছড়ে পড়ল।[২১]

গুপ্ত যুগেই বাংলাদেশে আর্য-আদর্শ অনুযায়ী প্রথম একটা সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়ে ওঠে এবং এর পূর্বে আর্যরা বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশে আগমন করলেও আর্য-সংস্কৃতি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এ সম্পর্কে ড. এম. এ. রহিম বলেন:

> সম্ভবত বৈদিক যুগের শেষ ভাগে অথবা এর অল্প কিছুকাল পরেই বাংলায় আর্যদের উপনিবেশ ও আর্যসংস্কৃতি স্থাপিত হয়। যোদ্ধারূপে, বণিকরূপে এবং ধর্মপ্রচারকরূপে আর্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে; ফলে এ প্রদেশে এক নতুন শক্তির সঞ্চার হয়। আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি বাংলায় প্রবেশ লাভ করে। বাংলাদেশ থেকে অনার্য ভাষা লোপ পায় এবং বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম বাংলায় প্রসার লাভ করে। জাতিভেদ প্রথাসহ আর্যদের সামাজিক জীবন হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশে আর্য প্রভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং বাংলাদেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আর্যদেশে পরিণত হয়, যদিও অধিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু পুরাতন আচার-ব্যবহার, অভ্যাস

> ও বিশ্বাস থেকে যায়। আর্যদের পর বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আর কোনো উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী আগমন করে নাই।[২২]

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলার বিভিন্ন অংশ তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমেই (৬০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) রাজা শশাঙ্ক বাংলার বিভিন্ন জনপদ একত্র করে 'গৌড়' নাম দেন এবং স্বাধীন রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন—

> শশাঙ্কের পর হইতে পুণ্ড্র, গৌড়, ও বঙ্গ—এই তিন জনপদ যেন বাংলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে। 'বঙ্গ' নামে বাংলার বিভিন্ন জনপদকে একতাবদ্ধ করিয়া তুলিবার কাজ হিন্দু আমলে যে সাধিত হয় নাই, ইহা একরূপ সর্বজনস্বীকৃত মত। এই কাজ সাধিত হইয়াছিল মুসলমান আমলে।"[২৩]

রাজা শশাঙ্কের সময়ে বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ গৌড় নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ, যা বর্তমানের কানসোনা। এ সময়ে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেয়ে বাংলা ও আসামের সর্বত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে, কেননা রাজা শশাঙ্ক ছিলেন শৈব এবং এ সূত্রে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ বিদ্বেষী।[২৪] শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই একশ বছরে বাংলাদেশে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাকে মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলা হয়ে থাকে।[২৫] এরপর অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোনো এক সময় থেকে আরম্ভ করে প্রায় চারশ বছর ছিল পালবংশের রাজত্বকাল।

> পাল রাজত্বের এই চারশো বছর বাঙলীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই যুগেই হয়েছে আজকের বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন। আর্যপূর্ব ও আর্যসংস্কৃতিকে মিলিয়ে বাঙালীর যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এই যুগেই তার ভিৎ তৈরি হয়ে যায়।[২৬]

পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হওয়ায় এসময় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তবে এসময় বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল এবং তারই একটি শাখা তান্ত্রিক সহজযান বা সহজিয়া ধর্মমতের আচার্যরাই (যাঁরা সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন) প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের রচয়িতা।[২৭] দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে (১১২৫ খ্রিস্টাব্দে) কর্ণাটক থেকে এসে সেনবংশীয়রা এদেশের ক্ষমতায় বসেন। সেনরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের একটা জাগরণ সৃষ্টি হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে বখতিয়ার খিলজি দ্বারা (১২০১ খ্রিস্টাব্দ) বাংলাদেশ দখল হওয়ায় তা স্থায়িত্বলাভ করেনি।

প্রাচীন যুগে বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হওয়া বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ কীভাবে বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও পরিশেষে মুসলমান শাসকদের দ্বারা একতাবদ্ধ হয়েছে তার ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশকে বাঙালি

মুসলমানের আদি ভূ-খণ্ড হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। লেখক তাঁর 'বাংলাদেশের কালচার', 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি', 'বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা' প্রভৃতি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য বাঙালির ইতিহাসের প্রচলিত ধারণা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র।

> কি নৃতত্ত্বের দিক হইতে, কি ভাষা কৃষ্টির দিক দিয়া পাক-বাংলা আর্য-ভারত হইতে বরাবরই ছিল পৃথক। আর্যরা কোনও দিনই পারে নাই বাংলা জয় করিতে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এ দেশ দ্রাবিড়ের দখলে ছিল। দ্রাবিড়রা বর্ণাশ্রম-ধর্মী আর্য ধর্মের চেয়ে বর্ণ-বিরোধী সাম্যবাদী বৌদ্ধ ধর্মের দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়। বাংলার পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের আমলে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম, দ্রাবিড়ী কৃষ্টি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। পাল রাজারা বাংলাদেশকে শুধু আর্য কৃষ্টি ও সংস্কৃত ভাষার হাত হইতেই বাঁচায় নাই, তাঁদের কেউ কেউ মগধ পর্যন্ত দখল করিয়া আর্য ও সংস্কৃত ভাষাকে বাংলার সীমানার বাহিরে বহুদূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন।
>
> পাল রাজাদের পরে সেন রাজারা যখন বাংলার নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি দমন করিয়া ইহার উপর আর্যকৃষ্টি ও সংস্কৃত ভাষা চাপাইবার অপচেষ্টা শুরু করেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রমবিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম সাম্যবাদী ইসলামের সাহায্যে ও সহযোগিতায় চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। ইসলামী ছাপ লইয়া বাংলায় নয়া কৃষ্টি-জীবন গড়িয়া উঠা শুরু হয়।[২৮]

আবুল মনসুর আহমদের এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় রামশরণ শর্মার *Ancient India*, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের *বাংলাদেশের ইতিহাস* (আদিপর্ব), ড. নীহারঞ্জন রায়ের *বাঙালীর ইতিহাস*, অতুল চন্দ্র রায়ের *ভারতের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), ড. মুহম্মদ এনামুল হকের *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ড. এম. এ. রহিমের *Social and cultural History of Bengal* প্রভৃতি গ্রন্থে। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার বহু পূর্বেই দ্রাবিড়রা যে ভারতে এসেছিল সিন্ধুসভ্যতা (মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাসভ্যতা) তার প্রমাণ এবং সম্প্রতি আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, এর অনেক পরে আর্য জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে এসেছে। ড. অতুল চন্দ্র রায় বলেছেন,

> এতকাল ঐতিহাসিকদের এই ধারণা ছিল যে, আর্যদের আগমনের পর হইতেই ভারতের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের ফলে এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে সিন্ধু সভ্যতা ভারতের আদি সভ্যতা। ঐতিহাসিকদের মতানুসারে বৈদিক সভ্যতার জন্ম খ্রীষ্টজন্মের ২০০০ বছর পূর্বে। অপরদিকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ অব্দের পূর্বেই সিন্ধু উপত্যকায় একটি উন্নত নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।[২৯]

আর্যদের আগমনের পর দ্রাবিড়রা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ থেকেই আবুল মনসুর আহমদ দেখাতে চেয়েছেন বাংলায় আর্যদের প্রবেশের বহু পূর্বেই দ্রাবিড়রা বাংলাদেশে এসেছিল ও এখানকার জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আর্যরা তখন বাংলাকে

অসভ্য-বর্বর জনগোষ্ঠীর বাসস্থল বলেই মনে করতো। বহুদিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকে এবং গুপ্ত যুগে এসে বাংলায় আর্যপ্রভাবের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকদের মতে বাংলায় ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজাদের শাসন কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[৩০] শত শত বছর ধরে উত্তর ভারতীয় আর্য-ভাষাভাষীদের সঙ্গে বাংলার অধিবাসীদের বিভিন্ন বিরোধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটা সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হলেও তা খুব গভীরে পৌঁছাতে পারেনি। বাংলার অধিবাসীদের নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতিবোধ গভীর ও ব্যাপক ছিল। একদিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মৌলিক বিরোধ ও অন্যদিকে সুফি-দরবেশদের প্রচারে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক মনোভাব— এসব কারণে এ দেশের মানুষ দ্রুত ইসলাম ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে বাংলায় আর্যসংস্কৃতি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই মুসলিম-সংস্কৃতি প্রবেশ করে এবং দ্রুত তার বিস্তার লাভ করে। এ কারণেই লেখকের মতে, বাংলার বাইরের হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আর তাই বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির কোনো মিল নেই। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, বাঙালি ব্রাহ্মণদের মাথার খুলির গঠন-প্রকৃতি উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ বা আর্যদের মাথার খুলির গঠন-প্রকৃতি থেকে পৃথক।[৩১] আবুল মনসুর এ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মত বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

> বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম জনসাধারণের পূর্ব-পুরুষ মূলত দ্রাবিড় হওয়ার কথাটা ইংরেজ আমলের প্রথম হইতেই তলাইয়া যায়। এই সময়ে বাংলার হিন্দু পণ্ডিতদের অনেকেই নিজেদের আর্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন। ... স্যার রবার্ট রিয্‌লীর অভিমত এই যে, সকল ধর্ম-বর্ণের বাংগালীদের আদি পুরুষ দ্রাবিড় ও মংগোলীয়দের মিশ্রণজাত মানবগোষ্ঠী, যাদের সঙ্গে আর্যদের কোনও সংশ্রব নাই। এই মতের প্রতিবাদে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন, বাংলার বর্ণহিন্দুরা বৈদিক আর্যদের বংশধর নয় বটে তবে তারা পামির মাল-ভূমির অধিবাসী হোমোআলপিনাস নামে আর্য্যদের এক শাখারই বংশ। নৃতত্ত্ববিদ ডা.বি.এস. গুহ রমাপ্রসাদ বাবুর মতের প্রতিবাদে বলিয়াছেন, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় যে ওমানী-আর্মেনিয়ানরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, বাংগালীরা তাদেরই বংশোদ্ভূত। অধ্যাপক মহলানবিসের গবেষণার ফল এই যে, নৃতত্ত্বের দিক হইতে বাংলার বাহিরের ব্রাহ্মণদের চেয়ে বাংলার অন্যান্য বর্ণের লোকের সাথেই বাংলার ব্রাহ্মণদের মিল বেশি। তবে বাংলার ব্রাহ্মণদের এক শ্রেণীর সাথে পাঞ্জাবী ও অন্যান্য প্রদেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের কিছু কিছু মিল রহিয়াছে।[৩২]

এ ছাড়া আবুল মনসুর আহমদ তাঁর মতের সমর্থনে ঐতিহাসিক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ পণ্ডিতের উদ্ধৃতি ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাঙালি সংস্কৃতির আদিরূপ আর্য বা ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট না হয়ে তা এদেশীয় দ্রাবিড় মঙ্গোলীয়দের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানদের দ্বারাই লালিত-পালিত হয়েছে। 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি' প্রবন্ধে লেখক বাঙালি সংস্কৃতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বাঙালি হিন্দুদের যেমন ভারতের অন্যান্য

হিন্দু থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখিয়েছেন, তেমনি বাঙালি মুসলমানদেরও ভারতের অন্যান্য মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখিয়েছেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক মূলত বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে গিয়ে বাঙালি জাতির উদ্ভবের প্রথাগত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশের ওপর একদিকে আর্যপ্রভাবের ব্যাপকতা ও অন্যদিকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের প্রভাবকে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অস্বীকার করেছেন। তবে বাংলাদেশের ওপর আর্যদের প্রভাব যে খুব বেশি পড়ে নাই তা এখন সর্বজনস্বীকৃত। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য—

> আর্য-ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ বন্ধনের যে ঢেউ অনেক পরে বাংলাদেশে এসেছে তার মধ্যে বেগ ছিল খুবই কম। ঢেউ যেটুকু লেগেছে তা বর্ণ-সমাজের উঁচু কোঠায়, শিক্ষিত এবং মার্জিত স্তরে। একমাত্র আর্য বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিই কিছুটা সেই গণ্ডির বাইরেও স্থান পেয়েছে— তাও অনেক পরে, সপ্তম-অষ্টম শতকের পর থেকে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ কিছুটা আছড়ে পড়েছে গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্যন্ত; অর্থাৎ মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর তীরে সে ঢেউ যত গেছে ততই তার বেগ স্তিমিত হয়েছে। বাংলাদেশে এমন হবার কারণ আছে। প্রথমত, এত দূরদেশে আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ আসতে দেরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের লোকদের প্রতি এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব কাটতে সময় লেগেছে এবং বরাবরই তা একটা গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রাণপণে ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তৃতীয়ত, বাংলার কৌমসমাজও আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত ঠেকাবার জন্যে প্রাণপণে যুঝেছে এবং যখন আর পারেনি তখনও সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে, দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসবার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলাদেশের আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে মাথা নোয়ালেও ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুয়েকটি সম্প্রদায়ের বাইরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল; তার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। চতুর্থত, বাংলাদেশে নানা রক্তের মেশামেশির ফলে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণে জাত ও বর্ণের বাছবিচার আর্যাবর্ত দক্ষিণ-ভারতের মত অতটা কাঠোর হয়ে উঠতে পারেনি।[৩৩]

ঙ. বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে আর্য-ব্রাহ্মণদের এই সম্পর্কহীনতার ফাঁকটিই পূরণ করেছে মুসলমানরা। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দু-বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে— যা সপ্তম-অষ্টম শতকে শুরু হয়ে দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে চললেও এর পরে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য পেয়ে তা দুর্বার গতিতে চলতে থাকে বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের ফলে বাংলার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হয়। এরপর প্রায় দু'শ বছরের বৃটিশ-শাসনে বাংলার মুসলমানরা বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও তাদের মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ কখনও বর্জন করেনি, বরং তাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে অবশেষে ১৯৪৭ সনের দেশবিভাগের মাধ্যমে তার পূর্ণতা পেয়েছে। তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর

নিষ্পেষণ-নির্যাতনে বাংলার মানুষ তার সুফল ভোগ করতে পারেনি। অবশেষে ১৯৭১ সনে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশের মানুষ সেই আদি বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের অভিমত একটু ভিন্ন এবং একই সঙ্গে তা কিছুটা বিতর্কিতও। লেখক বর্তমান বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে শুধু বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, যা অনভিপ্রেত। ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশে শুধু মুসলমানদেরই বসবাস নয়, এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন আদিবাসীর অবস্থানকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না এবং কখনো যাবেও না। ধর্ম এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়, যে-যার ধর্ম স্বাধীনভাবে এখানে পালন করবে এবং রাষ্ট্র ধর্মীয় ব্যাপারে কখনোই হস্তক্ষেপ করবে না বা কোনো ধর্মের প্রতি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতাও করবে না। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের অভিন্ন সংস্কৃতিকে ধর্মের মোড়কে আবৃত করে বিকৃত করতে চেয়েছেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের অভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতিকে শুধু বাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন এবং তা প্রমাণ করতে গিয়ে বাঙালি জাতির ও তার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মকে তার মানদণ্ড হিসেবে বিচার করেছেন। 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি'র আলোচনায় তিনি চট্টগ্রামের ভূমিকাকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বাংলাদেশকে মুসলিম সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির অতীত ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মকে সংশ্লিষ্ট করে আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন—

> পাক বাংলার ভাষা-কৃষ্টি-সাহিত্য রাঢ় বাংলা ও পশ্চিম ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র দুই কারণে। এক. এখানকার ভাষা সাহিত্যে দ্রাবিড়ী ছাপ। দুই. এখানকার ভাষা-সাহিত্যে আরব ও ইসলামের প্রভাব। প্রথমত দ্রাবিড়ী ছাপের কথাটাই বলা যাক। পাক-বাংলার বিশেষতঃ চাটগাঁ, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভাষা, শব্দ-প্রকরণ উচ্চারণ-ভংগি ও নাচে-গানের গোটা সাংস্কৃতিক পরিবেশে দ্রাবিড়ী ছাপ ও নিদর্শন আজও উজ্জ্বল হইয়া আছে। ...পূর্বে আরাকান, উত্তরে ত্রিপুরা ও পশ্চিমে বাকেরগঞ্জ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, চাটগাঁই এসব কৃষ্টি-সংস্কৃতির কেন্দ্র ভূমি ছিল। ...পাক-বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যের ব্যাপারে চাটগাঁই পাক-বাংলার পটভূমি। অবশ্য সব সভ্য জাতির কৃষ্টির মতই আমাদের কৃষ্টিও ধর্মভিত্তিক। কাজেই যেদিন বাংলার জনগণের মেজরিটি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, সে দিন হইতে সারা মুসলিম-বাংলাই ভাবী পাক-বাংলার কালচারের নার্সারি হইয়া উঠিয়াছে।[৩৪]

বাংলাদেশের সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনায় আবুল মনসুর আহমদ ধর্মকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে এদেশের সমাজ-ব্যবস্থাকে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংস্কৃতি নামে দু'টি ভাগ করেছেন এবং সেক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশকে শুধু বাঙালি মুসলমানের আবাসভূমি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষ যে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের সমবায়ে হাজার-হাজার বছর ধরে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে একটা অভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে লেখক সে বিষয়টিকে

বিবেচনায় না এনে এই অভিন্ন সংস্কৃতিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভক্ত করতে চেয়েছেন। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের সমন্বয়ে বাংলাদেশে যে একটি অভিন্ন বা জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে লেখক তা স্বীকার করেন না। তাঁর খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়:

> বাংলার কালচার বলিয়া কোনও কালচার নাই। বাংলা একটা দেশ। বাঙ্গালী একটা জাতি। এটাই স্থূল সত্য। কারণ দেশ, গোত্র ভাষার দিক হইতে বাংলার বাশিন্দারা একটা জাতি। এই জাতির একটা জাতীয় কালচার থাকার কথা, কিন্তু সত্য কথা এই যে, বাংলায় কোনও জাতীয় কালচার নাই। বাংলায় সেদিন বৃটিশ ভারতের এবং তারও আগে মোগল ভারতের প্রদেশ ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীরা স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং সেই কারণে বাঙ্গালীদের কোনও জাতীয় কালচার নাই, ব্যাপারটা তা নয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়াও মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠিতে পারে। বাংলায় জাতীয় কালচার গড়িয়া না উঠার কারণ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা নয়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। এটা সবাই জানেন যে, সমাজই কালচারের নার্সারি জননী বা সূতিকাগার। বাংলার মানুষের সমাজ একটা নয়, দুইটা। সে দুইটা সমাজ এক্সক্লুসিভ। তাদের মধ্যে খাওয়া-পরা, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি মিল নাই। তাই এগারশ' বছর এক দেশে বাস করিয়া একই খাদ্য পানীয় খাইয়াও তারা দুইটা পৃথক সমাজ রহিয়া গিয়াছে। এক সমাজের লোক খৎনা করিয়া নিজস্ব সমাজে বাস করিয়া মরিয়া গোরস্থানে যায়, অপর সমাজের লোক অশৌচান্ত ও উপনয়ন করিয়া নিজের সমাজে বাস করিয়া মৃত্যুর পর শ্মশানে যায়। ফলে এই দুইটি সমাজে দুইটা প্যারালেল কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা ভাগের মধ্যে দুইটা কালচার নিজ-নিজ আশ্রয় স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে। পাক-বাংলার কালচার অর্থে বিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলের কালচার বুঝাইতেছি।[৩৫]

লেখক বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের জাতীয় বা যুক্ত সংস্কৃতিকে অস্বীকার করলেও হাজার বছর ধরে এদেশের মানুষ এই যুক্ত সংস্কৃতিকেই লালন করে এসেছে। লেখক বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে গিয়ে বাঙালি জাতির আদি ইতিহাস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে শুধু এদেশে কীভাবে বহিরাগত মুসলমানরা তাদের প্রভুত্ব বজায় রেখে দীর্ঘ ছয় শ বছর শাসন করেছে ও পরিশেষে বৃটিশ শাসনাধীনে এসে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তবে এদেশে কীভাবে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো এবং তাদের প্রকৃত পরিচয় কী সে-বিষয়কে বিবেচনায় আনেননি। বাংলার মুসলমানরা প্রধানত ধর্মান্তরিত মুসলমান। উচ্চবর্ণের স্বজাতির নিপীড়নে অতিষ্ঠ এবং ইসলামের সাম্যে আকৃষ্ট হয়ে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দুরাই মূলত ধর্মান্তরিত হয়েছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মেও মৌলিক নীতির সঙ্গে ইসলামের মিল থাকায় বৌদ্ধরাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে রংগলাল সেন বলেছেন—

> বাংলার অধিকাংশ মুসলমান তিন সূত্র থেকে আগত, যথা ধর্মান্তরিত উচ্চশ্রেণী, ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণী ও স্বল্পসংখ্যক বহিরাগত মুসলমান। বস্তুত বাংলার মুসলমানরা বাঙালিই, হিন্দু বাঙালির সাথে তাদের তফাত শুধু ধর্মের।[৩৬]

তবে ধর্মান্তরিত উচ্চশ্রেণীর বেশির ভাগ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে শাসকবর্গের আনুকূল্য পাবার প্রত্যাশায়। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বাংলার বর্ণহিন্দুরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বর্ণহিন্দুদের মতো আর্য বংশোদ্ভূত নয়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে বাঙালি ব্রাহ্মণরা উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ বা আর্যদের থেকে আসেনি।[৩৭] অর্থাৎ বাঙালি ব্রাহ্মণদের রক্তে নিম্নবর্ণের হিন্দু-বৌদ্ধদের মতো বাঙালি রক্তই বিদ্যমান, তারা বহিরাগত নয়। ১৮৭২ সনের আদমশুমারী থেকে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার যে হিসেব পাওয়া যায়, তা থেকে তাদের ভেতরগত পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> সমগ্র মুসলমান জনসমষ্টির শতকরা ২৯.৬ ভাগ বহিরাগত মুসলমান ও শতকরা ৭০.৪ ভাগ ধর্মান্তরিত মুসলমান। ধর্মান্তরিত মুসলমানের প্রায় শতকরা ৩০% এসেছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের থেকে এবং অবশিষ্ট ৭০ ভাগ নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ থেকে।[৩৮]

এই হিসেব থেকে বোঝা যায় যে, বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই মূলত আদিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ হওয়ায় এবং তারা বংশপরম্পরায় এদেশেরই গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় তারা শুধু ধর্মটিই পরিবর্তন করেছে, কিন্তু তাদের জীবনাচরণের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে এদের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং এখনো তেমন নেই। অর্থাৎ শত-শত বছর ধরে একই সমাজব্যবস্থার অধীনে থেকে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা হয়নি, তাদের মধ্যে সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে একই জাতীয় সংস্কৃতি বা যুক্ত সংস্কৃতির তারা ধারক-বাহক। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির মূল ভিত্তিভূমি হচ্ছে গ্রাম ও তার সমাজ-ব্যবস্থা হচ্ছে মূলত কৃষিভিত্তিক এবং বর্তমানেও তার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ অবস্থায় গ্রামে বা শহরের কোনোখানেই ধর্মের কারণে বাঙালি সংস্কৃতির কোনো প্রভেদ চোখে পড়ে না। মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত সংস্কৃতিই বিদ্যমান ছিল। সে-সময়ের সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা লক্ষ্য করা যায়।

> সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ অভিন্ন, যা যুক্তসাধনার প্রমাণ। তবে এই যুক্তসাধনার ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের অবদানই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব ধর্ম ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদবিরোধী বিধায় এটি গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং সে কারণে সাম্যবাদী ইসলামের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। এছাড়া মধ্যযুগের ধর্মীয় যুক্তসাধনার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের সুফীবাদের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ...বাঙালি মুসলমান সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারীর সমন্বয়বাদী ভূমিকার ফলে বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সমাজ সৃষ্টি হয়। ...বাংলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানের অভিন্ন মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আশরাফ মুসলমানরা সমভাবে বহিরাগত, যারা যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবি-ফারসিকে অধিকতর পছন্দ করতেন। এ মানসিকতা এদের মধ্য থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নি।[৩৯]

কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের সংস্কৃতি-বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে অভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতিকে বিভক্ত করে মুসলিম সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছেন এবং বিভিন্নভাবে প্রমাণ

করতে চেয়েছেন যে, বাঙালি সমাজ-ব্যবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানরা পাশাপাশি অবস্থান করলেও ধর্মের কারণে তাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি ভারতে তথা বাংলায় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বৃটিশ শাসনামলে শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে মুসলিম সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক রূপ ও পাকিস্তান আমলে তার পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশকে 'শিক্ষা-সভ্যতার পীঠস্থান— শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র কৃষ্টি স্থপতির লীলাভূমি' হিসেবে উল্লেখ করে নিজেকে শুধু বাঙালি মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> বাংলার মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হাজার বছরেরও বেশি কালের। পুরা সাড়ে ছয়শ বছর আমরা এই দেশের শাসক ছিলাম। তার মধ্যে প্রায় তিনশ বছর আমরা স্বাধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শাসন করিয়াছি। এই মুদ্দতে আমরা বাংলাকে নিজস্ব জাতি-নাম, ভাষা ও সাহিত্য দিয়াছিলাম। সে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীত্বকে নতুন মর্যাদা, তার ভাষায় নতুন সুর, তার গলায় নতুন জোর দিয়াছিলাম। কৃষ্টি-সভ্যতা, শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সাহিত্যে সভ্য জগতের দরবারে বাংলাদেশকে করিয়াছিলাম সুপ্রতিষ্ঠিত। পাক-বাংলার শিল্প-সাহিত্যে ও কৃষ্টি-সভ্যতার হাজার বছরের এই মুসলিম ছাপ সুস্পষ্ট দীপ্তিমান।[৪০]

অতীতের এই সাংস্কৃতিক সূত্র ধরে লেখক বাংলাদেশে মুসলমানী সংস্কৃতির সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান। সে-ক্ষেত্রে তিনি পাকিস্তান আমলের বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সাড়ে ছয়শ বছরের মুসলিম শাসনামলের মুসলিম সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিগণিত করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য— "মুসলিম আমলের কালচারের শাহী রূপ নয়, গণ রূপটাই বড় কথা। ঐ রূপেই ছিল সেটা আমাদের কালচার। ওটারই আমরা উত্তরাধিকারী। তারই রক্ষণ ও বিকাশনই আমাদের দায়িত্ব।"[৪১] আর এই দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি বাঙালি সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করে শুধু মুসলমানী সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও রক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরেছেন, যা অনেকটা একপাক্ষিক এবং সে কারণে তা সর্বজনস্বীকৃত নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্বীকার করতে হয়, এটা আবুল মনসুর আহমদের কূপমণ্ডূকতারই পরিচায়ক।

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির গণরূপটা যে শুধু মুসলিম সংস্কৃতিই ছিল না, বরং তা ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্ম-বর্ণের সম্মিলিত সমাজব্যবস্থার একটা যৌথ বাঙালি-সংস্কৃতি, আবুল মনসুর আহমদ সে বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। বিভিন্ন সুফি-দরবেশের প্রভাবে এদেশের যে অসংখ্য হিন্দু-বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, সেটা শরিয়তি ইসলাম ছিল না। ফলে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় লালিত সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এবং সে-কারণে বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিগত একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। তাই একই সমাজ-ব্যবস্থার অধীন পল্লীজীবনের এসব বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কোনো প্রভেদ ছিল না।

অবশ্য কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্থক্য ছিল এবং আছে। বৃটিশ শাসনামলে এসে ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানরা শাসকগোষ্ঠী ও অভিজাত হিন্দুদের কারণে এক ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। তখনই ফরায়েজি-ওহাবি আন্দোলনসহ বিভিন্ন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানরা শরিয়তি ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং মূলত তারই একটি পরিবর্তিত উদারনৈতিক ধারা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা দিয়ে ভারত-বিভক্তির মাধ্যমে স্বতন্ত্র মুসলিম সংস্কৃতির দাবি করেন ও তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টায় নিমগ্ন হন। আবুল মনসুর আহমদ এ ধারারই একজন সচেতন কর্মী। পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তাল সময়ে এই ধারার চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হলে পূর্ব-বাংলার কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ববাংলাকে বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। হাজার বছরের লালন করা অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতিকে ধর্মীয় কারণে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি নাম দিয়ে তাঁরা বিভক্ত করতে চান।

> বাঙালীর যৌথ সংস্কৃতি ইংরেজ শাসনের কালে মুসলমানের দ্বারাও অবহেলিত হয়, হিন্দুর দ্বারাও অবহেলিত হয়। আর এইটিই এ-কালের বাঙালী জীবনের ও সংস্কৃতির ট্রাজিডি। তারই জন্য বর্তমান বাঙলার সংস্কৃতিকে মুসলমান বাঙালি আপনার বলে মানতে এত ইতস্তত করেন। কারণ, তার চক্ষে এ যে শুধু 'হিন্দু ঐতিহ্যে'র উপর গঠিত বাঙালী সংস্কৃতি।[৪২]

মুহম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলমানরা তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি তুলে ধরে ভারত বিভক্তির দাবি জানায়। আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে বাংলায় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৪ সনে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি মুসলিম সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন—

> রাজনীতিকের বিচারে 'পাকিস্তানের' অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যের কাছে তার অর্থ তমুদ্দনী আজাদি, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচার্যাল অটনমি। রাজনৈতিক আযাদি ছাড়া কোন জাতি বাঁচতে পারে কি না সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্রনেতার কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এ কথাটিই বলতে পারি যে, তমদ্দুনী আযাদি ছাড়া কোন সাহিত্য বাঁচতে পারা ত পরের কথা, জন্মাতেই পারে না। ...রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানরা আলাদা জাত কিনা, তা নিয়ে ত তর্কের অবকাশ আছে : কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা যে আলাদা জাত, এতে কোনো তর্কের জায়গা নেই। ...শুধু হিন্দু-মুসলিমের নয়, তামাম দুনিয়ার সকল জাতির সংস্কৃতিই মূলত এক। তবু জাতিতে-জাতিতে সংস্কৃতিগত পার্থক্য কত সুস্পষ্ট। হরেক জাতির রাজনৈতিক আযাদি নিশ্চয় হবে অদূরগত ভবিষ্যতের যুগবাণী। কিন্তু সে রাজনৈতিক স্বরাজের সার্থকতা হবে জাতির স্বকীয় নিরংকুশ বিকাশে। এই বিকাশের মর্মবাণী হচ্ছে তমদ্দুনী আযাদি বা কালচার্যাল অটনমি। এর নাম পাকিস্তান।... যাঁরা অতীতে হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতিকে ভেঙ্গেচুরে এক করতে চেয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় শ্রদ্ধা জানিয়েও আমরা বলতে বাধ্য, তারা ঠিক কাজ করেননি।[৪৩]

মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে মৌলবি মুজিবুর রহমান খাঁর *পাকিস্তান* নামক পুস্তিকা ও হাবীবুল্লাহ বাহারের *পাকিস্তান* নামক গ্রন্থ আবুল মনসুর আহমদকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৪৪] হাবীবুল্লাহ বাহার তাঁর *পাকিস্তান* গ্রন্থে বলেছেন—

> হিন্দু-মুসলমানের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, ব্যক্তিগত আইন, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তাহজীব-তমদ্দুন, জাতীয় গ্রন্থ, জাতীয় বীর ও মহাপুরুষ, জাতীয় আদর্শ সবই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ...হিন্দু মুসলমানের বিরোধ শুধু ধর্মীয় বিরোধ নয়। একই সঙ্গে এ-হচ্ছে ঐতিহাসিক বিরোধ— অর্থনৈতিক বিরোধ— সাংস্কৃতিক বিরোধ।[৪৫]

হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই ছিল বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় নিয়ামক শক্তি এবং এই শক্তিই অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতিকে দ্বিখণ্ডিত করে ধর্মের আবরণে রাজনৈতিকভাবে বাংলা-বিভক্তির মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের নায়কদের মানসিক বিকাশ ও রাজনৈতিক চেতনার মূলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিবোধ কাজ করেছিল। ইসলামি জীবন-দর্শন মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম উৎস— এই উৎস-উচ্ছ্রিত সাংস্কৃতিক-আন্দোলন পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল এবং এই স্বতন্ত্র সংস্কৃতিবোধ ও অনুপ্রেরণা যেমন পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল, তেমনি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের অদম্য আকাঙ্ক্ষাও রাজনৈতিক আন্দোলনকে জাগ্রত ও চলমান রেখেছিল।[৪৬] এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ, বাঙালি সংস্কৃতির ওপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাকর্মীদের অধিকাংশের মোহভঙ্গ হলেও আবুল মনসুর আহমদ তাঁর বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তিনি মুসলিম সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি ধর্মকে সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি মনে করে বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেন। সেক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশকে শুধু মুসলমানদেরই আবাসভূমি মনে করেছেন। ধর্মের কারণে বাঙালি জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে মুসলিম সংস্কৃতিকেই বাংলাদেশের সংস্কৃতি হিসেবে চালাতে চেয়েছেন। কিন্তু ধর্ম হলো স্থিতিধর্মী, আর সংস্কৃতি হলো একটা চলমান সদা পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। গোপাল হালদারের মতে—

> জগৎ ও জীবনবোধও ক্রমশ বদলে যেতে বাধ্য—কালচারের তা-ই তাগিদ। কিন্তু 'রিলিজিওন' চায় সেই বিশেষ এক স্তরের জগৎ ও জীবনবোধকে চিরন্তন করে রাখতে। কালচারের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার রিলিজিওন নামের এই অংশের ঝোঁকটা হল কালচারেরই গতিকে অস্বীকার করে একটা বিশেষ জগৎ-ও-জীবনবোধকে 'শাশ্বত', 'সনাতন', 'ধ্রুব সত্য' বলে আঁকড়ে থাকা।[৪৭]

এ বিষয়কে স্মরণ রেখেই আবুল মনসুর আহমদ ইসলাম ধর্মের আচরিত ধর্মোৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতিকে একটা গণরূপ দিয়ে তাকে গতিশীল

করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে— 'ধর্মোৎসবই সকল জাতির কৃষ্টিজীবনের সবচেয়ে প্রশস্ত ও উর্বর ক্ষেত্র' এবং 'ধর্মোৎসবের বিকাশ ও বিস্তৃতিই কালচারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার।'[৪৮] 'বাংলাদেশের কালচার' প্রবন্ধে লেখক তাই ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে শুধু ধর্মপালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে গণরূপ দিয়ে জাতীয় উৎসবে পরিণত করার ওপর জোর দিয়েছেন। মুসলমানদের ঈদ-উৎসব প্রার্থনা-সভায় পরিণত হওয়ায় তিনি ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণে যেমন ধর্ম-পালনকে ছাপিয়ে যায় উৎসব-আনন্দ, তেমনি মুসলমানদের মহররম, শবে-বরাত, ঈদে-মিলাদুন্নবি, রোজা প্রভৃতিতে উৎসবের আড়ালে ধর্মপালন চাপা পড়ে যায়। এ-ক্ষেত্রে লেখক মুসলমানদের ধর্মপালনের নীতি-নৈতিকতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সে-সবের বাহ্যিক আচরণের উৎসবকে। চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প, ভাস্কর্য নির্মাণ, নাটক, খেলাধূলা প্রভৃতির উৎকর্ষের মাধমে তিনি মুসলিম সংস্কৃতির সর্বজনীন রূপকে আরো সমৃদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। লেখক যেমন ধর্মপালনের মৌলিক দিকগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে তার বাহ্যিক আচরণের ওপর জোর দিয়ে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি মুসলিম সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে গিয়ে বাঙালি হিন্দুদের সৃষ্ট সঙ্গীত, বই-পুস্তক, ছায়াছবি নিষিদ্ধ করাকে স্বাগত জানিয়ে চরম রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন—

> আমরা কলিকাতার কৃষ্টি পশ্চিম বাংলার পরিবেশ ও শান্তি-নিকেতনের রচনাভংগি নকল করিয়া সুখী ও বিদগ্ধ হইতেছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের জাতীয় কবি আখ্যা দিয়া রবীন্দ্রসংগীতের সাগরে ডুব পাড়িতেছিলাম। ...আর আমাদের কবি সাহিত্যিকরা রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া অসহায় দর্শকের মতই এই বেচাকেনা দেখিতেছিলেন।
>
> ... এমন সময় যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। আমাদের তন্দ্রা-টুটিল সরকার কয়েক শ্রেণীর রবীন্দ্র-সংগীত বন্ধ ও পশ্চিম-বাংলার বই-পুস্তক ও ছায়াছবি নিষিদ্ধ করিলেন। তবেই আমাদের জ্ঞান হইল। আমাদের রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে গানে-কবিতায় ছায়াছবিতে দেশাত্মবোধ ও কৃষ্টিক স্বকীয়তা ঝংকৃত হইতে লাগিল। দেশের জাগরণের পক্ষে এটা নবযুগ, কালচারের দিক হইতে এটা সুবেহসাদেক, কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের জন্য এটা গৌরবের কথা নয়।[৪৯]

এবক্তব্যে আবুল মনসুর আহমদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম-বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যকে তিনি যেমন বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য বলে মনে করেন না, তেমনি পশ্চিমবাংলার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিজেদের বলে মনে করেন না। এক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্যে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হিন্দু-বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। রবীন্দ্র সংগীত বন্ধ, পশ্চিমবাংলার বই-পুস্তক ও ছায়াছবি নিষিদ্ধ, কবি-সাহিত্যিকদের রচনাকে ইসলামিকরণের উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে তার সংশোধন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডকে আবুল মনসুর আহমদ দেশের 'জাগরণ', 'নবযুগ' ও 'বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির সূর্যোদয়' প্রভৃতি বলে যে প্রশস্তি গেয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। সংস্কৃতির একটা বড় অংশ দখল করে থাকে ধর্ম,

কিন্তু সেই ধর্ম যখন সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন সে সংস্কৃতি তার গতিশীলতা হারায় এবং সেই চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতির মৃত্যু তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংস্কৃতির সঙ্গে তখন আর মানুষের আত্মার সম্পর্ক থাকে না। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে সে-কথাই বলেছেন—

> ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জ্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্ম্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।
>
> ধর্ম্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ। মার্জ্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে। বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনাই তাদের চালক, তাই তাদের জন্য ধর্ম্মের ততটা দরকার হয় না। বরং তাদের উপর ধর্ম্ম তথা বাইরের নীতি চাপাতে গেলে ক্ষতি হয়। কেননা তাতে তাদের সূক্ষ্মচেতনাটি নষ্ট হয়ে যায়, আর সূক্ষ্মচেতনার অপর নাম আত্মা।[৫০]

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ধর্মের নামে এদেশের মানুষের আজীবন লালন করা সাংস্কৃতিক আত্মাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, আর আবুল মনসুর আহমদের মতো কিছু বুদ্ধিজীবী অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাদের অপকর্মকে সমর্থন করেছিলেন। বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যের নামে তাঁরা প্রথমত মুসলমান হতে চেয়েছিলেন এবং অতঃপর ধর্মের আলখাল্লা জড়িয়ে বাঙালি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু "সংস্কৃতির বিচার ক্ষেত্রে মূল সূত্র ধর্ম নয়, দেশ নয়, জাতি নয়। সেই সূত্র জীবন-যাত্রার বাস্তব উপকরণ, সামাজিক ব্যবস্থা এবং তাহারই সহায়তায় সৃষ্ট মানসিক সম্পদ।"[৫১] —এ-কথাটি তারা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই এদেশের মানুষ প্রথমত বাঙালি এবং অতঃপর যার-যার ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। পশ্চিম-বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তাই ধর্মীয় বিচারে নয় বরং একই ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচারে তাকে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন।

> পাকিস্তানী শাসকের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উপর আঘাত, নজরুলকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা, বাঙালী সংস্কৃতির উপর নানামুখী আঘাত, বাঙালী জাতিসত্তার প্রতি অবজ্ঞা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক শোষণের প্রবণতা সাধারণভাবে বাঙালী মানসের সচেতন অংশে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল, তারই নিহিত শক্তি নেপথ্য শক্তিরূপে আমাদের সংস্কৃতির নৌকাটিকে চালিয়ে নিয়ে গেছে।[৫২]

দুঃখের বিষয় এই যে, আবুল মনসুর আহমদ বাঙালি মানসের এই সচেতন অংশের অন্তর্ভুক্ত নন এবং সেটা সচেতন ভাবেই। বরং তিনি মনে করেন—

> পশ্চিম-বাংলা যে আমাদের দেশ নয়, কলিকাতার কৃষ্টি-সাহিত্য যে আমাদের কৃষ্টি-সাহিত্য নয়, শান্তিনিকেতনী ভাষা যে আমাদের ভাষা নয়, এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ংগম করিতে জনগণের সময় লাগিতে পারে, কিন্তু চিন্তানায়কদের লাগিবে কেন?[৫৩]

এই জনগণ ও চিন্তানায়করা বাঙালি সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িক নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, ফলে ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিষবাষ্প থেকে মুক্ত হয়ে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি

হতে চেয়েছিলেন, যার সফল পরিণতি ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মলাভ। যদিও পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসকের কৃপায় ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় সম্পৃক্ততার আইন প্রণীত হলেও আপামর জনসাধারণের মানস-সংস্কৃতিতে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। তাই বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ কোলকাতার বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে ভিনদেশীয় ভাষা মনে না করে নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মানুষের মনে কখনই এ প্রশ্ন জাগে না যে, কোনটি হিন্দুর লেখা সাহিত্য, আর কোনটি মুসলমানের লেখা সাহিত্য; বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের মানুষ এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশী জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ না করে নিজেদের সাহিত্য হিসেবেই গ্রহণ করেছে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতাকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যেমন গ্রহণ করেছে, তেমনি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে। আবুল মনসুর আহমদের মতে— "বাংলায় কোনও 'জাতি' নাই। আছে শুধু হিন্দু-মুসলমান দুইটি সম্প্রদায়। ...এখানে কোনও জাতীয় কৃষ্টিই নাই। এখানে আছে দুইটা কৃষ্টি: একটা বাংগালী হিন্দু-কৃষ্টি অপরটি বাংগালী মুসলিম কৃষ্টি।"[৫৪] এই মত এদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করে ধর্মকে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আচরণীয় কর্ম হিসেবে সম্মান জানিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে নিজেদের মনে করেছে। বাঙালি মুসলমানের প্রথম পরিচয় তারা বাঙালি এবং অতঃপর মুসলমান। কেননা, যে-কোন সময় যে-কোন বাঙালি তার ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মাবলম্বী হতে পারে, কিন্তু সে কখনোই তার বাঙালিত্ব পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি হিসেবে লেখকের আশাবাদ— "সে কৃষ্টি-সাহিত্য রূপে হইবে বাংগালী, রসে হইবে তা মুসলিম, আর গন্ধে হইবে তা বিশ্বজনীন।"[৫৫]—এই বক্তব্য আংশিক কার্যকর হয়েছে; শুধু সাম্প্রদায়িক চেতনাটুকু বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি শুধু হিন্দু বা মুসলিমের না হয়ে যৌথ সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চ. সাহিত্যচিন্তা ও বাংলাদেশের সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি বিভিন্ন যুক্তি, প্রমাণ ও উদাহরণের সাহায্যে বাংলাদেশের সাহিত্যিক স্বকীয়তা প্রতিপাদনের জন্য আবুল মনসুর আহমদ তাঁর নিজস্ব মতাদর্শের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'সাহিত্যের প্রাণ, রূপ ও আংগিক'। পঁয়ত্রিশটি উপশিরোনাম দিয়ে এ প্রবন্ধে লেখক একই ইংরেজিভাষী আমেরিকান ও বৃটিশ সাহিত্যের মিল-অমিল, সঙ্গতি-অসঙ্গতি ও অতীত ইতিহাসের উদাহরণ টেনে তার সঙ্গে একই বাংলাভাষী বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের সাযুজ্য তুলনা করে বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বকীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

তাঁর মতে, সাহিত্যের দুই রূপ, বড় ও ছোট বা বিশাল ও সংকীর্ণ। বৃহৎ অর্থে যে-কোনো ভাষায় প্রকাশিত মানব মনের পুরোটাই সাহিত্য অর্থাৎ বাজার-দরের রিপোর্ট, ওষুধের বিজ্ঞাপন, পাঠ্য-পুস্তক, ভূগোল, ইতিহাস, পাটীগণিত, বীজগণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, সংবাদপত্র, গল্প-কবিতা, নাটক, সংগীত, উপন্যাস সবই সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। আর সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্য একটি শিল্প এবং এ-কারণে তার একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। চিত্র-ভাস্কর্য, গানবাজনা প্রভৃতি আক্ষরিক ভাষায় প্রকাশিত হয় না, তার একটি নিজস্ব ভিন্ন ভাষা রয়েছে কিন্তু গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্য আক্ষরিক ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং সে অর্থে এগুলো সীমাবদ্ধ। তবে স্থান ও কালের প্রভাবে সব শিল্পই পরিবর্তনশীল। আর সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশ যেহেতু আক্ষরিক ভাষায় সংগঠিত হয়, তাই ভাষার আশ্রয় ব্যতীত কোনো সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের ব্যবহার্য ভাষাকেই কবি-সাহিত্যিকরা শিল্পরূপ দিয়ে সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

> ভাষা জনগণের দ্বারা প্রভাবিত, সাহিত্য ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। এর ফলে চিত্র-ভাস্কর্য যে শরাফতি দাবি করিতে পারে, সাহিত্য তা পারে না, মানে, চিত্র ও ভাস্কর্য আইভরি টাওয়ারে বাস করিতে পারে কিন্তু সাহিত্য তা পারে না। এটাই সাহিত্যের এলাকার চৌহদ্দি।[৫৬]

অন্যদিকে সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা স্থান ও কালের দ্বারাও নির্ধারিত, প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। লেখকের মতে, আমরা যে স্থানে বাস করি আমাদের পূর্বপুরুষরাও একই স্থানে বাস করতেন, কিন্তু একই সময় না হওয়ায় তাদের সাহিত্য আমাদের সাহিত্য হতে পারে না। একইভাবে আমরা যে যুগে বাস করি বহির্দেশীয় লোকেরাও একই যুগে বাস করেও স্থান একই না হওয়ায় তাদের সাহিত্যও আমাদের সাহিত্য নয়। সাহিত্যের এই স্থানিক ও কালিক প্রভাবই সাহিত্যের স্বকীয়তা, তবে তাকে অবশ্যই সৃষ্টিশীল হতে হবে এবং এই সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে বাস্তবজীবনের ঘনিষ্ঠতা থাকতে হবে।

> আর্ট ক্রিয়েটিভ হইতে পারে, তবেই যদি তা বাস্তব হয়। ...সাহিত্য আসলে ফিলিং (অনুভূতি), ইমোশন (ভাবাবেগ) ও ইমাজিনেশনের (কল্পনার) রূপায়ণ। এই ফিলিং ইমোশন ও ইমাজিনেশন গোড়াতে নিশ্চয়ই ব্যক্তির। ব্যক্তি স্থান ও কালের একটি ইউনিট।[৫৭]

যে ব্যক্তির মুখ দিয়ে সাহিত্য বেরিয়ে আসে সে ব্যক্তি হলো লেখক, স্থানটি তাঁর দেশ এবং কালটি হলো বর্তমান। সব ভাষাই সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্বে থাকে অশালীন ভাষা এবং সাহিত্যে স্থান পাওয়ার পর সেটা হয়ে ওঠে শালীন ভাষা। অর্থাৎ সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও উন্নতি হয় এবং একই সঙ্গে ভাষার উন্নতির মাধ্যমে সাহিত্যেরও উন্নতি হয়। "বাংলা ভাষা অভিজাত ছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এ ভাষায় লেখেন নাই, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন বলিয়া বাংলা অভিজাত ভাষা হইয়াছে।"[৫৮] সে কারণে জনগণের মুখের ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতে হবে, তবেই সে-সাহিত্য হবে জনগণের সাহিত্য। এ থেকেই লেখক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে—

> সাহিত্যের প্রাণ তার রূপ তার আংগিক সব কয়টি নিহিত আছে জনগণের জীবনে। জনগণের জীবন-ক্ষুধা সাহিত্যের প্রাণ, জনগণের জীবন-চিত্র সাহিত্যের রূপ, জনগণের ভাষা সাহিত্যের আংগিক। এই তিনটি পাল্লার ওজনে যে সাহিত্য টিকিল না, সে সাহিত্য গণ-সাহিত্য বা জাতীয় সাহিত্য হইতে পারিল না।[৫৯]

যে-কোনো দেশের, যে-কোনো সময়ের এবং যে-কোনো ভাষার মানুষের ক্ষেত্রে সাহিত্যের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। সুতরাং, বাংলাদেশের সাহিত্য হবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের মনের কথা এবং তা অবশ্যই এদেশেরই সাধারণ মানুষের মুখনিঃসৃত বাংলাভাষার মাধ্যমে। এখানে লেখক একই ভাষী পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার জনগণের ভাষা ও সাহিত্যকে নিজস্ব স্বকীয়তায় পৃথক দু'টি সত্তা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। আবুল মনসুর আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও সংকীর্ণতা এখানে।

লেখকের মতে, ১৯৪৭ সনে ভারত-বিভক্তির মাধ্যমে বাংলা বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পরিণত হয়েছে এবং এ-কারণে উভয়ের জীবনধারা দু'টি ভিন্ন নদীর খাতে প্রবাহিত হয়ে সাধনা ও সিদ্ধির পথও দু'টি পৃথক ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা দু'টি পৃথক সাহিত্যধারায় পথ চলতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক-চিন্তাবিদদের লেখায় তার প্রতিফলন না ঘটায় লেখক তাঁদের উদ্দেশে বলেছেন—

> আমাদের সাহিত্যিকগণকে জনগণের জীবন-ক্ষুধা ও জীবনালেখ্যের তালাশে অবিভক্ত বাংলার পতিত ময়দানে হাতড়াইয়া বেড়াইলে চলিবে না। পূর্ব-বাংলার সীমাবদ্ধ পরিবেশের চৌহদ্দির মধ্যেই এই বাণী ও রূপের সন্ধান করিতে হইবে।[৬০]

ভাষা-সাহিত্যের দিক থেকে লেখক পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিমবাংলার অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের চমৎকার মিল লক্ষ্য করেছেন এবং এই সূত্র ধরে লেখক তাঁর মতাদর্শ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। আঠার শতকের শেষদিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করে মার্কিনিরা তাদের স্বাধীনতা পায়। উভয় দেশের জনগণই একই ইংরেজিভাষী এবং একই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের সাহিত্যও ছিল অভিন্ন। স্বাধীন হওয়ার পরও মার্কিনিরা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে অধিক শক্তিশালী ইংল্যান্ডের প্রভাব-মুক্ত হতে পারেনি। তখনো মার্কিনিরা ইংল্যান্ডের ভাষা-সাহিত্যকে নিজেদের ভাষা-সাহিত্য বলে মনে করেছিল। ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন মার্কিনিরা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে পরাধীনই থেকে যায়। জাতীয় সত্তা ও স্বকীয়তা বলতে তাদের কিছু থাকে না। একই ভাষাভাষী ও একই ধর্মাবলম্বী হওয়ায় এই সমস্যা আরো জটিল হয়। এ সময় মার্কিন চিন্তাবিদ ইমার্সন মার্কিনিদের জাতীয় সত্তা ও স্বকীয়তার ওপর দাঁড়াতে বলে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেন। তিনি ইংল্যান্ডের ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুকরণ-অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আহ্বান জানান। লেখকের ভাষায়—

> ইমার্সন দেখাইলেন, মার্কিনীদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র সত্তার রক্ষা তার বিকাশ ও তার প্রসারের জন্যই তাদের কৃষ্টিক স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইংরেজের অনুকরণ বর্জন

> করিতে হইবে। ইমার্সনের ভাষায়: মাথায় না দাঁড়াইয়া পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। ...ইমার্সনের বাণী ব্যাখ্যা করিয়া বিশ শতকের গোড়ায় জারট্রুড স্টেইন বলেন: আমরা মার্কিনীরা ইংরাজীর বদলে অন্য ভাষা গ্রহণ করিতে চাই না। আমরা চাই ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের মধ্যে মার্কিনী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। আমরা চাই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে মার্কিনী অনুভূতি ঝংকৃত করিতে। ইংরাজীকে আমরা করিতে চাই মার্কিনী জনগণের মুখের ভাষা। ...আমরা ইংরাজী হরফ ও ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করিব। কিন্তু আমাদের ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ আমাদের ইংরাজী শব্দের মানে হইবে মার্কিনী। ইংরাজী ভাষায় অগণিত শব্দ সম্পদ আছে সত্য, কিন্তু তারা ইংলন্ডেই বিচরণ করে। আমরা সে-সব শব্দকে মার্কিন মুল্লুকের কর্কশ কঠোর মাটিতে নামাইব। ঐ সব ইংরাজী শব্দ আমাদের নয়া মাতৃভূমিতে আমাদের আশানিরাশা নিত্য-নতুন শব্দ তৈয়ার করিতেছে। এইসব শব্দ ইংরাজী শব্দের শামিল হইবে।[৬১]

ফলে ইমার্সন, জারট্রুড, স্টেইন, এযরা পাউন্ড, টি এস এলিয়ট প্রমুখের প্রচেষ্টায় মার্কিনিরা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইংল্যান্ডের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে তারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্রনীতি-সমরনীতিতে বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমেরিকা-ইংল্যান্ডের এই উদাহরণ আমাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু মার্কিনিরা যেমন প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তেমনি বাংলা বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হলেও বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যক, চিন্তাবিদেরা পশ্চিমবাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এখনো বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্য পশ্চিমবাংলার ভাষা ও সাহিত্যের লেজুড়বৃত্তি করছে বলে লেখক অভিযোগ করেছেন। মার্কিনিরা যেমন শুধু রাষ্ট্রীয় সত্তার তাগিদেই ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যকে নিজেদের বলে গ্রহণ করে তার মধ্যে মার্কিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, তেমনি বাংলাদেশকেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রয়োজনেই পশ্চিম-বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নিজেদের বলে মনে করে তাতে বাংলাদেশের জনগণের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে লেখক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তবে বাঙালি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৌভাগ্য যে, খোদ আবুল মনসুর আহমদের রচনায়ও তাঁর এই 'আশাবাদ' –এর প্রতিফলন ঘটেনি।

ছ. উপসংহার

প্রায় দু'শ বছরের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণে কোলকাতা ছিল উভয় বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু এবং সে কারণে কোলকাতা কেন্দ্র করেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে, কোলকাতা সুধীজনের ভাষাই হয়েছে সাহিত্যের ভাষা। লেখকের মতে এই সাহিত্যের সঙ্গে পূর্ব-বাংলার মানুষের প্রাণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ফলে পূর্ব-বাংলার সাহিত্য তার প্রাণ, রূপ ও আঙ্গিক কোনো দিক থেকেই স্বকীয়তা লাভ করতে পারেনি। এর কারণ— "অবিভক্ত বাংলায় কলিকাতার সাহিত্যিকরা পূর্ব-বাংলার এই স্বকীয়তাকেই অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাংলা ভাগ হইয়া ঢাকায় রাজধানী আসার পরেও এখানকার সাহিত্যিকরা সেই স্বকীয়তাকেই আজো অপাংক্তেয় করিয়া চলিয়াছেন।"[৬২] বাংলা সাহিত্য কোলকাতা শালীনভাষায় লেখা হয়, কিন্তু সেটা বাংলাদেশের কথ্যভাষা নয়। তাই লেখক বাংলাদেশের স্বকীয়তা রক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশের সাহিত্যে বাংলাদেশের কথ্য

বাংলাভাষা প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। তবে সেটা বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলের কথ্যভাষা লেখক তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। লেখকের মতে, বাংলাদেশের সাহিত্যের এই আদর্শ ভাষা হবে এ-দেশের সুধীসমাজ যথা হাইকোর্টের জজ-ব্যারিস্টার, উকিল, মোখতার, আইনসভার সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র, শিল্প-বাণিজ্যের মালিক-কর্মকর্তা, স্কুলের শিক্ষক, আলেম-ওলামা, সাংবাদিক-সাহিত্যিক প্রত্যেকে তাঁদের প্রতিদিনের আলাপ-আলোচনায় যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষা। সে ক্ষেত্রে লেখকের পরামর্শ এই যে, বাংলাভাষার সাধুরীতি হবে উভয় বাংলার লেখ্য আদর্শ ভাষা, এ ভাষায় সাহিত্যিকরা তাদের নিজের কথা বলবেন; আর পাত্র-পাত্রীর ভাষা হবে পশ্চিম-বাংলার ক্ষেত্রে কোলকাতা কথ্যবাংলা এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা হবে এদেশের সুধীসমাজের কথ্যবাংলা, অর্থাৎ 'কলকাতাইয়া বাংলা'র বিপরীতে লেখক এর নাম দিয়েছেন 'ঢাকাইয়া বাংলা'। আবুল মনসুর আহমদ অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও উদাহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষাকে পশ্চিমবাংলার সাহিত্যের ভাষা থেকে পৃথক করে এদেশের সুধীসমাজের কথ্যবাংলাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্থান দিতে চেয়েছেন। তবে অশাব্যঞ্জক হলো যে, লেখকের এই প্রয়াস সফল হয়নি। বাংলাদেশের সাহিত্যে এদেশীয় জনগণেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে; নাটক-উপন্যাস-গল্প-কবিতায় প্রয়োজনবোধে ও সঙ্গত ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার প্রয়োগও হচ্ছে, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা বা সুধীসমাজের কথ্যভাষা হিসেবে যে ভাষা স্বীকৃত হয়েছে, তা কোলকাতা কথ্যভাষা হিসেবে নয় বরং আমাদেরই আদর্শ কথ্যভাষা হিসেবে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল মনসুর আহমদ, 'বাংলাদেশের কালচার', ২৪ মাঘ, ১৩৭২, *বাংলাদেশের কালচার* গ্রন্থের নামপ্রবন্ধ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৯

২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের প্রবন্ধসাহিত্য', *একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৬*, জুন ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,, পৃ. ২৭৭-২৭৮

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ধর্মতত্ত্ব* (অনুশীলন), প্রথম অধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র), প্রথম তুলিকলম সংস্করণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা পৃ. ৫৯১

৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৫. কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির শেষাংশ, 'পরিচয়' পত্রিকা, মাঘ, ১৩৩৯। উদ্ধৃত: নীহাররঞ্জন রায়, *কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ২-৩

৬. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সাংস্কৃতিকী*, ১৩৬৮, কলকাতা, পৃ. ৮; উদ্ধৃত: আবুল কাসেম ফজলুল হক, *আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.২৯৩

৮. 'বাংলাদেশের কালচার' (নামপ্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

৯. ঐ, পৃ. ১৭-১৮

১০. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ৪র্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ৩৩
১১. 'বাংলাদেশের কালচার' (নামপ্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১২. ঐ, পৃ. ১৪
১৩. 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি', ১৯৭২, *বাংলাদেশের কালচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১
১৪. ঐ, পৃ. ১৪৮
১৫. ঐ, পৃ. ১৪৯
১৬. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, ১৯৫৭, ঢাকা, পৃ. ৩-৪
১৭. অতুলচন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮০, কলকাতা, পৃ. ২৪-৩৪
১৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, বাংলাদেশ সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ.১৭
১৯. রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারত* (সুমন চট্টোপাধ্যায় অনূদিত), ১৯৮৪, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত, কলকাতা, পৃ.১৩০; নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
২০. রামশরণ শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৯১; নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১; অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
২১. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
২২. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৬৭৬-১৭৫৭), দ্বিতীয় খণ্ড (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত), ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯
২৩. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২৪. এ সময় বঙ্গ ও সমতটের রাজারা সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। এ-কারণে এ সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। রাজবংশের মধ্যে একমাত্র খড়গ রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ। জনসাধারণের একটা বড় অংশের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কার প্রচলিত থাকলেও তারা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পায়নি। সপ্তম শতকের শেষদিক থেকে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও রাজবংশের সমর্থন পেতে থাকে।
নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২; অতুলচন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩
২৫. ঐ, পৃ. ২৮৩; নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
২৬. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
২৭. ঐ, পৃ. ১৪০-১৪৩; অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭,
২৮. 'বাংলাদেশের কালচার' (নামপ্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩
২৯. অতুলচন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩০. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২
৩১. "উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ আর্যদের মাথার খুলির গঠন Dolichocephalic বা দীর্ঘমস্তক বিশিষ্ট। অথচ বাঙালি ব্রাহ্মণদের মস্তক Brachycephalic অর্থাৎ প্রশস্ত মস্তক বিশিষ্ট। বাঙালি ব্রাহ্মণদের সাথে মিল পাওয়া যায় বাংলার কায়স্থ ও অন্যান্য হিন্দু শ্রেণির সাথে, অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের সাথে তাদের কোন মিল নেই। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, বাঙালি ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য শ্রেণির হিন্দুদের পূর্বপুরুষ ছিল নতুন এক শ্রেণির জনগোষ্ঠী যারা সম্ভবত আলপাইন ও পামীর অঞ্চলের অধিবাসী (Homo Alpinus) ছিল। তারা আর্যদের ভাষায় কথা বলত, কিন্তু তারা ভারত উপমহাদেশের বৈদিক আর্য জনগোষ্ঠীভুক্ত নয়। তারা বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে নিজেদের এক স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।"
উদ্ধৃত: এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৩২. 'বাংলাদশের জাতীয় আত্মা' (২৭ এপ্রিল, ১৯৭৩), *বাংলাদেশের কালচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৩৩. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
৩৪. 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি', *বাংলাদেশের কালচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৩৫. 'বাংলাদেশের কালচার' (নামপ্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩৬. রংগলাল সেন, 'বিশ শতকের বাংলাদেশ: সমাজ ও সমাজচিন্তার ক্রমবিকাশ', *একুশের প্রবন্ধ ২০০০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২০৩
৩৭. এম.এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৩৮. ঐ, পৃ. ১০-১১
৩৯. রংগলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৪
৪০. 'বাংলাদেশের কালচার' (নামপ্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৪১. ঐ, পৃ. ২৪-২৫
৪২. গোপাল হালদার, *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ*, ১৯৭৫, ঢাকা, পৃ. ৪৬
৪৩. 'পাক বাংলার রেনেসাঁ', ৫ মে, ১৯৪৪ সনে কলকাতা ইসলামিয়া মিলনায়তনে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর মূল সভাপতির অভিভাষণ, *বাংলাদেশের কালচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৪৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী ৩য় খণ্ড, ২০০১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪৩
৪৫. হাবীবুল্লাহ বাহার, *পাকিস্তান*, পৃ.৪৯; উদ্ধৃত: মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তা*, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৭৪, ঢাকা, পৃ. ৯৬
৪৬. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৪৭. গোপাল হালদার, *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৪৮. 'বাংলাদেশের কালচার' (নামপ্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৪৯. ঐ, পৃ. ৩৮
৫০. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, ২য় সংস্করণ, ১৯৭০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.১
৫১. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৫২. আহমদ রফিক, *বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, ঢাকা, পৃ. ৫৪
৫৩. 'বাংলাদেশের কালচার' (নামপ্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৫৪. ঐ
৫৫. ঐ, পৃ . ৪০
৫৬. 'সাহিত্যের প্রাণ, রূপ ও আংগিক' (২৪ মাঘ, ১৩৬৯ তারিখে লিখিত), *বাংলাদেশের কালচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৫৭. ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪
৫৮. ঐ, পৃ. ৪৪
৫৯. ঐ, পৃ. ৪৫
৬০. ঐ, পৃ. ৪৬
৬১. ঐ, পৃ. ৪৮
৬২. ঐ, পৃ. ৫৭

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের *সুশীলার উপাখ্যান*-এ চিত্রিত উনিশ শতকের সমাজজীবন

জোবায়ের মোহাম্মদ ফারুক*

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প আলোচিত হচ্ছেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। এই লেখকের গ্রন্থাবলিও এখন দুষ্প্রাপ্য। *সুশীলার উপাখ্যান* (১৮৫৯) মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচিত একটি উপন্যাসোচিত গদ্যরচনা। এই কাহিনীটি লেখক রচনা করেছেন মূলত সেকালের বাঙালি নারীদের নীতিশিক্ষা প্রদানের জন্য। এটি করতে গিয়ে লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকটা অসচেতনভাবেই ঔপন্যাসিক লক্ষণযুক্ত একটি কাহিনী রচয়িতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন কাহিনীর প্রয়োজনে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় অনালোচিত একজন লেখকের রচনা সম্পর্কিত এ আলোচনা অনেকখানি গুরুত্বের দাবি রাখে।

বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্বে চারটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এ চারটি ধারা বিশ্লেষণ করে গদ্যকাহিনীমূলক একটি ধারা পরিলক্ষিত হয়, যা সমকালীন সমাজনির্ভর। ঐতিহাসিক, নীতিমূলক, নক্শামূলক প্রভৃতি ধারা উপন্যাসোচিত গদ্যরচনাগুলিকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত কিছুসংখ্যক কাহিনী দেখি এসব রচনার মধ্যে। ধর্মপ্রচার থেকে শুরু করে নীতি প্রকাশ, যে উদ্দেশ্যেই রচিত হোক না কেন ১৮৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত আমরা কিছু রচনার সন্ধান পাই, যেসব রচনায় সমাজের প্রতিচ্ছবি অনেকখানিই দৃশ্যমান।

১৮২৩ সালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবু বিলাস* প্রকাশিত হয়। এটিকে সত্যিকারের উপন্যাসের মর্যাদা দেয়া যায় না। তবে একে উপন্যাসোচিত রচনা বলা যায় নিঃসন্দেহে। এ রচনায় উপন্যাসোচিত লক্ষণের পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। একদিকে প্রথম উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত গদ্য রচনা অন্যদিকে সমকালীন সমাজচিত্রনির্ভর বর্ণনা — দুইয়ে মিলে এ গ্রন্থটি লাভ করেছে এক ঐতিহাসিক মূল্য। এরপর পর্যায়ক্রমে এ জাতীয় আরো কয়েকটি রচনার সন্ধান আমরা পাই, যে রচনাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) প্রকাশের পূর্বে লিখিত।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, উত্তরা, ঢাকা।

উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বা উপন্যাসোচিত এবং সেই সঙ্গে সমকালীন সমাজনির্ভর গদ্যকাহিনীসমূহের একটি কালানুক্রমিক তালিকা হতে পারে নিম্নরূপ:

১. *নববাবু বিলাস* (১৮২৩): ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়;
২. *নববিবি বিলাস* (১৮৩০): ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়;
৩. *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২): হান্না ক্যাথেরিন ম্যলেন্স;
৪. *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮): প্যারীচাঁদ মিত্র;
৫. *মদ খাওয়ার বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়* (১৮৫৯): প্যারীচাঁদ মিত্র;
৬. *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান* (১৮৫৯): লালবিহারী দে এবং
৭. *সুশীলার উপাখ্যান* (১৮৫৯): মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

ভবানীচরণের *নববাবু বিলাস* দিয়ে এসব সমকালীন সমাজনির্ভর গদ্যকাহিনীর শুরু এবং মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের *সুশীলার উপাখ্যানে* এর সমাপ্তি। উল্লেখ্য, এর মাঝখানের যে কালপরিধি, তার মোটামুটি একটি বস্তুনিষ্ঠ সমাজচিত্র খুঁজে পাওয়া যায় এ-সব উপন্যাসোচিত গদ্যকাহিনীমূলক রচনায়।

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসোচিত গদ্যরচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে কম আলোচিত, লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা চোখে পড়ে না বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে। এই লেখকের গ্রন্থাবলি এখন বেশ দুষ্প্রাপ্য। তবুও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর *সুশীলার উপাখ্যান* কিছুটা হলেও গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের সামাজিক ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের এই গদ্যকাহিনীটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এই কাহিনীতে মূলত সেকালের বাঙালির গৃহ-জীবনের নানা অনুষঙ্গের দেখা পাওয়া যায় বস্তুনিষ্ঠভাবে। এর কারণ এটি রচিত হয়েছিল প্রধানত সেকালের নারীদের নীতিশিক্ষা প্রদানের জন্য। এই কাজটি করতে গিয়ে লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় একদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসোচিত বা ঔপন্যাসিক লক্ষণযুক্ত একটি কাহিনীর রচয়িতার ভূমিকা পালন করেছিলেন অনেকটা নিজের অলক্ষেই। আবার অন্যদিকে তিনি তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন এই গদ্যকাহিনীতে অনেকটা কাহিনীর প্রয়োজনেই।

১.

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় একসময় জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর *হংসরূপী রাজপুত্র* (১৮৫৭), *চকমকির বাক্স* সেকালে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। তিনি ভাষানুবাদ সোসাইটির (১৮৫০) সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[১] এ কারণে ইংরেজি থেকে অনেক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁর লেখা ইংরেজি গ্রন্থেরও দেখা পাওয়া যায়। তাঁর

অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা সতেরো। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের স্থান *সুশীলার উপাখ্যানে*-র জন্য। সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের মতে—

> মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অবশেষে একটি নীতিকাহিনী লিখলেন যেটি মৌলিক, যাকে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের দিক-চিহ্ন বলে কেউ কেউ মনে করেছেন।[২]

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

হংসরূপী রাজপুত্র, মৎস্যনারী উপাখ্যান (১৮৫৮), *বয় চতুষ্টয়* (১৮৫৮), *অবোধ, অহল্যা হড্ডিকা* (১৮৫৮), *সত্য ইতিহাস* (১৮৫৮), *চকমকির বাক্স, জীব রহস্য ২ খণ্ড* (অনুবাদ ১৮৬০-৬১), *কৃলফস ফেবলস* (১৮৭০), *Life of Mujabid Saha* (১৮৫৯), *Life of Lord Clive* (১৮৫৯)।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কিংবা মৃত্যুর সন-তারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি।

২.

সুশীলার উপাখ্যানে-র প্রথম ভাগ ১৮৫৯ সালে এবং বাকি অংশ ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়।[৩] মূলত নারীদের উপদেশ প্রদানের লক্ষ্যে কাহিনীটি রচনা করেন লেখক। এই রচনায় কাহিনীর ছলে মধুসূদন হিন্দু নারীদের বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। নানারকম পারিবারিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে এখানে উপদেশ প্রদানের কাজটি করা হয়েছে। *সুশীলার উপাখ্যানে* বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের উদারনৈতিক মনোভাব দেখা যায়। এতে লেখক স্বয়ং উল্লেখ করেছেন, "বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যানের প্রথমভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।"[৪] কাহিনীতে হান্না ক্যাথেরিনের কথা উল্লেখ আছে। তাঁর রচিত *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*-ই সম্ভবত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়কে এ রকম একটি কাহিনী লিখতে প্রভাবিত করেছিল।

উপন্যাসোচিত লক্ষণ থাকলেও সার্থক উপন্যাসের সুস্পষ্ট আবহ *সুশীলার উপাখ্যানে* অনুপস্থিত। চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত কিংবা নাটকীয়তা কোনোটাই কাহিনীটিতে নেই। অতি সরল এ কাহিনীতে উপন্যাসোচিত গুণ তেমন একটা না থাকলেও তখনকার বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের চমৎকার ছবি এতে পাওয়া যায়। কাহিনীটির ভাষা সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন—

> বইটির ভাষা তখনকার আরব্য-উপন্যাসের অনুবাদের মতোই বর্ণনাত্মক ও আড়ষ্ট। তবুও নারীপাঠ্য গ্রন্থরূপে কিছু প্রচার লাভ করিয়াছিল।[৫]

সুশীলার উপাখ্যান-এর তৃতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের জবানিতে জানা যায় —

> এই সামান্য গ্রন্থ সুশীলার উপাখ্যান জনসমাজে এইরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইবে স্বপ্নেও আমি এমত আশা করি নাই।[৬]

গদ্য কাহিনীটি বর্তমানে বেশ দুষ্প্রাপ্য। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস খোঁজার ক্ষেত্রে *সুশীলার উপাখ্যানে*-র গুরুত্ব আছে। এর বাইরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবা বাংলা গদ্যের ধারায় *সুশীলার উপাখ্যানে*-র আলোচনা খুব একটা হয়নি বললেই চলে।

সুশীলার উপাখ্যান কাহিনীটির তৃতীয় ভাগে দেখা যায়, সুশীলার সংসারজীবনের চিত্র। আগাগোড়া নীতিবাদিতায় আচ্ছন্ন সুশীলার চরিত্রে মানবোচিত কোনো ভাবাবেগের পরিস্ফুটন দেখা যায় না। মানবীয়তার ঊর্ধ্বে নীতিবাদিতার প্রয়োগ করেছেন লেখক এই চরিত্রটির ক্ষেত্রে। কাহিনীতে নীতিহীন পাপী চরিত্রের সমাবেশও যে একেবারে নেই, তা নয়। দু-একটি চরিত্রে সেকালের পতিতা-আসক্তি বা নেশাগ্রস্ততার চিত্র-প্রকাশ ঘটেছে *সুশীলার উপাখ্যানে*। তবে লেখক এই কাহিনীতে সবকিছুরই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন নারীদের সুশিক্ষা দেওয়ার তাগিদে।

সুশীলার উপাখ্যানে-র ভাষা বেশ সহজ ও বোধগম্য। প্রকাশভঙ্গিতে এক ধরনের প্রাণবন্ত আবেগের স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে তৎসম শব্দ প্রয়োগে লেখকের প্রবণতা লক্ষণীয়।

তৎসম শব্দবহুল হলেও *সুশীলার উপাখ্যান*-এর ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। উপমা, শব্দ-অলংকার কিংবা চিত্রকল্প সৃষ্টিতে লেখকের কোনো মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবু এ গদ্যকাহিনীর কিছু কিছু জায়গায় ভাষার আবেগময়তা ফুটে উঠেছে। যথা— 'জীবন ক্ষণস্থায়ী, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় টলমল করিতেছে, কখন আছে, কখন নাই,' ...।[৭]

কিংবা, 'আমার জন্য ভাবনা নাই, প্রজ্বলিত অনলের নিকটে কেহ সহসা আসে না, তুমি নিজে সাবধানে থাকিও'।[৮]

এখানে উল্লিখিত উদাহরণের মতো গদ্যভঙ্গি *সুশীলার উপাখ্যানে* খুব বেশি নেই। ধারণা করা সংগত যে সুনিপুণ বা সাহিত্যিক গদ্যের লেখনী বিষয়ে লেখকের দক্ষতা ছিল। কিন্তু লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সেই পথে যাননি। কারণ সাহিত্য সৃষ্টির চাইতে উপদেশ প্রদানকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি এই রচনাতে।

উপন্যাসের লক্ষণের কথা বলতে গেলে *সুশীলার উপাখ্যানে* কাহিনীর পাশাপাশি চরিত্রের দ্বন্দ্বগত কিছু বিষয় পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত নারী চরিত্রের অন্তর্গত মনোবেদনা লেখক ভালোভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন কাহিনীতে। *সুশীলার উপাখ্যানে* আমরা দেখি—

> অবলা বালা যাতনাতে অস্থিরা হইয়া ধরণীকে কহিতেন, মা পৃথিবি! বিদীর্ণা হও, আর সহিতে পারি না, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়া দুঃখ নিবারণ করি![৯]

এখানে একজন নারীর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার অন্তর্গত রূপটি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। এসবের বাইরে *সুশীলার উপাখ্যানে*-র ঔপন্যাসিক মূল্য খুব বেশি নেই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ক্ষেত্রে কিংবা চরিত্রের বর্ণনায় এই কাহিনীতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু মেলে না। *সুশীলার উপাখ্যানে*-র মূল কৃতিত্ব বা এই কাহিনীর সত্যিকারের গুরুত্ব নিহিত আছে সমাজচিত্রের

বর্ণনার ক্ষেত্রে। তখনকার গ্রাম্য সমাজের বিস্তারিত না হলেও কিছু সমাজঘটিত চিত্রের দেখা পাই আমরা এই গদ্যকাহিনীতে।

সুশীলার উপাখ্যান-এ তখনকার ইংরেজ শাসকদের গুণকীর্তন করা হয়েছে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে। ইংরেজরা যে এদেশীয়দের হিতকল্পে আত্মনিবেদিত, তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কাহিনীতে। এ ছাড়াও ইংরেজদের রীতিনীতি বা তাঁদের মানবিক গুণাবলি যে এদেশীয়দের চেয়ে উন্নত, কাহিনীতে বিভিন্নভাবে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের প্রকাশভঙ্গিমা কাহিনীকে অনেকখানি প্রচারমূলক আবহ দান করেছে। কাহিনীর এজাতীয় প্রকাশ লালবিহারীর *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে*-র সঙ্গে অনেকখানিই সাদৃশ্য তৈরি করেছে। *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে* যেমন ইংরেজ ও খ্রিস্টানদের মতাদর্শকে চরম ভক্তিবাদের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে *সুশীলার উপাখ্যানেও* একই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

সুশীলার উপাখ্যানে-র পটভূমিকাও প্রধানত তৎকালীন গ্রাম্য সমাজকে কেন্দ্র করে সূচিত হয়েছে। আগেই উল্লিখিত, লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মূলত নারীদের উপদেশমূলক বিভিন্ন বিষয় অবহিত করার জন্য এই গদ্যকাহিনীটির অবতারণা করেছিলেন। উপদেশ বা নীতিশিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে লেখককে সেই সময়কার বিভিন্ন পারিবারিক তথা সামাজিক বিষয়ের চিত্রাঙ্কন করতে হয়েছিল। লেখক এই গদ্যকাহিনীটি তিনটি ভাগে রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগে সুশীলা নামক একজন সর্বগুণে গুণান্বিতা নারীর বাল্য, তারুণ্য ও বিবাহিত জীবনের বর্ণনার মাধ্যমে সমকালীন সময়ের এ দেশের নারীদের শৈশব, যৌবন ও সংসারজীবন সম্পর্কে নানা উপদেশমূলক শিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই উপদেশবাণীগুলো এ দেশের তখনকার সাধারণ নারীজীবনকে প্রতিপাদ্য করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। আর এভাবেই গদ্যকাহিনীটিতে অঙ্কিত হয়েছে তখনকার সমাজজীবনের বাস্তব প্রতিফলন। *সুশীলার উপাখ্যানে*-র তিনটি ভাগই বাংলার পল্লীজীবনের পটভূমিকায় রচিত। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে কাহিনীর তৃতীয় ভাগের সমাজচিত্র উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস নিচ্ছি। তিনটি ভাগ একই পটভূমিকায় রচিত হওয়ায় তৃতীয় ভাগের সমাজঘটিত প্রতিফলন থেকে লেখকের উপস্থাপিত তৎকালীন সমাজের সার্বিক চিত্রটি আমরা পাব।

৩.

বঙ্কিম-পূর্ব অপরাপর বাংলা গদ্যকাহিনীগুলোর মতোই *সুশীলার উপাখ্যানেও* একই ধরনের সামাজিক অনুষঙ্গের দেখা মেলে। ভবানীচরণ ও প্যারীচাঁদ রচিত কাহিনীর মাধ্যমে যদিও কোলকাতা তথা তৎকালীন নগরকেন্দ্রিক বাবুদের জীবনাচারের ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে, তথাপি এই গদ্যকাহিনীগুলোর বাইরে হান্না ক্যাথেরিন, লালবিহারী দে ও মধুসূদনের রচনাগুলো মূলত শহরজীবনকে অতিক্রম করে গ্রামবাংলার সামাজিক জীবনে পদার্পণ করেছে। কিন্তু কাহিনীর বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক দিয়ে এই দু'টি ধারার সাদৃশ্য

বেশ লক্ষণীয়। সেকালের কয়েকটি মৌল বিষয় যেমন — বাল্যশিক্ষা, নারীজীবনের বৈষম্য কিংবা সামাজিক বা ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি প্রায় সব ক'টি কাহিনীতেই আলোচিত হয়েছে। *সুশীলার উপাখ্যানেও* এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সুশীলার উপাখ্যানে-র তৃতীয় ভাগের শুরুতেই দেখা যায়, গ্রামীণ শিশুদের বাল্যশিক্ষা লাভের চিত্র। এখানে সুশীলার সন্তান গৃহে প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান লাভ এবং কিছু পড়াশোনার পর পিতামাতা কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রেরিত হয়। এ সম্পর্কে কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে– "বিজয়নগরে যে একটী গবর্ণমেন্ট-বিদ্যালয় ছিল, চন্দ্রকুমার বাবু পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাতেই তাহাকে শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিতে লইয়া গেলেন।"[১০] এখানে আমরা সে সময়কার বিজয়নগর নামক স্থানের সরকারি বিদ্যালয়ের দেখা পাচ্ছি। উল্লেখ্য, ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশদের শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে এ দেশে সরকারি আনুকূল্যে শিক্ষা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক জেলায় সরকারি স্কুল গড়ে ওঠে, যা জেলা স্কুল নামে পরিচিত। জানা যায়, তৎকালীন সরকার ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত সব অর্থ জেলা স্কুলগুলোর জন্যই ব্যয় করেন।[১১] অনুমান করা সম্ভব, তখন গ্রামে সরকারি স্কুল এবং সে-সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নও মোটামুটি প্রসার লাভ করেছিল। সে-সময়কার বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বিষয়েও অবগত হওয়া যায় কাহিনী থেকে। যেমন "তৃতীয় শ্রেণীতে...সুকঠিন সংস্কৃতভাষা এবং নানা মহোপকারী ইংরাজী পুস্তক পাঠ হইত, ...।"[১২] দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত তখন বিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত ছিল। সেই সঙ্গে শাসকদের ভাষা ইংরেজিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হতো। এখানে আমরা ফারসি ভাষা শিক্ষার কোনো তথ্য পাচ্ছি না। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ১৮৩৫ সনে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফারসিকে বাদ দিয়ে ১৮৩৬ সালে ইংরেজিকে শাসনকাজের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[১৩] মূলত উনিশ শতকের তৃতীয় থেকে চতুর্থ দশকের ভিতরেই সব ধরনের সরকারি কাজে ফারসিকে বাদ দিয়ে ইংরেজি ভাষার প্রচলন করা হয়। সে-কারণেই বোধহয় বিদ্যালয়ে তখন ফারসি ভাষা পাঠ্যভুক্ত করার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছিল।

সেকালে স্কুলে পড়াশোনার ব্যয়-সম্পর্কিত একটি ধারণা পাওয়া যায় এই কাহিনী থেকে। ছেলেকে "প্রতিমাসে এক এক টাকা বেতন, ও মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দিতে হইত।"[১৪] এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিদ্যালয়ে এক টাকা করে মাসিক বেতন প্রদান ছাড়াও নতুন বই কিনে দিতে হতো অভিভাবকদের।

সুশীলার উপাখ্যানে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ের বাইরেও জমিদারদের জনহিতকর কাজ হিসেবে বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা উল্লেখ আছে। জয়চন্দ্র বাবু নামক একজন 'ধর্ম্মপরায়ণ' জমিদার কর্তৃক বিজয়নগর নামক স্থানে 'নীচজাতীয় বালক বালিকাদিগের' জন্য দু'টি পাঠশালা স্থাপন করার কথা কাহিনীতে সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৫] গ্রামে জমিদাররা শিক্ষা

প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনসহ নানামুখী পদক্ষেপ নিতেন, তা আমরা জানি। অন্যদিকে জানা যায়, সে সময় ইংরেজ সরকার এদেশীয় জমিদারদের অনুরোধ করেছিলেন অন্তত একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য।

বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বর্ণনা দেওয়ার পাশাপাশি *সুশীলার উপাখ্যানে* গ্রামে সরকারিভাবে স্থাপিত গ্রন্থাগার এবং শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপনের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের ক্ষেত্রে অবগত হওয়া যায় – "বিজয়নগরের কাছারিতে সাধারণের উপকারার্থ যে একটী পুস্তকালয় আছে, তাহাতে প্রতিমাসে অবস্থানুসারে কাহাকেও দুই আনা কাহাকেও চারি আনা দাতব্য দিয়া পুস্তক আনয়ন করিতে হয়।"[১৬] সরকারিভাবে স্থাপিত গ্রন্থাগারেও পাঠকদের মাসিক চাঁদা দিতে হতো বলে কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে।

সেকালের নারীশিক্ষার চিত্রটি কাহিনীতে বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভে বঞ্চিত নারীরা কীভাবে সেকালে গৃহে শিক্ষালাভের প্রচেষ্টা করত, সেটির একটি চিত্র *সুশীলার উপাখ্যানে* দেখা যায়। কাহিনীতে বিষয়টি এভাবে দেখানো হয়েছে, "স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যানুশীলনে যত্নবতী দেখিলে, বাটীর সদ্‌গুণান্বিত বালকেরা সাতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করায়।"[১৭] এটি সেকালের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি চমৎকার উদাহরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। পরিবারের শিক্ষিত বালক কর্তৃক লেখাপড়া না-জানা নারীদের শিক্ষাদানের বিষয়টি সত্যিকারভাবে এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতেও অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

কলকাতার নারীশিক্ষার বেশ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায় এই গদ্যকাহিনীতে। বিশেষত, ইংরেজদের মধ্যকার একশ্রেণীর শিক্ষাব্রতী মহিলা কর্তৃক এ দেশে নারী শিক্ষাদানের বিষয়ে যে প্রচেষ্টা ছিল সেটির কথা বেশ নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে *সুশীলার উপাখ্যানে।* কলকাতার নারীশিক্ষক তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– "কলিকাতা ফিমেল নরমেল স্কুল নামে স্ত্রীশিক্ষক-প্রস্তুত করণজন্য যে একটী বিদ্যালয় আছে, আমি সেই বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষা।"[১৮] মেয়েদের শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা হতো মূলত বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য। যেমন— "নরমেলস্কুলের শিক্ষাদায়িনীগণ এখন কলিকাতাস্থ তিন চারি ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে যাইয়া তন্মধ্যস্থা বালিকাদিগের শিক্ষাবিধান করিতেছেন।"[১৯] এখানে ফিমেল নরমেল স্কুলের নারীশিক্ষক তৈরির কারণ জানতে পারছি আমরা। মূলত বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্যই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, বলা যায়। তখনকার নারীশিক্ষার বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছ থেকেও জানা যায়। বিশেষত, মিসেস উইলসন নামক ইউরোপীয় মহিলার প্রচেষ্টার ফলে কীভাবে এ দেশে নারীশিক্ষার সূচনা হয়েছিল তার উল্লেখ আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, মূলত মিসেস উইলসনের চেষ্টায়, অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও

কমপক্ষে ২৭৭ জন বালিকা উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়ন আরম্ভ করে।[২০] ইংরেজদের নারীশিক্ষার তৎপরতার বিষয়ে তখনকার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি তথ্যও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৫ জুন ১৮৩১ তারিখে প্রকাশিত পত্রিকায় বলা হয়েছে—

> মিসিনরি সাহেবেরা প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ বিত্ত ব্যয় ও ব্যসনপূর্ব্বক বাগ্‌দী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন...।[২১]

এ দেশে নারীশিক্ষা বিষয়ে লেখক *সুশীলার উপাখ্যানে* বেশ ভক্তির সঙ্গে ইংরেজদের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। কাহিনীতে, সেকালের লোকদের নিজ নিজ কন্যাকে বিদ্যা শিক্ষাদান প্রচেষ্টার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি, অনুবাদক সমাজ যে মেয়েদের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছিল সে বিষয়টিরও উল্লেখ করা হয়েছে।[২২] এ ছাড়াও এদেশীয় নারীদের শিক্ষার বিষয়ে ইংরেজদের অবদানের আরো কিছু বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে কাহিনীতে। যেমন–

> ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ-বাসী দেশহিতৈষী লোকদিগের নিকট হইতে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় যে ফিমেল নরমেলস্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এদেশীয়া স্ত্রীলোকদিগকে সুবিবেচিকা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং সদাচারিণী করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।[২৩]

এখানে উল্লিখিত নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটি যে সত্য এবং বাস্তব তা শিবনাথ শাস্ত্রীর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়। তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, স্কুল সোসাইটির (প্রতিষ্ঠিত ১৮১৭) কয়েকজন মহিলা সদস্যের প্রচেষ্টার ফলে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'British and Foreign School Society'-র সদস্যরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে মিস কুক (Miss Cooke) নামের একজন শিক্ষিত মহিলাকে এ দেশে পাঠান। মিস কুক এদেশে পদার্পণ করেন ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে।[২৪] এ ছাড়াও শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায়, উক্ত 'কুমারী কুক' এ দেশে শিক্ষাপ্রচার আরম্ভ করার আগে বেশ ভালোভাবে বাংলা ভাষা শেখেন।[২৫] এ দেশে আসার পর এই কুমারী কুক উইলসন নামক একজন মিশনারিকে বিয়ে করেন[২৬] এবং এরপর তিনি মিসেস উইলসন নামে পরিচিত হন। এই মিসেস উইলসন কীভাবে এ দেশের মেয়েদের শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন তা কাহিনীতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। পাশাপাশি হান্না ক্যাথেরিন ম্যলেন্সের কথাও কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। এ বিষয়গুলো একেবারে বাস্তব প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত। কাহিনীতে আছে– "বিবি উইলসন ও মলেন্সের ন্যায় ভদ্র ভদ্র সকল ইংরাজের স্ত্রী বঙ্গভাষা উত্তমরূপ শিখিয়া যদি বঙ্গদেশীয় রমণীগণের মঙ্গলসাধনে যত্নবতী হয়েন, তবে না জানি এই বঙ্গদেশের কতই মঙ্গল হয়।"[২৬] এবং কাহিনীতে এও দেখা যায়–

> ইতর লোকদিগের বালিকাগণের বিদ্যোন্নতির কারণ শ্রীমতী বিবি উইলসন, কি হিন্দু কি ইংরাজ, সকল ধনাঢ্য লোকের কাছে স্বয়ং যাইয়া মুদ্রা সংগ্রহ করিতেন, তাঁহার সুমধুর যুক্তিসিদ্ধ বাক্য-কৌশলে সকল লোকেই তুষ্ট হইয়া আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে মুদ্রা প্রদান করিত।[২৭]

দেখা যাচ্ছে, শুধু ইংরেজ সমাজেই নয়, মিসেস উইলসনের শিক্ষা কাজের মহৎ উদ্যোগটি এদেশীয় মানুষদের দ্বারাও সাদরে গৃহীত হয়েছিল। তিনি তাঁর প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য ইংরেজদের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি এদেশীয় ধনবানদের কাছ থেকেও অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিতেন। আমাদের দেশে অদ্যাবধি শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের নানা প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত ধারায় বিদ্যমান। যার শুরুটা হয়েছিল সম্ভবত সেই উনিশ শতকে।

সুশীলার উপাখ্যান থেকে আরো জানা যায়, ১৮২৮ সালে মিসেস উইলসন হেদুয়ার পূর্ব দিকে পাকা দোতলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন বালিকাদের জন্য। তখনকার রাজা বৈদ্যনাথ এই কাজের জন্য 'বিংশতি সহস্র মুদ্রা' দান করেন ও এই বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[২৮] অন্যদিকে কাহিনীতে উল্লিখিত হান্না ক্যাথেরিন ম্যলেন্স এদেশীয় মেয়েদের শিক্ষা প্রচারকর্মীর পাশাপাশি *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) নামে উপন্যাসোচিত গদ্যকাহিনী রচনাকারী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।[২৯] এ ধরনের বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক পরিপূর্ণভাবে বাস্তবতার অনুগামী হয়েছিলেন। মিসেস উইলসন সে সময়ে এ দেশে বয়স্ক শিক্ষার জন্যও কিছু কাজ করেছিলেন বলে কাহিনীতে উল্লিখিত। বিশেষ করে, যারা বৃদ্ধ তাদের বিদ্যার্জনের জন্য তিনি "একটি পণ্ডিত এবং একটি গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"[৩০] সেই সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে *সুশীলার উপাখ্যানে* বর্ণিত এসব বিষয়ের বাস্তবতা বেশ সহজেই যাচাই করা সম্ভব।

সে সময়কার কৃষি বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত লক্ষ্য করা যায় *সুশীলার উপাখ্যানে।* অর্থের বিনিময়ে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে কৃষিকাজ করার চিত্র এতে রয়েছে। যেমন, সুশীলা তার স্বামীকে সংসারে আয় বৃদ্ধির জন্য বলছে, "অল্প রাজস্বে বিঘা চারি ভূমি লইয়া কৃষিকর্ম্মের আরম্ভ করা আমাদের আবশ্যক হইয়াছে।"[৩১] কৃষি উপকরণ ও জনবলের বিষয়ে দেখা যায়, উক্ত চন্দ্রকুমার দত্ত একজন চাকর, একটি লাঙল ও দু'টি গরু নিয়ে পর্যায়ক্রমে আরো অধিক পরিমাণ কৃষিজমিতে কৃষিকাজ শুরু করেন।[৩২] বর্ণিত কাহিনীতে কৃষিকাজের জন্য লোকবল ছাড়াও লাঙল, হালের গরুর বিষয়ে জানা যায়।

একজন সাধারণ বাঙালি পরিবারের পুরো বছরের খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পারিবারিক নানা অনুষঙ্গের বিষয়গুলো আমরা কাহিনীর মাধ্যমে জানতে পারি। কাহিনীতে, "সম্বৎসরের খাদ্য চাইল, দাইল, গরুর খোরাক ও ঘর ছাওয়ান খড় প্রভৃতি"[৩৩] কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ গ্রামীণ একটি পরিবারে চাল-ডালের সঙ্গে গরুর খাবার এবং ঘর ছাওয়ার ছন প্রভৃতি দ্রব্যও নিত্যকার প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল। এ ছাড়া কাহিনীতে আছে একজন সমৃদ্ধ গৃহস্থ পরিবারের সৌভাগ্যের চিহ্ন হলো গোলা ভরা ধান, খড়ের গাদা প্রভৃতি সম্পদ। যেমন— "বাটীতে দুই তিনটী মরাই গোলা ও খড়ের পালুই থাকাতে লক্ষ্মী যেন তাঁহার গৃহে বিরাজমানা আছেন,...।"[৩৪] সামান্য এসব উপকরণ তখন কৃষকের সৌভাগ্যের

উপকরণ হওয়ায় এমন ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে সে সময়কার একজন সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের চাহিদা খুব বেশি ছিল না। এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা উচিত যে, এইটুকু সামান্য গৃহ উপকরণও তখন বেশিরভাগ গ্রামীণ গৃহস্থ পরিবারের জুটত না।

> "ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত...মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলেই বারেবারেই এদেশে খাদ্যসংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দিয়েছে এবং কারণে, অকারণে কৃষকেরা জমি থেকে ক্রমাগত উচ্ছেদ হয়েছে।"[৩৫]

ফলে বাংলার গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুণ ন্যূনতম চাহিদা মেটানোও তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

তৎকালীন বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায় *সুশীলার উপাখ্যানে।* কাহিনীতে চন্দ্রকুমার দত্ত নামক ধনী বেনিয়ার কন্যার বিয়ের বর্ণনার দ্বারা বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ছাড়া কাহিনীর অন্তে সুশীলার পুত্র প্রিয়ম্বদের বিয়ে উপলক্ষেও এসব বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। বর-কনের বিয়ের আচারের ক্ষেত্রে দেখা যায়— "সভ্যদিগের অনুমতিক্রমে সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচনানন্তর বরপাত্রটীকে অন্তঃপুরে স্ত্রীআচার করিতে পাঠাইলেন। ভিতর বাটীতে শঙ্খধ্বনি ও কলরবের আর ইয়ত্তা রহিল না।"[৩৬] এভাবে তখনকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের একটি আচারের বিষয়ে জানা যাচ্ছে। এ ছাড়াও বিয়ের পরে 'কুশণ্ডিকা' নামক আচারের সময় শপথের চিত্র দেখা যায়। যেমন — "বিবাহের পর কুশণ্ডিকার সময়ে বরকন্যা উভয়ে...শাস্ত্রপ্রণীত সংস্কৃতমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দেব দ্বিজ গুরু অগ্নি ও সভাসদদিগকে সাক্ষী করিয়া পরস্পর শপথ করিতেছিল,...।"[৩৭] বলা উচিত যে কুশণ্ডিকা হলো হিন্দুদের বিয়ের অনুষ্ঠানে পালিত এক ধরনের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান।[৩৮] *সুশীলার উপাখ্যানে* এজাতীয় রীতি অনুষ্ঠানের বর্ণনায় বিশেষ পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। বোঝা যায়, লেখক হিন্দুসমাজ তথা বাংলার গ্রামীণ রীতির বিষয়ে সমধিক অবগত ছিলেন।

শুধু বিয়ের আচার নয়, বিয়ের ভোজের সময়কার এদেশীয় মানুষদের একটি বাজে অভ্যাসকে কাহিনীতে লেখক অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই কু-অভ্যাসটির বর্ণনায় দৃশ্যমান হয়—

> খাইতে খাইতে মিষ্টান্নসামগ্রী কাপড়ে তুলিয়া আনা, এদেশীয় লোকদিগের একটী বিশেষ কুরীতি আছে, বঙ্গদেশ ব্যতীত এরূপ কুৎসিতাচার ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে প্রচলিত নাই; পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিরাও এমন কর্ম্ম করে না।[৩৯]

ভোজানুষ্ঠান থেকে খাবার সঙ্গে করে নিয়ে আসার প্রবণতাটি হাস্যকর সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পেছনে মূল কারণটি হয়তো করুণ। তখনকার সময়ে খাদ্যসংকটও এজাতীয় অভ্যাসের একটি কারণ। সেকালের গ্রামের জনসাধারণ যাদের বেশিরভাগই ছিল কৃষক তাদের দুর্দশার কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে — "এ ধন কৃষিজাত— কৃষকেরই প্রাপ্য— পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। ...ঈশ্বরপ্রেরিত

কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পায়েন, মহাজন পায়েন,— কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?"[৪০] আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে সেকালের গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জীবিকানির্ভর দুর্গতির চিত্র। বঙ্কিমের কথা থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, উনিশ শতকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে গ্রামের সাধারণ প্রজার (যাদের সিংহভাগই ছিল কৃষক) পরিশ্রমকে উপজীব্য করে শাসকগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের এদেশীয় তাঁবেদাররা অর্থনৈতিক সুবিধালাভ করত। পক্ষান্তরে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দিনযাপন হতো অত্যন্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুর্ভোগের মধ্যে। এর ফলে হয়তো বা অনাহারক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ ধনীগৃহে ভোজের কালে এজাতীয় অসম্মানজনক পন্থা অবলম্বন করত। কিংবা বলা যায়, কাহিনীতে সন্নিবেশিত এ ধরনের তথাকথিত অসম্মানজনক পন্থার মূল পরিপ্রেক্ষিত নিহিত ছিল তখনকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই।

কাহিনীতে দেখা যায়, বিয়ের সময় বরকে নিয়ে বাসরঘরে কন্যার আত্মীয়া রমণীদের নানারকম হাসিঠাট্টা বা আমোদের প্রচলন ছিল। যেমন — "বাসর ঘরে আর আর মেয়েদের সহিত তোমাকে গান বাজনা ঠাট্টা তামাসা করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে।"[৪১] এটি সে সময়কার বিয়ের একটা প্রচলিত রীতি বা আনন্দের উপকরণ ছিল বলেই মনে হয়।

সেকালে কন্যাকে পাত্রস্থ করার ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য ছিল কৌলীন্য আর অর্থবিত্ত। *সুশীলার উপাখ্যানেও* এটির উল্লেখ আছে এভাবে : "দয়া ধর্ম্ম এবং জ্ঞান-বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করেন নাই, শুদ্ধ কুলীন এবং ধনী বলিয়া তোমাকে তাঁহায় সম্প্রদান করিয়াছিলেন,...।"[৪২] মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এজাতীয় নীতিহীন আচরণ যে কতখানি বাস্তব ছিল তা 'সেকালের বিবাহ' নামক লেখায় যোগেন্দ্রকুমারও বেশ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, একটি চোর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে গৃহকর্তা চোর একজন কুলীন — এ কথা জানার পর তাকে পুলিশে সোপর্দ না করে নিজ কন্যাকে "সেই চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বীয় বংশ মর্য্যাদা উজ্জ্বল করিলেন।"[৪৩] এসবের বাইরেও সেকালের ছেলেদের বিয়ের বয়স সম্পর্কে উল্লেখ আছে, "আমাদের বেনিয়া জাতির ব্যবহার এই, ১২ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে২ আমরা পুত্রের বিবাহ দি...।"[৪৪] তথ্যটা সেকালের ছেলেদের বিয়ের বয়স জানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে।

সুশীলার পুত্র প্রিয়ম্বদের বিয়ে উপলক্ষে আমরা উপাখ্যান থেকে সেই সময়কার বিয়ের নানারকম আচার-অনুষ্ঠানসম্পর্কিত আরো কিছু বিষয় অবগত হই। বিয়ে উপলক্ষে কী রকম বিলাসিতা হতো সেটি জানতে পারি প্রিয়ম্বদের পিতাকে দেয়া বিয়ের অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে বিভিন্নজনের পরামর্শ থেকে। যেমন:

> ময়ূরপক্ষী, ফুলের ঝাড়, রোসনাই, বাজী, ইংরেজীবাদ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্য করিয়া প্রথম পুত্রের বিবাহ দাও।...কতকগুলা ঘড়া, কতকগুলা বকুনা এবং কতকগুলা থাল, ক্রয় করিয়া বিবেচনামতে ভদ্রলোকদিগকে তেল সন্দেশ মাছ বিতরণ কর। কেহ বলিলেন, পল্লীগ্রামে ভাই আমাদের বড় একটা নাচ গান হয় না, কলিকাতা হইতে তরফাওয়ালীদিগকে (তয়ফাওয়ালী) আনিয়া দিনকতক বাইনাচ, খেমটানাচ দেখাও, তাহা হইলে বড় মজা হইবে।[৪৫]

বলা বাহুল্য, বিয়েকে কেন্দ্র করে যেসব অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কাহিনীতে, সেগুলো যে তখনকার সেই উনিশ শতকে ধনী লোকের পুত্র বা কন্যার বিয়ে উপলক্ষে আয়োজন করা হতো। এসব বিষয়ে জানা যায় তখনকার বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে। *সমাচার দর্পণে*-র ৯ মার্চ, ১৮২২ সংখ্যায় লেখা বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিয়ের জাঁকজমকের বর্ণনা:

> তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মিরী প্রভৃতি প্রধান২ গায়ক আর২ অনেক তয়ফাও আসিছিল এসকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিশ সুখদায়ক হয়।[৪৬]

দেখা যাচ্ছে *সমাচার দর্পণে* প্রকাশিত বিয়ের আনন্দ উপকরণের সঙ্গে কাহিনীতে বর্ণিত 'বাইনাচ, খেমটা নাচে'র মিল রয়েছে। কোলকাতার নর্তকীরা সেকালে বেশ সমাদৃত ছিল, এ কথা জানা যায়। তখনকার বাঙালি সমাজে ধনিকশ্রেণী পূজা বা বিয়ে উপলক্ষে বিপুল টাকা ব্যয় করে আনন্দ উৎসবে মত্ত হতো, এ কথা সর্বজনবিদিত। তারা এসব সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করত। *সমাচার দর্পণে*-র (২৭ মার্চ ১৮১৯) আরেকটি খবরে বলা হয়েছে, সেকালের 'কাশীমবাজারের' হরিনাথ রায় বাহাদুরের 'জিনিসের কমদামে অধিক ব্যয়ে' যেরকম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে ধরনের বিয়ে এর আগে কেউ এদেশে প্রত্যক্ষ করেননি।[৪৭] কাহিনীসূত্রে তখনকার বিয়ে উপলক্ষে এসব অতিব্যয়ী অনুষ্ঠানের কথা বেশ বাস্তবানুগভাবেই আমরা পাচ্ছি। বিয়ের বিভিন্ন যজ্ঞ বা আচার কাহিনীতে বেশ নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিয়ের একটি আচারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, "নবযুবতী ভদ্রবংশজাগণ বাদ্যকর সমভিব্যাহারে হুলু হুলু শব্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া ও বরণ-ডালা মাথায় লইয়া বাটীর বাহির হন,...।"[৪৮] এ দেশের বিয়ের রীতিনীতির সমালোচনার মানসে এ ধরনের চিত্র লেখক কাহিনীতে সন্নিবেশিত করলেও এ জাতীয় বর্ণনার সাহায্যে তখনকার সমাজের বিয়ে বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারি।

বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা গদ্যকাহিনীর ধারায় দেখা যায় তৎকালীন নারী-জীবনের বিভিন্ন দুর্দশার বর্ণনা। তখনকার নারীদের প্রতি সামাজিক ও ধর্মীয় নির্যাতনের বিষয়ে অত্যন্ত সমালোচনামুখরতার দেখা মেলে এসব কাহিনীতে। *সুশীলার উপাখ্যান* যেহেতু নারীদের উপদেশার্থে লেখা, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই গদ্যকাহিনীতেও সেকালের নারীদের দুর্দশার চিত্র-স্বরূপ বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। লেখক এসব বিষয়ে প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। *নববাবু বিলাস*, *নববিবি বিলাস*,

আলালের ঘরের দুলাল ও *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান* প্রভৃতি কাহিনীতেও দেখা যায়, ধনিকশ্রেণীর লোকদের স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি অবহেলার চিত্র। *সুশীলার উপাখ্যানেও* সেই একই চিত্র দেখা যায়, কাহিনীর মালবী নামক চরিত্রের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। মালবীর স্বামীসাহচর্য ছিল নিতান্ত অল্প। কাহিনীতে বলা হয়েছে, "কি রাত্রি কি দিন, মালবীর সহিত একবারও তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।"[৪৯] তখনকার ধনিকশ্রেণীর পুরুষদের ভোগমত্ততা এবং অনাচারই এর মূল কারণ।

বাল্যবিবাহ যে তখনকার দিনের সমাজের একটি বড় ব্যাধি ছিল তা-ও উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসোচিত গদ্যকাহিনীগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই দেখা যায়। *সুশীলার উপাখ্যানেও* এই বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন– "অল্পবয়সে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রথা এদেশের বড়ই কুরীতি হয়।"[৫০] বাল্যবিবাহকে তখনকার সমাজের একটি নিকৃষ্ট রীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন লেখক। এ দেশের তখনকার সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহের বিষয়ে লেখকের সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশিত হয়েছে কাহিনীতে— "বাল্যবিবাহ-রূপ কুরীতি এ দেশ হইতে কতদিনে দূর হইবে,...।"[৫১] বাল্যবিবাহের মতো অকল্যাণকর সামাজিক ব্যাধির প্রসার ঘটাতে তখনকার সময় পূর্ববর্তী একশ্রেণীর পণ্ডিতের দেয়া বিধি মেনে চলা হতো। তাদেরই একজন হলেন ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত রঘুনন্দন। তিনি উনিশ শতকেও বেশ মান্যবর ছিলেন সামাজিক রীতিনীতির ধর্মীয় ব্যাখ্যাকার হিসেবে। এই পণ্ডিত উদ্বাহতত্ত্বে বাল্যবিবাহের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করেন–

> কন্যার রজোদর্শন হইবার পূর্ব্বেই কন্যাদান প্রশস্ত।...দশ বৎসরের মধ্যে যত্নসহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে কন্যা ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয়; এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ংবর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করা উচিত।[৫২]

বাল্যবিবাহ তখনকার উনিশ শতকের বাঙালিসমাজে কতটুকু বিস্তার লাভ করেছিল তা জানার জন্য একটি পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ১৮৯১ সালে ৪,১৯৮,৮১৯ বিবাহিত নারী পুরুষের মধ্যে জন্ম থেকে চার বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ছিল ২,৩১৩ জন।[৫৩] বাল্যবিবাহের এই হাস্যকর প্রবণতাটি সে সময়কার সমাজকে অনেকটাই অমানিশাগ্রস্ত করেছিল নিঃসন্দেহে।

বিধবাবিবাহ বিষয়টিকে কাহিনীতে অত্যন্ত গুরুত্ব-সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। ভগবানের উদ্দেশে সুশীলার আর্তি— "এদেশীয় বিধবাদিগের স্বামি-বিরহরূপ অসহ্য যন্ত্রণার তুমি কত দিনে প্রতীকার করিবে।"[৫৪] অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা নিঃসন্দেহে। তবে এই ন্যায়সঙ্গত বিষয়টির বিরোধিতা করেছিল তখনকার কতিপয় জমিদার বা প্রভাবশালী ব্যক্তি, অন্তত কাহিনীতে তা-ই দেখা যায়। 'রামকান্ত উমাকান্ত কমলাকান্ত' প্রমুখ প্রভাবশালী জমিদারদের 'এ বিষয়ের বিদ্বেষী' হওয়ার কথা কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে।[৫৫] তখনকার সংবাদপত্রে বিধবাদের অবস্থা সম্পর্কে জনৈক পত্র লেখক লেখেন– "যাঁহারা ব্রহ্মচর্য বলিয়া চীৎকার

করেন তাঁহারাই বিধবাদিগের দ্বারা সাংসারিক সকল কার্য করাইয়া লন।...সে সংসারের দাসী এবং পরিচালিকা।"[৫৬] দেখা যাচ্ছে, বিধবাদের বিষয়ে তখনকার সমাজের মনোভাব কতটা নিষ্ঠুর এবং বাতিকগ্রস্ত ছিল। বিত্তশালী ও সমাজপতিরা বিধবাদের প্রতি নানারকম সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলা যায়। বিধবাবিষয়ক অভিশাপটি যে তখনকার সমাজকে কলুষতায় পরিপূর্ণ করেছিল তার প্রমাণও *সুশীলার উপাখ্যানে* পাওয়া যায়। বিধবা প্রসঙ্গে কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে– "ভদ্র ভদ্র পরিবারগণ বিধবাদিগের জ্বালাতে...জ্বালাতন হইয়াছেন ও হইতেছেন...।"[৫৭] এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিষয়ক রচনাগুলোর কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর সমাজে বিধবা হওয়ার কুফল বিষয়ে নানা ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়। ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী উনিশ শতকে বিধবাবিবাহ নিয়ে কোলকাতায় প্রবল আন্দোলন তৈরি হয়। অন্যদিকে ঢাকায় এই আন্দোলনের সূচনা ঘটে ১৮৬১ সাল নাগাদ। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও বিধবাবিবাহ বিষয়ে নানাপ্রকার কর্মকাণ্ড আরম্ভ হয়। নোয়াখালী অঞ্চলে এ ব্যাপারে মেয়েদের মতামত-কেন্দ্রিক একটি সংবাদও ছাপা হয়েছিল *সংবাদ প্রভাকরে*-র পাতায়। *সুশীলার উপাখ্যানেও* আমরা লেখকের মধ্যে বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রবল উদারনৈতিক মনোভাব লক্ষ্য করি। তবে বিধবাদের বিষয়ে সমাজের অগ্রসর এবং শিক্ষিত শ্রেণী যতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সে তুলনায় মোটেও উদার ছিল না।

বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহের পাশাপাশি কাহিনীতে তখনকার সমাজের বহুবিবাহ নামক তথাকথিত কুলীন আচারের কথাও ব্যক্ত হয়েছে। কাহিনীতে বহুবিবাহের বিষয়ে লেখকের অভিমত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। এই বিষয়টির নেতিবাচকতা নির্দেশ করে কাহিনীতে জানানো হয়েছে–

> বহু-বিবাহ দোষটী এদেশীয় লোকদিগের একটি বিষম দোষ, উহা লোকতঃ শাস্ত্রতঃ ধর্ম্মতঃ সকল পক্ষেই নিতান্ত বিরুদ্ধ, তথাপি লোকে কৌলিন্য-মর্য্যাদা রক্ষা হেতু অথবা ধনমদে মত্ত হইয়া বহু বিবাহ করে। বহু স্ত্রীর পতিদিগের সুখ তো কিছুই দেখি না, কেবল ইহাতে করিয়া অবলা কুলবালাদিগকে চিরদুঃখিনী করা হয়, কুলে কলঙ্ক হয়, বংশ শ্রীভ্রষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়।[৫৮]

বেশ জোরালোভাবে বহুবিবাহের সমালোচনা করা হয়েছে এখানে। কুলীন আচার কিংবা বিত্ত জাহির করার জন্য লোকে তখন অনেক বিয়ে করত এবং এই অধিকসংখ্যক বিয়ে যে সমাজের জন্য হিতকর ছিল না সেটিও কাহিনীতে বর্ণিত আছে। আদপেই তখনকার সময়ে এই বহুবিবাহের দ্বারা নারীদের প্রতি চরম বৈষম্য এবং দুর্দশা তৈরি করা হতো সমাজে। ১৮৩৭ সালের *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় কুলীনদের বহুবিবাহের কিছু পরিসংখ্যান ছাপা হয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, ১২ জন কুলীনের সব মিলিয়ে ৫৪৭ জন পত্নী ছিল। এদের মধ্যে জনৈক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৬২ জন এবং নিমাই মুখোপাধ্যায়ের ৬০ জন স্ত্রী ছিল

বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] এই তালিকা থেকে বোঝা যায়, সেকালে বহুবিবাহ নামক বর্বর রীতিটির কতটা বিস্তার লাভ ঘটেছিল সমাজে। আর এই বহুবিবাহের কুফল বিষয়ে বিদ্যাসাগরের একটি লেখার অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

> বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই, তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যাভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয়, এজন্য,...অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলোভে চরিতার্থ হইয়া...স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।[৬০]

প্রবল বিকারগ্রস্ততা আর নীতিহীনতা যে সমাজকে চরমভাবে পতিত করেছিল বিদ্যাসাগরের এজাতীয় তথ্য থেকে সেটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। *সুশীলার উপাখ্যানে* উল্লিখিত বহুবিবাহ বিষয়টি লেখক যে অত্যন্ত বাস্তবভাবে উপস্থাপন করেছেন তা বলা যায়। কাহিনীতে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রবক্তা বিদ্যাসাগরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমত যে 'শাস্ত্র-সম্মত' এবং 'অখণ্ডনীয়' তাও বলা হয়েছে এতে।[৬১] কেবল বিদ্যাসাগরই নন, উনিশ শতকের অন্যান্য লেখকের রচনাতেও আমরা সেকালের অর্থাৎ উনিশ শতকের নারী-জীবনের নানাবিধ সত্যের দেখা পাই। এ প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) প্রভৃতি রচনার কথা উল্লেখ করা যায়। বিশেষত, *বিয়ে পাগলা বুড়ো*-তে বুড়ো লোকটির কর্মকাণ্ডের দ্বারা দীনবন্ধু মিত্র উনিশ শতকের সমাজের পুরুষদের বহুবিবাহজনিত নীতিহীন আচরণের সমালোচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধু লেখনীর মাধ্যমেই নয়, নিজস্ব জীবনাচারেও উনিশ শতকের বিখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তি সেকালে প্রচলিত সামাজিক এসব কুপ্রথাকে পরিহার করার চেষ্টা করেছিলেন। এটির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ প্রখ্যাত বাঙালি সারা জীবনে একটি মাত্র বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকেন। কারো কারো নিতান্ত অল্প বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হলেও তাঁরা বাকি-জীবনে আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেননি। প্যারীচাঁদের স্ত্রীর প্রতি নিদারুণ ভালোবাসা স্ত্রী বিয়োগের পর জীবনের শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল, সেটি তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা জানা যায়।

সুশীলার উপাখ্যানে তখনকার নারী-জীবনের বিস্তারিত এবং বাস্তবমুখী চিত্র পাওয়া যায়। নারীর নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার চিত্রও এতে চমৎকারভাবে সন্নিবেশিত। বিত্তশালী পরিবারের নারীরা তাস খেলে আড্ডা দিয়ে যে সময় কাটাত তা-ও জানানো হয়েছে কাহিনীতে। যেমন— "ধনাঢ্য লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা তাস-ক্রীড়া, মিথ্যা গল্প, অথবা অলঙ্কারাদির কথা কহিয়া...কাল হরণ করেন,...।"[৬২] ধনী পরিবারের নারীদের সম্পর্কে আরো জানা যায়, পরিবারে কাজের লোক থাকায় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের তুলনায় তাদের সংসারে পরিশ্রম ছিল নিতান্ত অল্প।[৬৩] সেকালের নারীকুলের আলাপচারিতার বিষয়ে জানা যায়, "তাঁহারা সকলে একত্র বসিয়া কোন স্ত্রী কিরূপ চরিত্রের, কাহার স্বামী কিরূপ

ভালবাসে, কাহার গহনা কত টাকার"[৬৪] জাতীয় আলাপে ব্যস্ত থাকত। চিত্রটি বাঙালি নারীদের ক্ষেত্রে চিরকালীন এবং সর্বজনীন, সন্দেহ নেই। সেকালে বাঙালি রমণীরা পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখত অন্তত এই কাহিনীতে তা পরিলক্ষিত হয়। একজন গৃহিণীকে দেখা যায়, যিনি "নিত্য সংসারের যে খরচপত্র দিনের বেলা লিখিয়া রাখেন তন্ন তন্ন করিয়া তাহার হিসাব দেন।"[৬৫] এখানে একটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে যে, তখনকার নারীরা সীমিতভাবে হলেও সংসারের অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে শুরু করেছিলেন। সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখার চিত্র থেকে কিছুটা হলেও এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

নারীদের পতিভক্তি বিষয়ে বেশ নির্ভরযোগ্য চিত্র প্রকাশিত হয়েছে *সুশীলার উপাখ্যানে।* বিশেষত, কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে তখনকার মেয়েরা তা মুখে উচ্চারণ করাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতো। যেমন— "বঙ্গদেশীয় কোন স্ত্রীলোক, জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীর নাম আপন মুখে স্পষ্ট করিয়া বলে না,...?"[৬৬] পতিভক্তির বিষয়ে এটি সেকালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চিত্র। স্বামীকে গুরুজনের মতো মান্য করার বিষয়টি তখনকার সমাজে বেশ প্রচলিত ছিল। "বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পতিকে গুরুজনের মধ্যে এক প্রধান গুরু বলিয়া মান্য করেন,...।"[৬৭] বলা যায়, পতিকে মান্য করার মধ্যে নিহিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য। সংসারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থান সম-পর্যায়ের হবে অন্তত আধুনিক সভ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে সেটিই স্বাভাবিক। স্ত্রীকে অধীন কিংবা শিষ্যজাতীয় মানুষ হিসেবে গণ্য করাটা নারীর সামাজিক অবস্থান বা তার ব্যক্তিসত্তাকে খাটো করার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এই মনোবৃত্তি এখনো অব্যাহত।

তখনকার পারিবারিক জীবনের কিছু চিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গদ্যকাহিনীটির ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতাতেই পারিবারিক জীবনের অনুষঙ্গগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। ধনীগৃহের প্রাত্যহিক কাজের বর্ণনা —

> ধনাঢ্য লোকদিগের অন্তঃপুরে পাচক ব্রাহ্মণ বা পাচিকা ব্রাহ্মণী থাকে, পাকাদি কর্ম্ম তাহাদের দ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। ভৃত্যেরা স্থান পরিষ্কার করিয়া আসন জলাদি প্রদান করে, ব্রাহ্মণ আহারীয় দ্রব্য একেবারে প্রস্তুত করিয়া বাবুদিগের সম্মুখে আনিয়া দেয়।[৬৮]

প্রাত্যহিক সংসারের কাজকর্ম ভৃত্যদের দ্বারাই সমাধা হতো। বিশেষত, সংসারের কর্তার আহার তৈরি এবং পরিবেশনের কাজটি ভৃত্যদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। আর এসব গৃহভৃত্যের প্রতি নির্দয় আচরণেরও একটু উল্লেখ আছে কাহিনীতে। সংসারের সব কাজই তাদের সাহায্যে করানো এবং তাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করার চিত্রটি কাহিনীতে তুলে ধরা হয়েছে–

> আপনারা শুইয়া বা বসিয়া থাকেন, ভাল খান, ভাল পরেন, তাহারা কি খেলে কি পরিলে তাহার তত্ত্বাবধান না করিয়া কেবল গৃহকর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে অনুমতি করেন, না করিলে কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন।[৬৯]

সুশীলার উপাখ্যানে তৎকালীন গ্রামবাংলার যে সামাজিক চিত্র আঁকা হয়েছে তার জীবনপ্রণালী নিস্তরঙ্গ এবং সুস্থির। গ্রামীণ জীবনের অনটনের চিত্র থাকলেও তা খুব বেশি গভীর নয়। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ১৭৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পরিবর্তিত হতে থাকে গ্রামীণ সমাজ। জমিদারদের অত্যাচারের ফলে প্রচণ্ড আর্থিক ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় বাংলার পল্লীজীবনে। সমাজচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে এদিক দিয়ে *সুশীলার উপাখ্যান* বিপরীতমুখী চিত্র তুলে ধরেছে পাঠকদের সামনে। কাহিনীর মূল পটভূমিকা গ্রামদেশ হলেও রাজনৈতিক নীতির ফলস্বরূপ তৈরি হওয়া জমিদার কর্তৃক সাধারণ কৃষকদের ওপর নির্যাতনের চিত্র এতে নেই বললেই চলে। বরং জমিদারদের ইতিবাচক দিক তুলে ধরার ক্ষেত্রেই কাহিনী অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

সুশীলার উপাখ্যানে লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন সময়ের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বেশ বিস্তারিত চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। লেখকের লক্ষ্যও ছিল বোধহয় সেটা। এদেশীয় নারীদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার মানসে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লেখক বিস্তারিতভাবেই সামাজিক ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছেন সন্দেহ নেই। কাহিনীতে সমাজচিত্র সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে লেখকের পর্যবেক্ষণও ছিল বেশ সূক্ষ্ম। বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা গদ্যকাহিনীর ধারায় সামাজিক-চিত্রের বর্ণনার ক্ষেত্রে গভীর অনুসন্ধানের পরিচয় ফুটে উঠেছে *সুশীলার উপাখ্যানে।* কাহিনী বিচার, ঘটনার সীমাবদ্ধতা, সত্যের অনেকখানি অপলাপ প্রভৃতি বাদ দিলে শুধু সমাজচিত্রের বর্ণনার ক্ষেত্রে *সুশীলার উপাখ্যানে*-র সার্থকতা অনস্বীকার্য। বিস্তারিত বাঙালি গৃহজীবনের নানা অনুষঙ্গের বর্ণনা বঙ্কিম-পূর্ব অন্যান্য গদ্যকাহিনীতে বিরল।

তথ্যনির্দেশ

১. "এই বিদ্বৎসভা স্থাপিত হয় ১৮৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে। ১৪ ও ২৮ ডিসেম্বর (১৮৫০) 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকায় এই সভা স্থাপনের বিবরণ অনুষ্ঠান-পত্রাদিসহ প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানপত্রে এই সভার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়:
ট্রাস্ট সোসাইটি কিম্বা খৃষ্টান নলেজ সোসাইটি কি স্কুল বুক সোসাইটি অথবা আসিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার সাহেবরা সভার নিয়মমতে সর্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা উক্ত কমিটির সাহেবেরা প্রকাশ করিবেন।"—বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৯৬

২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, কলকাতা, নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৬, পৃ. ৯৯

৩. সুশীলার উপাখ্যান বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে সবচেয়ে কম আলোচিত। সুকুমার সেন কিংবা ক্ষেত্র গুপ্তের মতো জনা কয়েক সাহিত্য সমালোচক এই রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া খুব কমসংখ্যক সাহিত্যবেত্তাই এই গদ্য রচনাটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৫. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যে গদ্য,* কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ.৬২
৬. শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়, *সুশীলার উপাখ্যান,* তৃতীয় ভাগ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৭৫, বিজ্ঞাপন অংশ হতে উদ্ধৃত।
লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং সুশীলার উপাখ্যানে-র তৃতীয় ভাগের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশে লিখেছেন, "জগদীশ্বরের কৃপায় প্রথম দুই ভাগে যেরূপ আমার কৃতার্থতা লাভ হইয়াছে, তৃতীয় ভাগেও যদি সেইরূপ হয়, তবেই সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।" — মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, বিজ্ঞাপন অংশ থেকে গৃহীত।
৭. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৮. ঐ, পৃ. ১০১
৯. ঐ, পৃ. ২২
১০. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১১. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, *বাংলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ,* ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১৯
১২. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১৩. আবু জাফর, "বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মানসিকতার রূপরেখা ও কতিপয় কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাস", *বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা,* কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৪, ২২ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, পৃ. ৪৩
১৪. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
১৫. ঐ, পৃ. ৪-৫
১৬. ঐ, পৃ. ৫-৬
১৭. ঐ, পৃ. ৫৮; নারীশিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে ২৬.০১.১২৫৬ তারিখে প্রকাশিত *সংবাদ প্রভাকর*-এ প্রকাশিত হয় —
"স্ত্রীলোকদিগ্যে বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য, এইক্ষণে প্রায় অনেকেই তাহা মুক্তমুখে স্বীকার করিবেন, তবে কতকগুলীন্ প্রতিবন্ধকতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু যদবধি তাহার সংহার হইয়া এবিষয়ের সঞ্চার না হইবেক তদবধি কোনমতেই আমারদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, নিশ্চয়রূপে কহিতে পারি যে এদেশের অবিদ্যারা বিদ্যাবতী না হওয়াতেই সকল প্রকারে অনিষ্ট হইতেছে।"— বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র-দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা, নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২৭
১৮. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১৯. ঐ, পৃ. ৮১
২০. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* ঢাকা, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৫৯
২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড* (১৮৩০-১৮৪০), কলকাতা, প্রথম প্রকাশিত, বৈশাখ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮
২২. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
২৩. ঐ, পৃ. ৮৪
২৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

২৫. ঐ, পৃ. ১৫৯
২৬. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
মিসেস উইলসনের বিয়ের পর তিনি নারী শিক্ষাব্রতে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর সে সময়কার ইংরেজ মহিলারা একত্র হয়ে লর্ড আমহার্স্টের (১৭৭৩–১৮৫৭) পত্নী লেডি আমহার্স্টকে (১৭৯৪–১৮৬৪) সভানেত্রী করে Bengal Ladies Society (১৮২৫) গঠন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন—
"বেঙ্গল লেডিস সোসাইটি বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য করিয়াছিল। এমনকি ১৮৩৪ সালে আডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়;...।" —শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
২৭. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
২৮. ঐ, পৃ. ৯৬
২৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস*, কলকাতা, জুলাই ২০০০, পৃ. ১১১
৩০. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৩১. ঐ, পৃ. ৯
৩২. ঐ, পৃ. ১০
৩৩. ঐ, পৃ. ১০
৩৪. ঐ, পৃ. ১০-১১
৩৫. তাপস বসু, *বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য,* কলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬
৩৬. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩৭. ঐ, পৃ. ১৭
৩৮. "কুশণ্ডিকা...হিন্দুদের বিবাহাদি উৎসবে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানবিশেষ; যজ্ঞের জন্য [য.প্রা.] অনুষ্ঠিত অগ্নি সংস্কার ক্রিয়া।" —আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ১২৩
৩৯. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৪০. *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮৪বঙ্গাব্দ, পৃ.২৬৮
৪১. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪২. ঐ, পৃ. ২৮
৪৩. যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, "সেকালের বিবাহ", *প্রবাসী*, ৩১শে ভাদ্র, ৮ম খণ্ড, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ২৬, উদ্ধৃত: মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৪৪. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৪৫. ঐ, পৃ. ১১১
৪৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩০), কলকাতা, আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ১৪৩
৪৭. ঐ, পৃ. ১৪১
৪৮. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৪৯. ঐ, পৃ. ২২

৫০. ঐ, পৃ. ৫২
৫১. ঐ, পৃ. ১২১
৫২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ৩৪৫
৫৩. *Census of India* (Bengal), 1891, Vol. IV, Table VIII, Part B, pp.146-147; উদ্ধৃত: মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৫৪. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৫৫. ঐ, পৃ. ১২২
৫৬. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৬, পৃ. ৩৩১, উদ্ধৃত: মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৫৭. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৫৮. ঐ, পৃ. ৫৪
৫৯. *জ্ঞানান্বেষণ*, ২৩ এপ্রিল, ১৮৩৬, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮০০-৮০১, উদ্ধৃত: মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৬০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, *বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সমাজ)*, কলকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ২২৬-২২৭

বিধবাবিবাহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে সে সময়ে অনেকগুলো গান রচিত হয়েছিল। সে রকম একটি গানের অংশবিশেষ—

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে,
সদরে ক'রেছো রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।...
আর কেন ভাবিস্‌লো সই, ঈশ্বর দিয়েছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই,
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই।

— শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রম নিরাশ*, নতুন সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ১২, উদ্ধৃত: মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৬১. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৬২. ঐ, পৃ. ৪৭
৬৩. ঐ, পৃ. ৪৭
৬৪. ঐ, পৃ. ১৪
৬৫. ঐ, পৃ. ৬৩
৬৬. ঐ, পৃ. ৮০
৬৭. ঐ, পৃ. ৮১
৬৮. ঐ, পৃ. ৩৯
৬৯. ঐ, পৃ. ৩০-৩১

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

ক্ষমতার দর্শন: রাসেলীয় ভাবনার মূল্যায়ন

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার*

সারসংক্ষেপ

মানব ইতিহাসের সামগ্রিক দৃশ্যপট বিবেচনা করে দেখা যায়, মানুষ যতই সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নিজেকে প্রসারিত করেছে ততই বেড়েছে তার স্বাতন্ত্র্য, বেড়েছে নিজের ক্ষমতাকে আরো সংহত করার বিচিত্র কৌশল। মানুষের এই অচ্ছেদ্য মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃত্তি নিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ক্ষমতার দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানুষ কোনভাবেই তার এই বিচ্ছেদহীন প্রবৃত্তিকে দমাতে পারে না যতক্ষণ সে একটা সামষ্টিক নৈতিকতার আচ্ছাদনে এই নগ্নপ্রবৃত্তিকে আচ্ছাদিত করে দিতে পারে। ব্যক্তিক নৈতিকতা তখনই বাস্তবে রূপ নেয় যখন তা সামষ্টিক নৈতিকতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এ ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি থাকাসত্ত্বেও গণতন্ত্র হতে পারে মানুষের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। ক্ষমতার দর্শনে রাসেল গণতন্ত্রের নানারকম চলক নিয়ে আলোচনা করেছেন যার বিশেষণমূলক জবাব দাঁড় করানোই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

এক

বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ক্ষমতাকে মানব-জীবনের সবচেয়ে মৌলিক সামাজিক চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন, কার্ল মার্কস্ (১৮২০-১৮৮৩) যেটাকে খুঁজে পেয়েছেন সম্পদের মধ্যে আর সিগমন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) পেয়েছেন যৌন প্রবৃত্তির মাঝে। সমাজদর্শন বিষয়ক রাসেলের বিভিন্ন রচনা বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে লেখা *পাওয়ার* (১৯৩৮) গ্রন্থে এ-সংক্রান্ত বিষয়াদি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মানব প্রকৃতির এমনতর গভীর উপলব্ধি শেষে নতুন এক সমাজ বিশ্লেষণ ও রাষ্ট্রকাঠামো সংক্রান্ত প্রস্তাবনার বিশ্লেষণমূলক জবাব দাঁড় করানো হবে এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মানুষ সমগ্র জৈব প্রকৃতির মাঝে এমন এক ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী যাকে দু'টা আলাদা প্রবৃত্তি দিয়ে চেনা যায়। একটা তার জৈববৃত্তি, যার সাথে জড়িয়ে আছে বেঁচে থাকার অতি অপরিহার্য কিছু বৈশিষ্ট্য। অন্যটা সামজিক আকাঙ্ক্ষা, যা তাকে প্রথমটা থেকে অনেকাংশে প্রসারিত করেছে এবং বিশ্ব-জগতে তাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। জীববৃত্তি সীমিত হয়েছে আত্মগণ্ডির চৌহদ্দিতে। কেননা শারীরবৃত্তিও দাবী-দাওয়া মেটানোর বাইরে এর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। প্রচণ্ড ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে শারীরিক চাহিদার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ কিছু সময়ের

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জন্য বেশ স্বস্তি পায়। তৃষ্ণা, ঘুম, যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি শারীরিক দাবী এই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত যা অত্যন্ত সহজাত তথা ব্যক্তিজীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্য। এগুলো এতটাই প্রভাবশালী যেগুলো ছাড়া জীবন প্রকারন্তরে অর্থহীন। ক্ষুধার্থ মানুষের কাছে কোন জীবনবোধ, নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ কোনভাবে অর্থপূর্ণ নয়। যৌনাকাঙ্ক্ষা পরিণত জীবনের এমন এক বিচ্ছেদহীন প্রবৃত্তি যাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। এটা বলতে গেলে প্রতিদিনের খাদ্য চাহিদার মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা' ছাড়া এটা জীবনেরই ধর্ম। এ ধরনের দাবিকে সাময়িক ভাবে অগ্রাহ্য করা গেলেও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে একে অস্বীকার করার কিছুই নেই। সামগ্রিক জীবনের মিছিলে এ-এক অন্তহীন পরম্পরা। প্রজাতির পর প্রজাতি এগিয়ে চলে এরই হাত ধরে। এখানে অন্যান্য প্রাণের সাথে মানুষের পার্থক্য করা খুবই মুশকিল। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়?

যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করেছে তা হল তার সামাজিক প্রবণতা (Social disposition)। মানুষ শুধুমাত্র প্রবৃত্তির তাড়নার মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে এমন উদাহরণ কম। কেননা গিনিপিগ বা কুমিরের সাথে মানুষের পার্থক্য বিস্তর। প্রবৃত্তির ছোট সীমানাকে টপকিয়ে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে অনন্য জীব হিসেবে। রাসেল মানুষের এই সামাজিক প্রবৃত্তিকে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর মতে অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ আলাদা হয়েছে তার বিশেষ কিছু উদ্ভাবন দিয়ে যা তার সামাজিক চেতনারই প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরেছে। তিনি অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের পার্থক্যের জায়গা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন— 'ভাষা, আগুন, কৃষি, লেখনী, যন্ত্রপাতি ও ব্যাপক হারে সহযোগিতা'র[১] মাঝ দিয়ে মানুষকে মানবেতর প্রাণী থেকে আলাদা করা যায়। এখানে তিনি যে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন তা সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে বহুমাত্রিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এ কারণে মানুষের আগ্রহ ব্যক্তিমানুষ থেকে সামাজিক-মানুষের প্রতি বেশী। সামাজিক নানা রকম প্রপঞ্চকে সে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে, নিজেকে বিস্তৃত করে বিশ্বজনের সাথে। অন্যের চোখে মানুষ নিজেকে দেখবার চেষ্টা করে, নিজে এ ভাবে মূল্যায়িত হতে ভালবাসে।

মানুষ বিবর্তনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে জান্তব স্তর অতিক্রম করে যতই সামনে এগিয়েছে ততই বেড়েছে তার স্বতন্ত্রতা, বেড়েছে আত্মমর্যাদাবোধ। নিজেকে সে সম্পৃক্ত করেছে বিবিধ সামাজিক কর্মধারার সাথে। মানুষ উপলব্ধি করেছে সামাজিক জোটবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করার মধ্যে রয়েছে সর্বাধিক নিশ্চয়তা। কারণ এই জটিল জীবন-যাপনের জন্য দরকার অন্যের সহযোগিতা, পারস্পরিক সাহচার্য। রাসেল উপলব্ধি করেন, মানুষ সম্পূর্ণভাবে সামাজিক জীব হিসেবে বিবেচনা যোগ্য নয়। কেননা তার মধ্যে আছে দুটো বিপরীত মুখী প্রবণতার যৌথাবস্থান। একটা নিঃসঙ্গতাবোধ, অন্যটা সামষ্টিক চেতনা। সিংহ কিংবা বাঘ অনেকটা নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত জীবনে অভ্যস্ত। অন্যদিকে মৌমাছি বা পিঁপড়া কোন সময়ই সামষ্টিক চেতনার বাইরে কিছু করে না। পৃথিবীতে এতটা সামাজিক আচরণ অন্য কোন

প্রাণীর বেলায় লক্ষ্য করা যায় না। মানুষ এ দুটো বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি কিছু। পুরোমাত্রায় নিঃসঙ্গও নয় আবার নিচ্ছিদ্র সামাজিকও নয়। তাঁর কথায়:

> মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে তার প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে অনেক জটিল এবং এ জটিলতার মধ্য দিয়ে তার সমস্যাবলীর উদ্ভব ঘটে। সে পিঁপড়া ও মৌমাছির মত পুরোপুরি সামাজিক নয় আবার সিংহ ও বাঘের মত সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গও নয়। সে একটা আধা-সামাজিক প্রাণী।[২]

বস্তুতঃ মানুষের এ আধা-সামাজিকতার জন্য তৈরী করতে হয়েছে আচরণের এক আদর্শগত প্যারাডাইম। মানবাচরণের লাগামকে রশি দিয়ে টেনে মানুষের জন্য মাঙ্গলিক আচরণ সৃষ্টি করার জন্য বানাতে হয়েছে নীতিচিন্তা। ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রের জন্য এক অপরিহার্য নীতিবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি নৈতিক ভাবনার প্রয়োজন অনুভব করেন। রাসেলের এ ভাষ্য আলোচনার আগে আমরা দেখতে চাই মানব-চরিত্র সম্পর্কে তিনি কী ধারণা পোষণ করতেন।

দুই

রাসেল মনে করেন মানুষের কিছু প্রেষণা আছে যেগুলো ব্যক্তিক জীবনে বেশ প্রভাবশালী তবু রাজনৈতিক বিবেচনায় এগুলোর বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। যেমন প্রতিটি মানুষই জীবনের একটা সময়ে বিয়ের ইচ্ছে পোষণ করেন এবং এ-ইচ্ছে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোন ধরনের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই পূরণ করা সম্ভব। রাসেল তাঁর *পলিটিক্যালি ইমপর্টেন্ট ডিজায়ার*[৩] প্রবন্ধে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে মোটাদাগে দু'ভাগে ভাগ করেন। এ দু'টি হলো, মুখ্য ও গৌণ। খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্রকে তিনি বেঁচে থাকার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে বলেছেন, এগুলোর অভাব মেটাতে মানুষকে অনেক সময় সহিংস হতে দেখা যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় আরব দেশে এক সময় তীব্র অভাবের কারণে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে মানুষ বাঁচার আশায় পাড়ি জমাতো। ফলে ঐসব অঞ্চলে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতির পেছনে এ ঘটনার বেশ প্রভাব রয়েছে। জার্মান উপজাতিদের রাশিয়া থেকে ইংল্যান্ড এবং পরবর্তীকালে সানফ্রান্সিসকোতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে একই রকম কারণ বিদ্যমান বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। যাই হোক, এটা নিশ্চিত করে বলা যায় খাদ্যের কারণে মানুষের নানা রকম কর্মকাণ্ড রাজনীতির ওপর যে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে তার অনেক উদাহরণ আছে। তবে মানুষের যে-সব আকাঙ্ক্ষা শারীরবৃত্তি ও চাহিদাকে ছাপিয়ে গেছে তাকে সামাজিকভাবে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলোকে রাসেল চার ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো— অধিকারলিপ্সা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যশোলিপ্সা ও ক্ষমতানুরাগ।[৪] যদিও আমরা এগুলোর মধ্যে ক্ষমতানুরাগ বা ক্ষমতার নানাবিধ প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করবো তবুও বাকি তিনটে অপরিহার্যরূপে এর সাথে যুক্ত।

সম্পদের প্রতি মানুষের আগ্রহ চিরন্তন। অল্প কিছু সংখ্যকের সন্ন্যাস-জীবনের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর সমস্ত জায়গার সব বয়সের মানুষের মাঝে একই ধরনের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুগত কিংবা অবস্তুগত জিনিস যাই বলি না কেন মানুষের আগ্রহ তার প্রতি সহজাত তথা চিরন্তন। কত সম্পদ একজনকে তৃপ্ত করতে পারে এর কোন সীমা নেই। দেখা গেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীও আরো সম্পদ সংগ্রহের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরছেন। পত্রিকায় দেখেছি, কিছুদিন আগে মাইক্রো সফ্‌টের কর্ণধার শ্রেষ্ঠতম ধনী বিল গেট্‌স্ বিভিন্ন দেশে ব্যবসায় আরো উন্নতির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনাহার তাড়িত এস্তোনিয়ার দু'টি শিশুকে রাসেল তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য অতঃপর তাদের কোন কিছুর অভাব ছিল না। তারপরও দেখা গেল তারা সুযোগ পেলেই পাশের ক্ষেতে যেত আলু চুরি করতে। রকফেলার বাল্যজীবনে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল যার দরুণ পরবর্তী সময়ে তার মাঝে এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষ শ্রেষ্ঠ হতে চায় জীবনের সমস্ত আঙ্গিকে। চিন্তায়-মননে-মগজে-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প— সমস্ত জায়গায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতা। অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তার মাঝ দিয়ে শীর্ষস্থান দখলের চেষ্টা যেন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অধিকারলিপ্সার সাথে সাথে মানুষ ছোটে যশের দিকে। যশের প্রতি ইচ্ছেও মানুষের সহজাত। ছোট শিশুরাও যদি দেখে তার প্রতি চারপাশের মানুষের মনোযোগ নেই তাহলে সে ক্ষুব্ধ হয়। এমনকি জীবদ্দশায় কোন স্বীকৃতি না পেলেও মানুষ মৃত্যু-পরবর্তীকালে স্বীকৃতির প্রত্যাশা করে। মৃত্যু পথযাত্রী একজন ইতালিও যুবরাজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সমগ্র জীবন নিয়ে তার অতৃপ্তি আছে কিনা। সে উত্তর দিয়েছিল 'আছে'। যুবরাজ বললেন, 'আমি একদিন সুউচ্চ অট্টালিকার টাওয়ারের ওপর রাজা ও পোপ উভয়কেই পেয়েছিলাম। আমি আজও অনুতাপ করি যদি তাঁদের দু'জনকেই ধাক্কা দিয়ে সেদিন ফেলে দিতাম তাহলে মানুষের সমগ্র ইতিহাসে আমার নাম লেখা থাকত।' যুবরাজের এই ইচ্ছে মানবাকাঙ্ক্ষার অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত। মানুষ যতবেশী আলোচিত হয় ততবেশী সে আনন্দিত হয়। কুখ্যাত ডাকাতকেও যদি পত্রিকাতে একজন চোর বলে আখ্যা দেয়া হয় তাহলে সে অপমানিত বোধ করে। তাজমহল তৈরীর পেছনে মোঘল সম্রাট শাজাহানের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন যতটা ছিল তার থেকেও বেশী ছিল সম্ভবত তার নিজের অমর হওয়ার বাসনা। তিনি এমন একটা স্থাপনা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন সভ্যতার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

যশের শেষে মানুষ চূড়ান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়ে ক্ষমতার দিকে। মানুষ যশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়েছে এমন উদাহরণ কম। যুক্তরাষ্ট্রে চিত্রতারকারা অত্যন্ত যশাধিকারী, তারপরেও 'কমিটি ফর আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিজ'-এর মতো অখ্যাত প্রতিষ্ঠানও তাদের খ্যাতি ম্লান করে দিতে পারে নিমিষে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির আছে অনেক সম্মান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য অনেকেই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে থাকবেন। কারণ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থেকে অনেক বেশী। ১৮১৪ সালে বুচার নেপোলিয়ানের

প্রাসাদগুলো দেখে নাকি বলেছিলেন এতকিছুর অধিকারী হওয়ার পরও যিনি মস্কো অভিযানে নেমেছিলেন তিনি কী না বোকা! প্রশ্ন হলো মানুষ এত বেশী পাওয়ার পরও কেন ক্ষমতানুরাগী হয়? ক্ষমতার উদগ্র বাসনা মানুষকে কেন আচ্ছাদন করে? রাসেলের ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে আমাদের চতুর্দিকের কিছু বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

তিন

ক. আমাদের দেশে সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে (৯ম জাতীয় সংসদ) মোট তিনশটি আসনের জন্য সর্বাধিক চার হাজার পাঁচশ ব্যক্তি মনোনয়ন-পত্র জমা দিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগে পত্র-পত্রিকায় দশ হাজারের মত মানুষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার ধারণা ইচ্ছা ব্যক্ত করেননি শুধু অব্যক্ত ইচ্ছা অবদমন করেছিলেন এমন মানুষের সংখ্যা লক্ষাধিকের কম হবে না। শুধু জাতীয় নির্বাচন নয়, স্কুলের অভিভাবক কমিটি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতা হওয়ার বাসনা অজস্র মানুষের।

খ. কিছু দিন আগে রাজধানীর একটা অভিজাত হোটেলে এক মোবাইল ফোন কোম্পানীর আকর্ষণীয় সিমকার্ডের নিলাম হচ্ছিল। নামমাত্র মূল্যের সেই সিমকার্ডের প্রতিযোগিতায় এক ভদ্র মহিলা চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত দর উঠালেন। উপস্থিত এক ভদ্রলোক পাঁচ লক্ষ টাকা দাম হাঁকিয়ে সেটা কিনে নিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ আর কী হতে পারে?

গ. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে অসংখ্য বাঙ্গালিকে হত্যা করেছিল, সম্ভ্রম নিয়েছিল অজস্র নারীর— তা সম্ভবত ইতিহাসের অন্যতম নগ্ন ক্ষমতার উদাহরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো কোনটা রাজনৈতিক, কোনটা অর্থনৈতিক আবার কোনটা বল প্রয়োগের মধ্যদিয়ে ক্ষমতা প্রকাশের দৃষ্টান্ত। আধুনিক মানুষ অবশ্য সবচেয়ে বেশী কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেছে জড় বস্তুর ওপর। পরমাণুর অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও তার ইলেকট্রনের গতি বিন্যাসের ওপর কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে এমন সব অভাবনীয় মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যার নিষ্ঠুরতা সর্বজনবিদিত। অবশ্য এ ধরনের ক্ষমতা এখানে বিচার্য নয়।

ক্ষমতার সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে, "ক্ষমতা এমন এক ধরনের সক্ষমতার নির্দেশ করে যার ফলে 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক ব্যক্তির উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যাতে করে 'খ' ব্যক্তিটি 'ক' ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে কাজ করে চলে।"[৫] এতে করে বোঝা যায় ক্ষমতা এক বিশেষ ধরনের শক্তি যা অন্যকে প্রভাবিত করে। প্রভাবিত ব্যক্তি যতটা প্রভাবকের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে ততটাই প্রভাবকের ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়। এ জন্য ক্ষমতার অন্যতম প্রাসঙ্গিকতা হলো নির্ভরতা। কর্মী বা জনতা যতটা নেতার ওপর নির্ভরশীল হয় ততটাই নেতা তার নিজের ক্ষমতার কথা ভেবে খুশী হয়। উদ্দিষ্ট ফলাফল প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী রাসেল। তাঁর কথায়— 'ক্ষমতাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা কোন উদ্দেশ্য সম্পাদনান্তে আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট ফলাফল যোগায়।'[৬] ক্ষমতা আসলে একটা পরিমাণগত ধারণা। ধরা যাক, দু'জন মানুষ একই ইচ্ছে পোষণ করল। এদের মধ্যে

একজন অন্যজন থেকে বেশী ইচ্ছে পূরণের সুযোগ পেল। সুতরাং, বলতে হবে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জন থেকে বেশী ক্ষমতাবান। আমরা যখন বলি, মি.রাসেল মি. ম্যূর থেকে বেশি ক্ষমতাবান তখন এটাই বোঝায় মি.রাসেল মি.ম্যূর থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল বেশী ভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা এখন লক্ষ্য করি ক্ষমতার নানা ধরনের বিন্যাস ও তার বিস্তৃতিকে রাসেল কেন ও কীভাবে ভাগ করেছেন।

চার

ক্ষমতার দিকগুলোকে ঐতিহাসিক বিচারে রাসেল মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো—১. যাজকীয় ক্ষমতা (Priestly power); ২. রাজকীয় ক্ষমতা (Kingly power); ৩. নির্যাতনমূলক ক্ষমতা (Naked power); ৪. বৈপ্লবিক ক্ষমতা (Revolutionary power) ও ৫. অর্থনৈতিক ক্ষমতা (Economic power)[৭]– যদিও রাসেল সে সময়ে অনুধাবন করেননি প্রযুক্তির ক্ষমতা কতটা প্রভাবশালী হতে পারে। তবে বর্তমানকালে উপর্যুক্ত ক্ষমতা অবশ্যই ক্ষমতার বিভাগগুলোর সাথে যুক্ত করতে হবে।

১. যাজকীয় ক্ষমতা: আধুনিককালে এ ধরনের ক্ষমতা বেশ খানিকটা বিলুপ্ত প্রায়। প্রাচীনকালে যাজকীয় ক্ষমতার আধিপত্য বেশী ছিল। তবে সভ্যসমাজে এর যে কোন দৃষ্টান্ত নেই এমন কথা বলা যাবে না। সিন্টো ধর্মে মিকাডো, মুসলমান খলিফারা বর্তমানের খ্রিস্টীয় সমাজের যাজকদের মতই শক্তিশালী ছিলেন। তবে যাজকীয় ক্ষমতার সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত হওয়ার আগে সমাজের ওঝা বা কবিরাজদের হাতে ছিল এ ক্ষমতা। নৃ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন এর দু'টো প্রাথমিক রূপ ছিল ধর্ম ও যাদুশিক্ষার মাঝে। ওঝারা নানারকম ছলছুতার আশ্রয় নিয়ে অসুস্থ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করত। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, যাদুটোনা দিয়ে মানুষকে বোকা বানাত। সাধারণ মানুষ এদের হাতে হয়ে পড়ত বন্দী। ইংল্যান্ডের ডিউক অব ইয়র্ক দ্বীপে এক সময় কবিরাজরা অসুস্থ মানুষদের শরীরের ওপর আজে-বাজে মন্ত্র উচ্চারণ করে রোগ মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিত। সে সময়ে এদের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। সভ্যতার অগ্রযাত্রার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশে যাজকীয় ক্ষমতা সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক হয়ে অতি শক্তিশালী এক বাস্তবতায় পরিণত হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে যাজকরা প্রাচীন ধারা থেকে পৃথক হয়ে রক্ষণশীল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাস থেকে দেখা গেছে এরা আবার বৈপ্লবিক ধর্ম-প্রণেতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রিষ্ট, প্রমুখ এসব বৈপ্লবিক ধর্মতাত্ত্বিকদের অন্যতম। তবে ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষমতা আবার অনেক ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক পট পরিবর্তনের পরও সমান ভাবে সক্রিয় থাকে। যেমন রাশিয়া ও তুরস্কে বিপ্লবের পরও রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। পঞ্চদশ শতকে বর্বরদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় চার্চের জয়লাভের পর ধর্মীয় ক্ষমতার পুনর্বহালটা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত।

২) রাজকীয় ক্ষমতা: রাজকীয় ক্ষমতার ইতিহাসও যাজকীয় ক্ষমতার মত প্রাক্-ঐতিহাসিক। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এই ধরনের ক্ষমতার নানারকম রূপ আজও পৃথিবীতে টিকে আছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও ভিন্ন ভাবে রাজার ক্ষমতা সক্রিয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের রাষ্ট্রক্ষমতায় রাজার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। তাছাড়া বহু বছর ধরে একদিক্রমে একই পরিবারের শাসন মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়া জাতিগুলো একজন বিশেষ মানুষের দিক নিদর্শনা প্রত্যাশা করত। তিনি তৈরী করতেন আইন, তৈরী হতো রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি। মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর প্রণীত নিয়মকানুনের মধ্যে ছিল বিচারিক আইন। তাকে সবাই সম্মান করত, অতি নমস্য মানুষ ভেবে শ্রদ্ধাবনত মানুষগুলো তাদের যুগ যুগ ধরে ক্ষমতায় দেখতে ভালবাসত।

৩) নির্যাতনমূলক ক্ষমতা: মানুষ অন্য ব্যক্তির ওপর যত ভাবেই কর্তৃত্ব করুক না কেন তন্মধ্যে সরাসরি বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যে ক্ষমতা প্রকাশ করে তা সত্যিকার অর্থে ভয়াবহ ও আতঙ্কের। রাষ্ট্রের সাথে তার অনুগত নাগরিকদের সম্পর্ক খুবই সৌহার্দ্যমূলক, কিন্তু একজন বিদ্রোহীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘোর শত্রুতামূলক। যারা বিদ্রোহী অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিয়ম কানুনকে যারা চ্যালেঞ্জ করে তাদেরকে সরাসরি শারীরিক আঘাত করতেও রাষ্ট্রের হাত কাঁপে না। একই ভাবে ধর্মীয় সংগঠনগুলো সমান আচরণ করে। ক্যাথলিকদের ওপর চার্চের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। কিন্তু যারা এদের কর্তৃত্ব মানে না তারা পড়ে যায় এদের ভয়ংকর রোষানলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে টেনে ছিঁড়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। সামরিক শক্তি দিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন- ব্যবস্থাকে আঘাত করার বহু উদাহরণ আমাদের চার পাশে আছে। আমরা পশুর ওপর যেভাবে বলপ্রয়োগ করি, রাজনীতিতে প্রায়শই এ ধরনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। শূকরকে টেনে হিঁচড়ে জাহাজে তোলা কিংবা গরুকে শক্তি দিয়ে গাড়িতে তোলার দৃশ্যের সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় বল প্রয়োগ করে বিরোধী দলের মানুষদের গাড়িতে তোলার দৃশ্যের খুব বেশী তফাৎ নেই। যে কর্মকর্তা তার অধস্তনদের মুহূর্তের মধ্যে চাকুরীচ্যুৎ করার শক্তি রাখেন কিংবা বেতন কর্তন করার অধিকারী হন তার প্রবৃত্তিকেও নগ্ন ক্ষমতার আওতায় দেখা যায়। প্লেটো তার রিপাবলিক গ্রন্থে থ্রেসিমেকাসের মুখ দিয়ে ন্যায় (Justice) সম্পর্কে যেটা বলিয়েছেন— 'ন্যায় হলো ঠিক বলবানের স্বার্থ'[৮]– যেটা বাস্তব-জীবনের প্রেক্ষাপটে উদ্বেগজনক।

৪) বৈপ্লবিক ক্ষমতা: গতানুগতিক ব্যবস্থা যখন মানুষকে আর সন্তুষ্ট করতে পারে না কিংবা রাষ্ট্র যখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন প্রয়োজন পড়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে যখন বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক কাঠামো উদ্ভূত পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে নতুন কাঠামো পুরোনোর স্থলাভিষিক্ত হয়। এ ঘটনাকে 'প্যারাডাইম সিফ্টিং' বলে। রাসেল ৪টি উদাহরণ টেনে বৈপ্লবিক ক্ষমতার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো— ক) প্রাথমিক খ্রিস্টধর্ম, খ) সংস্কার যুগ, গ) ফরাসি বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ এবং ঘ) সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও রাশিয়ার বিপ্লব ।

৫) **অর্থনৈতিক ক্ষমতা**: এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় অর্থনৈতিক ক্ষমতা যদিও সামরিক শক্তির মতো সরাসরি নয় তবু এতটাই প্রভাবশালী যে মানুষের প্রায় সমস্ত কর্মকাণ্ড এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মতামতকে নিজের পক্ষে নেওয়ার এ-এক মোক্ষম অস্ত্র। আধুনিককালে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ভিতকে কাজে লাগিয়ে বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মতামত তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। তাদেরকে বাধ্য করে ঐসব প্রতিষ্ঠানের তথাকথিত নীতি-আদর্শ মেনে চলতে। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দানের নামে বৃহৎ অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলো একের পর এক শর্ত চাপিয়ে নানা ভাবে ব্যস্ত করে তোলে। এটা যেমন রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য তেমনি যে-কোন ইউনিট, বিশেষ করে সামরিক ইউনিটের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে ক্রিয়াশীল। রাসেল মনে করেন একটা সামরিক ইউনিটের আর্থিক ভিত্তির ওপর কয়েকটা বিষয় নির্ভর করে। যেমন—

ক) নিজের ভূখণ্ডকে অন্যের হাত থেকে রক্ষা করা;

খ) অন্য রাষ্ট্রকে হুমকির মুখে ফেলা;

গ) খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য দক্ষতা অর্জন করা এবং

ঘ) সামরিক ইউনিটকে খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধা দান করা।

সামরিক শক্তির সাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতার একটা যোগ আছে। যেমন বর্তমানে যে-সব দেশ সামরিক শক্তিতে অনেক এগিয়ে, তাদের প্রথমেই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে জোরদার করতে হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, ফ্রান্স কিংবা রাশিয়া যে সামরিক শক্তি অর্জন করেছে তা গড়ে উঠেছে তাদের মজবুত আর্থিক ভিতের ওপর। দেখা গেছে যারা সামরিক শক্তি অর্জনের অব্যাহত চেষ্টা করে চলেছে তাদের বার্ষিক গড় আয়ের প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বরাদ্দ রাখতে হয়েছে সামরিক খাতে।

রাসেল অবশ্য সে সময় প্রাযুক্তিক ক্ষমতাকে বেশী একটা আমলে নেননি। কারণ সে-সময় এর উদ্ভাবন ও ব্যবহার সীমিত ছিল। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির, যার হাতে যত প্রযুক্তি সে তত বেশি ক্ষমতাবান। এ জন্য ক্ষমতার প্রাচীন রূপগুলোকে অতিক্রম করে প্রযুক্তি এতটাই বিস্তৃতি লাভ করেছে যে রাসেল কথিত ক্ষমতার নানান ধরনের সাথে এর সংমিশ্রণ মানুষের ক্ষমতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এ জন্যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলো তাদের সকল রকম ক্ষমতার সাথে প্রযুক্তি জুড়ে দিয়েছে। জে.আর.পি.ফ্রেঞ্চ ও বি. র‍্যাভেন তাঁদের *স্টাডিজ ইন সোস্যাল পাওয়ার*[৯] গ্রন্থে ক্ষমতার যে ৫টি বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন রাসেলের সাথে তার অনেকটাই মিল পাওয়া যায়। ফ্রেঞ্চ ও র‍্যাভেন ক্ষমতাকে দমনমূলক, পুরস্কার, বৈধ, দক্ষ ও আরোপণমূলক শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন কোন দল বা সংগঠন পরিচালনার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পদসোপান রক্ষা করা জরুরী। যেমন, সৈন্যবাহিনীর ঊর্ধতন কর্মকর্তা তার অধস্তনদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন; কলেজের অধ্যক্ষ, ব্যাংক পরিচালনা কমিটি, এমনকি বেসরকারী সংগঠন যেমন তার কর্মীদের সুষ্ঠুভাবে কাজে দেখতে চান। এ-

ছাড়া ফ্রেঞ্চ ও র‍্যাভেন প্রযুক্তিনির্ভর চিন্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কম্পিউটার প্রকৌশলী, শিল্পমনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি ব্যক্তিকে অত্যন্ত ক্ষমতাবান মনে করতেন। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের দক্ষতা সব থেকে বেশী প্রভাব রেখে চলেছে।

কার্ল মার্কস্ মনে করতেন মানুষের সমগ্র তাড়না পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু সম্পদ। অর্থনীতিকে তিনি সমাজের ভিত্তি হিসাবে মনে করতেন। এই ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন ও অন্যান্য মতাদর্শ। মার্কস্ বিশ্বাস করতেন ভিত্তি উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ জন্যে মার্কসের দর্শনকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ হিসেবে সমালোচনা করা হয়। মার্কসের এই ধরনের চিন্তাধারাকে রাসেল তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। রাসেল মনে করেন মার্কস্ মানুষের চূড়ান্ত কাম্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুত মানুষ সম্পদ প্রত্যাশা করে সম্পদের জন্যে নয় বরং সম্পদের মাধ্যমে অন্যকিছু পাওয়ার জন্যে। এই ভিন্ন কিছু হলো ক্ষমতা। বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে-সব মানুষ জীবনের চূড়ান্ত কাম্যের জায়গায় সম্পদকে বেছে নিয়েছেন তারা আসলে সম্পদ চাননি। বরং সম্পদের হাত ধরে তারা হতে চেয়েছেন যশোধিকারী। কেননা জীবন নির্বাহের জন্য সম্পদের প্রয়োজন আছে সত্য, তবে তা অসীম নয়। তাহলে কেন তারা সম্পদ চান? সম্পদ চান এ জন্যে যে, সম্পদ তাদেরকে অন্যের থেকে বেশী আর্থিক শক্তিশালী করে তোলে। মানুষের কাছে সমাদৃত হন অর্থের জন্য নয় বরং অর্থ দিয়ে যে ক্ষমতা পান তার জন্যে। ক্ষমতার ভয়াবহতা ব্যাপক। ক্ষমতা মানুষকে নির্দয় করে, করে তোলে হিংস্র। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে উপকরণ নিয়ে মানুষের মনস্তত্ত্বের একটা নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসেল।

রাসেল *পাওয়ার* গ্রন্থ লিখেছেন ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে। মানবতাবাদী এই দার্শনিক জীবনের শুরু থেকে একটা আদর্শিক ন্যায় ও সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। দর্শনের গভীর জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তত্ত্ববিদ্যার সাথে সাথে সমাজ, সভ্যতা, শান্তি ও বিশ্ব-সরকার নিয়ে ভেবেছেন নিরন্তর। ভয়মুক্ত, সংশয়হীন ও নিপীড়নবিহীন সমাজ গঠনের জন্যে নৈতিকতার প্রয়োজন অনুভব করেছেন দারুণভাবে। *পাওয়ার* গ্রন্থের পর নৈতিকতা বিষয়ক রাসেলের সর্বশেষ গ্রন্থ *হিউম্যান সোসাইটি ইন এথিক্স এণ্ড পলিটিক্স* প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। গ্রন্থটি তিনি লিখেছেন দু'টো উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে— এক. কুসংস্কারমুক্ত নৈতিকতা; দুই. সেই সংস্কারমুক্ত নৈতিকতাকে চলমান রাজনৈতিক সমস্যাবলী নিরসনে সফলভাবে প্রয়োগ করা।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার ওপর রাসেলের চিন্তা মনে করিয়ে দেয় প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের কথাকে। প্রাচীন গ্রীসীয় সমাজে প্লেটো যেমন ন্যায় ও সমতার ওপর জোর দিয়েছেন রাসেলও তেমনি লিখেছেন -

> অন্যান্য জায়গার মত রাজনীতিতে জ্ঞানীয় মানবতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই আবির্ভূত হয়েছে যে বৃহত্তর সংগঠনগুলো ব্যক্তির সুখ দুঃখেরই সমষ্টি এবং সেখানে বিশ্বের

> প্রতিটা মানুষের কষ্ট, মানবিক প্রজ্ঞা ও সামষ্টিক মানবতার দুর্দশারই প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রজ্ঞা কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। তরুণ সন্তানদের প্রতি পিতামাতার স্নেহের মতই মূর্ত বিষয়। মানুষের ধীশক্তি, আন্তরিকতা এই বিশ্বের জন্য বড় প্রয়োজন।[১০]

আমরা এখন দেখব একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কী কী শর্ত আবশ্যক যার ফলে আমরা কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রব্যবস্থা পেতে পারি।

পাঁচ

রাসেল *পাওয়ার* গ্রন্থের শেষে 'দ্যা টেমিং অব পাওয়ার' অধ্যায়ে তাঁর প্রস্তাবিত রাষ্ট্র কাঠামোর শর্তাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উক্ত অধ্যায় তিনি শুরু করেছেন একটা চীনা গল্প দিয়ে। দার্শনিক কনফুসিয়াস একদিন থাই পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি এক বিলাপরত নারীকে দেখতে পান। তার সঙ্গী জু-লু-নারীটির কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' সে উত্তর দেয়, 'এক সময় আমার শ্বশুরকে এই জায়গায় একটা হিংস্র বাঘ হত্যা করেছিল। এরপর আমার স্বামীকে একইভাবে হত্যা করেছে বাঘটি। এখন আমার ছেলেরও একইভাবে মৃত্যু হয়েছে সেই বাঘটির হাতে।' কনফুসিয়াস বললেন, 'আপনি তাহলে এ জায়গা ছাড়ছেন না কেন?' নারীটি উত্তর দিল, 'এখানে কোন অত্যাচারী সরকার নেই তো তাই।' কনফুসিয়াস শিষ্যদের তখন বললেন, 'মনে রাখবে অত্যাচারী সরকার হিংস্র বাঘ থেকেও ভয়ংকর।'[১১]

রাসেল নিশ্চিত হতে চেয়েছেন রাষ্ট্র বা সরকার যেন কিছুতেই হিংস্র বাঘের মত না হয়। ক্ষমতা মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। মানুষ ক্ষমতা পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ইতিহাস থেকে ক্ষমতাশীন ব্যক্তিদের মাঝে বিস্তর পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। সম্ভবত এটা যতটা সামাজিক তার থেকে অনেক বেশী মনস্তাত্ত্বিক। সুতরাং, যেটা মনস্তাত্ত্বিক তাকে নিষ্প্রভ অথবা নির্মূল করতে দরকার নৈতিকতা এবং সুশৃঙ্খল কাঠামো। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এ নিয়ে ভেবে আসছে। তাওবাদীরা মনে করতেন এটা সমাধান যোগ্য নয়, এজন্যে তারা নৈরাজ্যবাদকে সমর্থন করেছিলেন। প্লেটো, কনফুসিয়াস প্রমুখ এর সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন। তাঁরা ভাবতেন প্রাজ্ঞ মানুষের শাসনের মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে সংহত করতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে এ কাজের ফলাফল খোঁজ করা হচ্ছে। রাসেল এর সমাধানকল্পে চারটি শর্ত আরোপ করার কথা বলেছেন। এগুলো হলো– ক) রাজনৈতিক শর্ত, খ) অর্থনৈতিক শর্ত, গ) প্রচারমূলক শর্ত এবং ঘ) মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক শর্ত।

ক) রাজনৈতিক শর্ত: রাসেল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কিছু ত্রুটি উল্লেখ করেন। গণতন্ত্রে যদিও সর্বাধিক মানুষের স্বার্থ নিশ্চিত হয় তবু এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। জনসংখ্যার বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠরা শাসনের দায়ভার গ্রহণ করলেও বিপুল মানুষের সেখানে প্রতিনিধিত্ব থাকে না। সংখ্যালঘিষ্ঠরা এতে করে বঞ্চিত হয়। তিনি বলেছেন, 'গণতন্ত্র যদিও অত্যন্ত

কার্যকরী ধারা তবুও ক্ষমতা শিথিলকরণের একমাত্র শর্ত নয়।'[১২] তিনি বলেন, ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকার পরও আইরিশদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। এ জন্যে গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। তাদের রক্ষার জন্য ভৌগোলিক ও সাংগঠনিক কাঠামোকে পৃথক করা প্রয়োজন। তিনি ক্ষমতার পৃথকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র একক গুলোকে শক্তিশালী করার পক্ষে মত দেন। এতে করে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে একক ব্যক্তির হাতে যাতে না যায় সেটা নিশ্চিত হবে। বর্তমানের সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভাগাভাগির যে তাত্ত্বিক ব্যবস্থা আছে রাসেলের প্রচেষ্টা হয়ত এর কাছাকাছি। তবে এটা ঠিক এ ধরনের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে সকল মানুষের স্বার্থ যে নিশ্চিত হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। বিশ্বের কোন দেশের মানুষই বলতে পারবে না যতক্ষণ না শাসকের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে ততক্ষণ কোন সুস্থ সমাজ গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র বিষয়টি তাত্ত্বিক নয়। অনেকটাই ব্যবহারিক যেটা অনুশীলনের ব্যাপার। এ জন্যে রাজনৈতিক শর্তের সাথে শাসকের মনোভাব যুক্ত করলে রাসেল ভাল করতেন।

খ) অর্থনৈতিক শর্ত: রাষ্ট্রের আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসেল সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার সমন্বয়ের প্রস্তাব করেন। তিনি মনে করেন অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি থাকবে রাষ্ট্রের হাতে এবং ঐ রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক। প্রাচীন গণতন্ত্র এবং নব্য মার্কসবাদ– এ দু'টোই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ প্রাচীন গণতন্ত্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক আর মার্কস্‌বাদ শুধু অর্থনৈতিক। শ্রমজীবীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করলে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। তাই বলে শ্রম স্বার্থের বিবেচনায় ব্যক্তিক স্বাধীনতা ছাড় দেয়া ঠিক নয়। পুঁজির ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। সম্পদের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে, অন্যথায় সে সমাজ কল্যাণমুখী হতে পারে না।

গ) প্রচারমূলক শর্ত: রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষ যাতে অবাধে তাদের মতামত রাখতে পারে সেটা নিশ্চিত করা জরুরি। এ জন্যে প্রচলিত স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অবাধ সুযোগ দেয়া দরকার। জনগণের সমস্ত দাবিদাওয়া, অভাব-অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকতে হবে। সরকার যেন ভয়ভীতি ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠরোধ না করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। একজন পুরুষ থেকে একজন নারী শ্রমিক কম মজুরি পেলে সে যেন বাধাহীন ভাবে তা জানতে পারে এমন স্বাধীনতা থাকা জরুরী। সর্বোপরি সহনশীলতা, ধৈর্য ও উদার মনোভাব ক্ষমতার তীব্রতাকে অনেকাংশে শিথিল কিংবা করতে পারে।

ঘ) মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক শর্ত: রাসেলের মতে, মনস্তাত্ত্বিক শর্তটা ক্ষমতা শিথিলকরণের জন্য বেশ জটিল ব্যাপার। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি ক্ষমতার মনস্তত্ত্ব কীভাবে মানুষকে ভয়, হিংসা ও উত্তেজনার দিকে নিয়ে যায়। ফলে মানুষ অন্ধ হয়ে ওঠে। এ জন্যে গণতন্ত্রকে

যদি সংহত করতে হয় তাহলে গণমানুষের লাগামহীন উত্তেজনা অবদমন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যুদ্ধ স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত নিদর্শন। যুদ্ধকে চিরতরে বিদায় জানাতে হবে। কারণ যুদ্ধ মানবতার ঘাতক। যুদ্ধাতঙ্ক থেকে মানুষ মুক্ত হলে ক্ষমতাসীনদের নৃশংসতাকে অনেকাংশে বিদায় জানানো সম্ভব হবে এটা গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত।

ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের শর্তাবলী

শর্ত	কার্যাবলী
রাজনৈতিক	ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ভৌগোলিক ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষা।
অর্থনৈতিক	সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সুসমন্বয়, অর্থনৈতিক ক্ষমতায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত পুঁজির বিলোপ, শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষা।
প্রচারমূলক	মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা, সহনশীলতা, ধৈর্য ও উদারতা।
মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক	জনমন থেকে ভয় ও ধ্বংসাত্মক আতঙ্ক দূর করা, মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দান, কুসংস্কারমুক্ত সমাজ তৈরি।

পরিশেষে বলা যায়, রাসেলের ক্ষমতা সংক্রান্ত আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থাকতো যদি না তিনি রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে কথা বলতেন। এ বিষয়ে তিনি একটি সামগ্রিক নির্দেশনা দিয়েছেন— অধিকন্তু সামগ্রিকভাবে একটা আদর্শিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন। রাসেল একদিকে ব্যক্তিমানুষ, অন্যদিকে রাষ্ট্র — এ দুয়ের সামষ্টিক মেল বন্ধনের কথা জানিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য-

> রাজনৈতিক আদর্শ অবশ্যই ব্যক্তি-জীবনের আদর্শের ওপর নির্ভরশীল। রাজনীতির উদ্দেশ্য ব্যক্তি-জীবনকে যতদূর পারা যায় সুন্দর করে তোলা। পৃথিবীতে বসবাসরত নারী, পুরুষ, শিশুদের মঙ্গলের বাইরে রাজনীতিবিদদের চিন্তা করার অন্য কোন অবকাশ নেই।[১৩]

ব্যক্তিজীবনের উন্নয়নই রাজনীতির মূল লক্ষ্য। আর সেটা যদি সত্যিকার অর্থে মানব কল্যাণমুখী হয় তাহলেই রাজনীতি সার্থক হয়ে উঠবে।

তথ্যনির্দেশ

1. Bertrand Russell, *Human Society in Ethics and Politics,* Routledge, 1992, p.15
2. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
3. রাসেল ১৯৫৪ সালে এই প্রবন্ধটি নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালে নোবেল কমিটির সামনে পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধটি তাঁর উপর্যুক্ত গ্রন্থের একটি অধ্যায়। পৃ. ১৬১
4. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬১

5. Stephen P. Robbings, *Organisational Behaviour*, Prentice, New Delhi, p. 352
6. Bertrand Russell, *Power : A New Socical Analysis ,* Routledge, 1992, p. 25
7. প্রাগুক্ত, রাসেল Power গ্রন্থে এই বিভাগগুলো বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।
8. Plato, *Republic* (translation), Francis Macdonald Cornford, Oxford, 1941, p.29
9. B. Raven J.R.P. French, *Studies in Social Power* [D. Cartwright (ed.)] University of Michigan, Institute for social Research, p.150
10. Bertrand Russell, প্রাগুক্ত, p.234
11. Bertrand Russell, প্রাগুক্ত, p.186
12. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
13. Bertrand Russell, *Political Ideals*, Unwin paper backs, p.9

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশের একটি গ্রাম: প্রসঙ্গ জাতিবর্ণ ব্যবস্থা

শিপ্রা সরকার*

সারসংক্ষেপ

হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অনেক সমাজ-নৃবিজ্ঞানী ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারায় একটি অনন্য পদ্ধতি হিসেবে স্বীকার করেছেন। বংশ-পরিচয়গত স্তরায়ণ অতিক্রম করা ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় সম্ভব নয় বললেই চলে। তবু বর্তমান সময়ে এসে জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় নানামাত্রিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বর্তমানে কীভাবে কাজ করছে, সে-বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজ-নৃবিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত। জাতিবর্ণের দৃঢ় বন্ধন ভারতীয় সমাজে নিয়ে এসেছে শান্তি, সংহতি, শৃঙ্খলা; আবার একই সঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও নানামাত্রিক অসমতা। কেবল ভারতীয় সমাজ-নৃবিজ্ঞানীরাই নন, পাশ্চাত্যেরও বহু সামাজিক-নৃবিজ্ঞানী জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮-১৮৫৭) ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে সামাজিক সংহতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্তব্য করেছেন।

দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ভারতীয় সনাতন জাতিবর্ণ ব্যবস্থা নানা কারণে এখন পরিবর্তনের মুখে পড়েছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হলেও, ক্রমে সেখানে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বর্ণের মাঝে সামাজিক মর্যাদায় আরোহণ কিংবা অবরোহণসূচক সচলতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কালস্রোতে হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যগত জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় নানামাত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। একালে জাতিভেদ প্রথা বিশেষভাবে হীনবল হয়ে পড়েছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে-সব কারণ বা উপাদান বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, তা হলো- নগরায়ণ, শিল্পায়ন, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থা, আধুনিক আইন ব্যবস্থা প্রভৃতি। এইসব প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় বহুবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। তবে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে সনাতন বর্ণপ্রথার মূল প্রবণতা এখনও ক্রিয়াশীল। সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদার ওপর উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গের

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

অধিকার এখনও কম-বেশি অব্যাহত আছে। বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটলেও জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু, পারলৌকিক কর্ম, অধ্যাত্মসাধনা- ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য এখনও পরিলক্ষিত হয়। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বর্তমানে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে কীভাবে ক্রিয়াশীল আছে, তা সমীক্ষার জন্য আমরা চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামে জরিপ কার্য পরিচালনা করেছি। লক্ষ্য করা গেছে যে, কদলপুর গ্রামের হিন্দু সমাজে আধুনিক সময়ের হাওয়া লাগলেও, এখনো নানাভাবে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রধান প্রধান প্রবণতা সেখানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা এ সময়ের হিন্দু জনগোষ্ঠীর চেতনায় সমানভাবে বহমান। এমন-কি হিন্দু সমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাবে মুসলিম সমাজেও খান্দান-অখান্দান, আশরাফ-আতরাফ শ্রেণিভেদ অদৃশ্যভাবে কাজ করে যাচ্ছে কদলপুর গ্রামে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বিষয়ে অংশগ্রণমূলক জরিপের আলোকেই উক্ত গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য নিচে উপস্থাপিত হয়েছে।

কদলপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক পরিচিতি

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানায় অবস্থিত কদলপুর একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তরদিকে অবস্থিত কদলপুর গ্রাম একটি প্রাচীন জনপদ। চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কপথে রাউজান উপজেলা শহর থেকে ৫ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর দিকে কদলপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি ৩৫৫ একর বা আধ বর্গমাইলের কিছুটা বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। সড়ক যোগাযোগই গ্রামটির একমাত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা। জলপথে এ গ্রামে পৌঁছার কোনো ব্যবস্থা নেই। এক সময় খালের মাধ্যমে জলপথের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু বর্তমানে খালগুলো ভরাট হয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

যতদূর জানা যায়, দেশ-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কদলপুর গ্রামের নাম ছিল রায়চাঁদ পাড়া। পুরোনো পরচা এবং নথিপত্রে এখনো রায়চাঁদ পাড়ার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৯৪৭-উত্তর কালে রায়চাঁদ পাড়ার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কদলপুর। রায়চাঁদ পাড়ার নাম কেন পরিবর্তন করা হলো, পরিবর্তনের উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া হলো- এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা সকল উৎসে অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারি দপ্তরে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে কোনো কাগজপত্রই পাওয়া যায় নি। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে প্রকৃত কোনো তথ্য আমাকে জানাতে পারেন নি।

কদলপুর আকারে ছোট একটি গ্রাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আকারে ছোট হলেও এই গ্রামের নামানুসারেই কদলপুর ইউনিয়নের নামকরণ হয়েছে। কদলপুর ইউনিয়ন অনেক বড়, কিন্তু কদলপুর গ্রাম খুবই ছোট। ছোট একটি গ্রামের নামে ইউনিয়নের নাম রাখা হলো কেন, এ প্রশ্নের জবাবে ৩ নম্বর কদলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন জানিয়েছেন যে, ইউনিয়নের কেন্দ্রে কদলপুর গ্রাম অবস্থিত বলেই হয়তো এমন নামকরণ হয়েছে।[১] কদলপুর গ্রামের উত্তরে খলিলাবাদ গ্রাম, পূর্বে রমজান আলী হাট,

পশ্চিমে উত্তর-গুজরা এবং দক্ষিণে আন্ধারমানিক ও পূর্ব-গুজরা গ্রাম অবস্থিত। নিচে কদলপুর গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হলো-

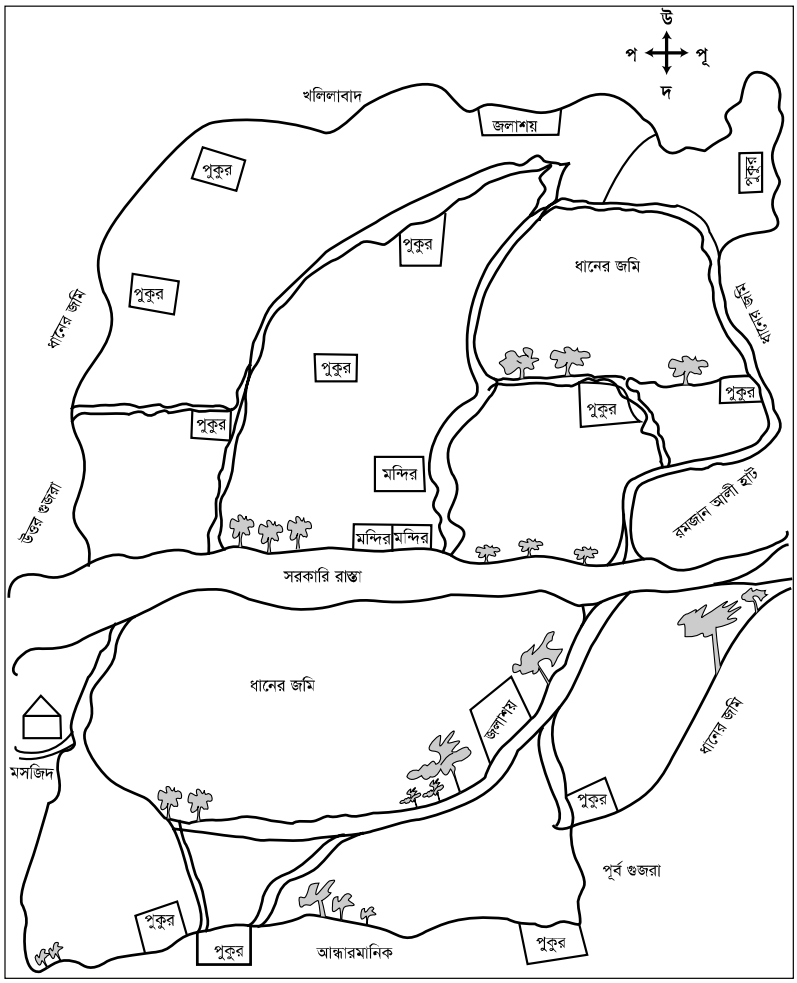

সারণি-১ : কদলপুর গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান

১৬ ফুট চওড়া সরকারি রাস্তা কদলপুর গ্রামকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। রাস্তার পাশেই আছে সরু খাল। এক সময় এই খাল বেশ বড় এবং স্রোতময় ছিল। কিন্তু এখন ভরাট হয়ে গেছে; কোথাও কোথাও বাঁধ দিয়ে খালের অস্তিত্বই বিপন্ন করা হয়েছে। অতীতে খালটি

কাগতিয়া খাল নামে পরিচিত ছিল। এখনও সরকারি কাগজপত্র ও পরচায় নামেমাত্র কাগতিয়া খালের অস্তিত্ব টিকে আছে, বাস্তবে খালটি নেই বললেই চলে।

কদলপুর গ্রামে ফসলের জমির পরিমাণ খুবই কম। ফলে এ গ্রামের মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বা অন্য কোনো পেশার সঙ্গে জড়িত। কৃষি-আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করে এমন মানুষের সংখ্যা এ গ্রামে অতি স্বল্প। সরকারি রাস্তাটিই গ্রামের যোগাযোগের প্রধান উৎস। তবে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে অনেক ছোট রাস্তা আছে। বর্ষাকালে অধিকাংশ রাস্তাই কর্দমাক্ত থাকায় তখন চলাচল করা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সরকারি রাস্তাটির কিছু অংশে সম্প্রতি ইট বিছানো হয়েছে। শুকনো মৌসুমে রাস্তায় সাইকেল, রিক্সা ও ভ্যান মাঝে মাঝে চলাচল করে, কখনো কখনো জীপ বা গাড়িও এপথে চলাচল করে। বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মতো কদলপুর গ্রামেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে, পরিবর্তন ঘটছে জীবনযাত্রার নানা প্রান্তে। এখন এ গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই স্যাটেলাইট টিভির সংযোগ দেখা যায়।

সরকারি রাস্তায় একটি বড় ব্রিজ কদলপুর গ্রামকে উত্তর-গুজরার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। ব্রিজটি তৈরি হয়েছে বড় খালের ওপর। এছাড়া মূল রাস্তা থেকে বিভিন্ন পাড়ায় যেতে ছোট ছোট খালের ওপর বাঁশের তৈরি সাঁকো ব্যবহৃত হয়। কদলপুর গ্রামে ছোট-বড় মিলে ১৩টি পুকুর বা জলাশয় আছে। এসব জলাশয় গ্রামবাসীদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহৃত হয়। অতীতে এসব জলাশয় থেকেই গ্রামবাসী জল সংগ্রহ করতো রান্না ও পানের জন্য। তবে বর্তমানে অধিবাসীরা টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করে। অতীতে খাল ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। এখন তেমন মাছ পাওয়া যায় না। চারটি জলাশয়ে মাছের চাষ করা হয়। মাছের চাষ জনপ্রিয় হলেও পুকুর বা জলাশয়ের অভাবে আগ্রহ থাকলেও অনেকে এ-কাজে অগ্রসর হতে পারছে না।

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, কদলপুর গ্রামে ফসলি জমির পরিমাণ খুবই কম। যে-কয়টি পরিবার জমির মালিক, তারা জমিতে আউশ ও আমন ধান উৎপাদন করে। অনেক গৃহস্থই বাড়ির উঠানে বা ঘরের চারদিকে তরি-তরকারি উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

কদলপুর গ্রাম প্রধানত নিচু-ভূমি (low-lying area)। ফলে গ্রামে মানুষের বসবাস তুলনামূলকভাবে বেশ কম। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ মিলে কদলপুর গ্রামে মোট ৯০টি পরিবার বাস করে। বর্তমানে গ্রামের জনসংখ্যা মোট ৪৬৫ জন। এর মধ্যে হিন্দু ৪১৫ জন, মুসলিম ৪১ জন এবং বৌদ্ধ ৯ জন। হিন্দু পরিবারের সংখ্যা ৮১টি, মুসলিম ৭টি এবং বৌদ্ধ ২টি। অপর পৃষ্ঠায় সারণিতে কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য উপস্থাপিত হলো-

ধর্ম	মোট গৃহস্থ	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দু	৮১	৪১৫	৮৯.২৫%
মুসলিম	০৭	৪১	৮.৮২%
বৌদ্ধ	০২	০৯	১.৯৪%

সারণি-২: কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিচিতি

কদলপুর গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় যে চতুর্বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) কথা পাওয়া যায়, কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা তার অনুরূপ নয়। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বলতে কোনো বর্ণই এখানে নেই। কদলপুরের বর্ণ-ব্যবস্থায় আমরা তিনটি বর্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। উচ্চ-বর্ণ, নিম্ন-বর্ণ এবং নমশূদ্র- এই তিন বর্ণে এ-গ্রামের হিন্দু অধিবাসীরা বিভক্ত। উচ্চ-বর্ণের মধ্যে আবার আছে দুটো মর্যাদা-স্তর- ১. ব্রাহ্মণ, ২. অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ। উচ্চ-বর্ণের মধ্যে মর্যাদার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণদের অবস্থান উচ্চে, তারপর আছে অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দু। ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার যে কঠোরতার কথা জানা যায়, কদলপুর গ্রামে সে-কঠোরতা আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েনি।

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, কদলপুর গ্রামে তিন বর্ণের লোক মিলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মোট জনসংখ্যা ৪১৫ জন। নিচের সারণিতে কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বর্ণের মানুষের অবস্থান প্রদত্ত হলো-

বর্ণ	গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
উচ্চ-বর্ণ	২৯	১৪৩	৩৪.৪৪%
নিম্ন-বর্ণ	৪৪	২২০	৫৩.০১%
নমশূদ্র	০৮	৫২	১২.৫৩%

সারণি- ৩ : কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর বর্ণগত তথ্য

কদলপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ আছে মোট চার পরিবার। ব্রাহ্মণরা সামাজিক মর্যাদার শীর্ষে থাকলেও কদলপুর গ্রামের সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আছে চৌধুরী, সরকার, দত্ত, দে এবং তালুকদার পদবিধারী মানুষ। কদলপুর গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন পদবিধারী হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাস করে। ছোট সরু রাস্তা দিয়ে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়া বিভক্ত। লক্ষণীয় যে প্রতি পাড়াতেই রয়েছে কমপক্ষে একটি বড় পুকুর বা জলাশয়। নির্দিষ্ট জলাশয়ের জল ওই পাড়ার মানুষেরা ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে দে পাড়ার জলাশয়টির কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। আকারে এটিই সবচেয়ে বড় এবং গ্রামের বিভিন্ন ধর্মীয় কৃত্যের জল ওই জলাশয় থেকে সংগ্রহ করা হয়। দুর্গাপূজার

শেষে দেবী দুর্গার প্রতিমাও এই পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। নিচের সারণিতে কদলপুর গ্রামের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য দেখানো হলো-

পদবী	মোট গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
সরকার	১২	৫৭	৪৬.৭২%
চৌধুরী	০৪	২০	১৬.৩৯%
দত্ত	০২	১০	৮.২০%
দে	০৪	২১	১৭.২১%
তালুকদার	০৩	১৪	১১.৪৮%

সারণি-৪ : অ-ব্রাহ্মণ উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

সংখ্যার দিক থেকে কদলপুর গ্রামে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশি। কদলপুর গ্রামে মোট ৪৪টি পরিবার নিম্ন-বর্ণভুক্ত। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আছে দাস, ভূঁইমালী, প্রামাণিক (নাপিত), রজকদাস (ধোপা) এবং বণিক পদবিধারী মানুষ। এটা খুবই কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা গ্রামের নানা পাড়ায় ছড়িয়ে থাকলেও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণে এক পাড়ায় ঘনীভূত হয়ে বসবাস করছে। গ্রামের অন্য পাড়ার তুলনায় এখানে জনবসতির ঘনত্ব অনেক বেশি। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের প্রায় সবাই অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল। দুর্দশা-দুর্গতির মধ্য দিয়ে তারা জীবন নির্বাহ করে। নিচের তালিকা থেকে কদলপুর গ্রামের নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য পাওয়া যাবে-

পদবী	গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
দাস	২৭	১৩১	৫৯.৫৫%
ভূঁইমালী	০৭	৩৭	১৬.৮২%
প্রামাণিক	০২	১২	৫.৪৫%
রজকদাস	০১	৬	২.৭৩%
বণিক	০৭	৩৪	১৫.৪৫%

সারণি-৫: নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

কদলপুর গ্রামের নমশূদ্র পাড়া গ্রামের পূর্ব-উত্তরপূর্ব কোণে একেবারে প্রান্তে অবস্থিত। সরকারি রাস্তা থেকে নমশূদ্র পাড়া অনেক দূরে অবস্থিত বলে সেখানে যাতায়াত করা আজকের দিনেও বেশ কষ্টসাধ্য। বিশেষ করে বর্ষাকালে নমশূদ্র পাড়ায় যাতায়াত রীতিমতো

দুঃসাধ্য। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতো নমশূদ্ররাও এ-গ্রামে একস্থানে ঘনীভূত হয়ে বসবাস করছে; ফলে এ-পাড়ায় লোকবসতির ঘনত্ব খুব বেশি। এ গ্রামে মাত্র ৮ ঘর নমশূদ্র বাস করে। ৮ ঘরের মধ্যে ৩ ঘরে বাড়ুই এবং ৫ ঘরে মণ্ডল পদবিধারী মানুষ বাস করে। বাড়ুইরা পানের বরজে কাজ করে, আর মণ্ডলরা মৎস্য শিকার ও দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। নিচে কদলপুর গ্রামের নমশূদ্রদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য দেওয়া হলো—

পদবী	গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
বাড়ুই	৩	২০	৩৮.৪৭%
মণ্ডল	৫	৩২	৬১.৫৩%

সারণি- ৬: নমশূদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় যেভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠী বিন্যস্ত হয়ে বসবাস করছে, তা-ও জাতিবর্ণের ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়। দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিশেষ বিশেষ পাড়ায় বাস করছে, নিম্নবর্ণের হিন্দু বা নমশূদ্রদের পাড়া একেবারে গ্রাম-প্রান্তে। মুসলিমদের পাড়াও গ্রামের অপর প্রান্তে। লক্ষণীয়, উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের পাড়ায় কোনো নিম্ন-বর্ণ কিংবা নমশূদ্র বাস করে না, কিংবা নিম্নবর্ণের হিন্দু অথবা নমশূদ্র পাড়ায় উচ্চ-বর্ণের কেউ বাস করে না। বর্ণজাত সামাজিক দূরত্ব এবং বৈষম্যের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সময় এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় যায়-মিলেমিশে কাজ করে। তবে, ধর্মীয় কৃত্য পালনের সময় তাদের মাঝেই প্রবল হয়ে ওঠে বর্ণপ্রথার রীতি ও সংস্কার।

কদলপুর গ্রামে কাছাকাছি তিনটি মন্দির রয়েছে। হিন্দুদের যাবতীয় ধর্মীয় কৃত্য এই তিনটি মন্দিরকে ঘিরেই আবর্তিত। মন্দিরে উচ্চ-বর্ণ ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা পূজা দেয়। নমশূদ্ররা পূজা দেখতে আসে; তবে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুপাড়া কিংবা নমশূদ্র পাড়ায় স্থায়ী কোনো মন্দির নেই। পূজা-পার্বণের জন্য নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা উচ্চ-বর্ণের সরকার পাড়ার মন্দিরে যায়। সরকার পাড়ায় যে তিনটি মন্দির রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে শ্রীসুরেন্দ্রবিজয় সরকারের বাটিস্থ মাতৃ-মণ্ডপ। এখানে প্রতিবছর দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পাড়া সংলগ্ন সরকারি রাস্তার পাশেই সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে দু'টি মন্দির- মগধেশ্বরী মন্দির এবং বটেশ্বর ত্রিমূর্তি মন্দির। মন্দির দুটি রাস্তার পার্শ্বে পাশাপাশি অবস্থিত। মগধেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ মেলা বসে। এসময় সমগ্র গ্রাম উৎসব-আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।[২]

কদলপুর গ্রামে মোট ৭টি মুসলিম পরিবার আছে। গ্রামের মোট জনসংখ্যার হিসেবে শতকরা ৮.৮২% মুসলিম। সাত পরিবার মুসলিমের মধ্যে দু'টি পরিবার অভিজাত বা খান্দান মর্যাদার, বাকি পাঁচ পরিবার নিম্নস্তরের তথা দিনমজুর। নিম্নস্তরের দিনমজুর মুসলিমদের গ্রামে 'গৃহস্থ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুরূপ জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রচলন নেই। তবে পাশাপাশি অবস্থানের কারণে হিন্দুদের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার নানামাত্রিক প্রভাব পড়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর। খান্দানী এবং গৃহস্থ মুসলিম এই নামকরণের মাঝেই লুকিয়ে আছে হিন্দু জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব।[৩] তবে মুসলিমদের সামাজিক দূরত্বের বা বৈষম্যের ভিত্তি ভিন্ন।

কদলপুর গ্রামের মুসলিম পাড়ায় দুই বংশমর্যাদার লোক বাস করে। অভিজাতরা কাজী পদবীতে পরিচিত; অন্যদিকে, গৃহস্থ দিনমজুর বা কামলারা মোল্লা পদবীধারী। মুসলিম সমাজে দুই বংশমর্যাদার মোট ৪১জন মানুষ বাস করে কদলপুর গ্রামে। মর্যাদাগত বিভাজনে আলোচ্য গ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়-

বংশ	গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
কাজী	০২	১১	২৬.৮৩%
মোল্লা	০৫	৩০	৭৩.১৭%

সারণি -৭ : মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

কদলপুর গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মুসলিম পাড়া অবস্থিত। মুসলিম পাড়ার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি বড় জলাশয় আছে। সাত পরিবারের মানুষ নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে এই জলাশয়ের পানি ব্যবহার করে। গ্রামের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম পাড়া ঘেঁষে রয়েছে একটি ছোট মসজিদ। এ মসজিদেই মুসলিমরা নামাজ আদায় করে থাকেন।

কদলপুর গ্রামে ২টি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পরিবার বাস করে। দুই পরিবারে মানুষ রয়েছে ৯ জন, যা গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১.৯৪ ভাগ। বৌদ্ধদের মাঝে হিন্দুধর্মের অনুরূপ বর্ণ-বিন্যাস ও স্তর-বিভাজন নেই, মুসলিম সমাজের মতোও নেই বর্ণ ব্যবস্থার অপ্রকাশ্য প্রভাব। মূলত ফসলি জমির আয়ের ওপরেই নির্ভরশীল এই বৌদ্ধ পরিবারদ্বয়। গ্রামের অন্য মানুষের সঙ্গে যেমন, তেমনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কদলপুর গ্রামের বৌদ্ধ পরিবারদ্বয়ের রয়েছে নিবিড় সখ্য। নিচে কদলপুর গ্রামের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অবস্থান দেখানো হলো-

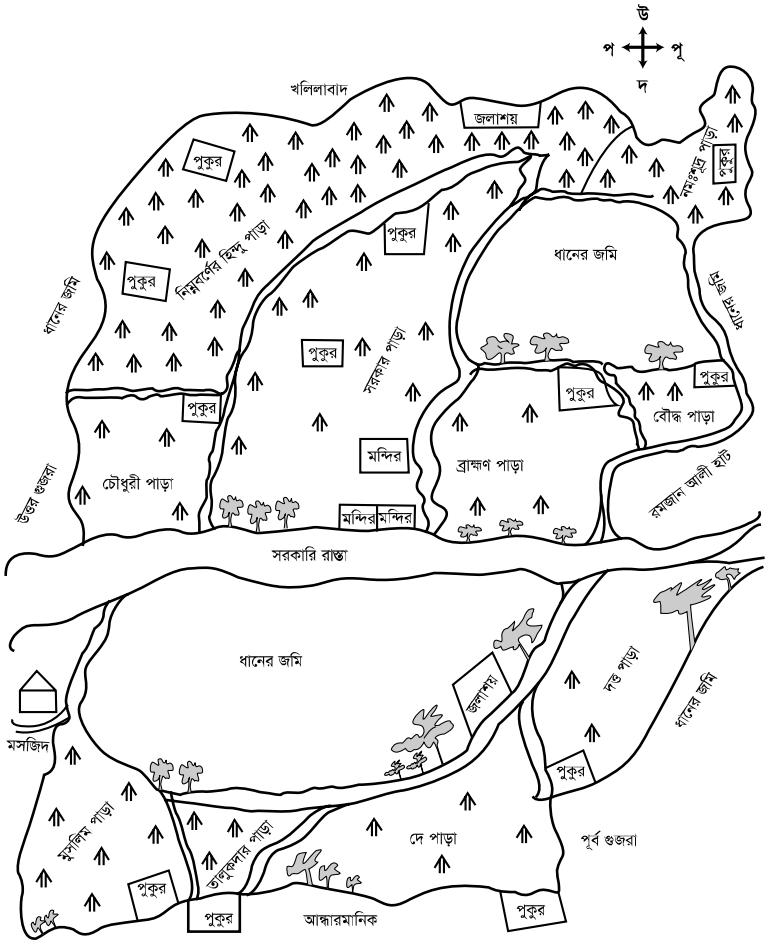

সারণি-৮ : কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া

তথ্যসংগ্রহ কালে আমরা খুবই আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে চমৎকার সম্প্রীতি বিরাজ করছে। পরস্পর পরস্পরের ধর্মাচরণের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিপ্রবণ। সরকার পাড়ার শ্রীসুরেন্দ্রবিজয় সরকার বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপে দুর্গা পূজার সময় সমগ্র গ্রাম যেন একাত্ম হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ঈদ বা বৌদ্ধ পূর্ণিমার সময়ও দেখা যায় সকল ধর্মাবলম্বীর মানুষই আনন্দে উদ্বেলিত। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এই সম্প্রীতি কদলপুর গ্রামের সামাজিক চারিত্র্যের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে উল্লেখ করতে হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রবিজয় সরকার-বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপকে কেন্দ্র করে কদলপুর তরুণ সঙ্ঘ নামে একটি যুবকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। গ্রামের নানা কর্মকাণ্ডে এই সঙ্ঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিয়ে, পূজা, শ্রাদ্ধ, কিংবা ঈদ উদযাপন- এসব উৎসবে অধিক সংখ্যক মানুষ নিমন্ত্রিত হলে তরুণ সঙ্ঘের সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও এই সঙ্ঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঙ্ঘের মালিকানায় হাঁড়ি-পাতিল-বালতি ইত্যাদি সামগ্রী রয়েছে, রয়েছে অস্থায়ী ছাউনি দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ। বিয়ে বা এ-জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সদস্যরাই মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকলেও, কদলপুর তরুণ সঙ্ঘের মধ্যে তার কোনো প্রভাব নেই। নিচে কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার জনসংখ্যার চিত্র উপস্থাপিত হলো-

পাড়া	গৃহস্থ	মোট জনসংখ্যা
ব্রাহ্মণপাড়া	০৪	২১
সরকার পাড়া	১২	৫৭
চৌধুরী পাড়া	০৪	২০
দত্ত পাড়া	০২	১০
দে পাড়া	০৪	২১
তালুকদার পাড়া	০৩	১৪
নিম্নবর্ণের হিন্দু পাড়া	৪৪	২২০
নমশূদ্র পাড়া	০৮	৫২
মুসলিম পাড়া	০৭	৪১
বৌদ্ধ পাড়া	০২	০৯
মোট ৯০টি পরিবার		মোট জনসংখ্যা ৪৬৫

সারণি-৯: কদলপুর গ্রামের পাড়াভিত্তিক গৃহস্থ ও জনসংখ্যার তথ্য

কদলপুর গ্রামে কোনো দোকান বা বাজার নেই। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পার্শ্ববর্তী রমজান আলী হাট থেকে ক্রয় করে এ- গ্রামের মানুষ। পায়ে হেঁটেই তারা হাটে আসা-যাওয়া করে। রমজান আলী হাট সপ্তাহে দুই দিন বসে- বৃহস্পতিবার ও সোমবার। তবে সপ্তাহের অন্য দিনেও দোকানপাট খোলা থাকে। ভারী জিনিসপত্র গ্রামবাসীরা ভ্যানে বহন করে। হালকা পণ্য তারা নিজেরাই হাতে বহন করে। গ্রামে মাঝে মধ্যে ফেরিওয়ালারা আসে নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে।

জমির মালিকানা	পরিমাণ	গৃহস্থ
জমির মালিক	৫ বিঘা বা তদূর্ধ্ব	০৭
জমির মালিক	১ বিঘা থেকে ৫ বিঘা	১২
জমির মালিক	১ কাঠা থেকে ১ বিঘা	৩২
ভূমিহীন	০০	৩৯

সারণি-১০ : জমির মালিকানার ভিত্তিতে কদলপুর গ্রামের গৃহস্থদের তথ্য

কদলপুর গ্রামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের হয় উত্তর-গুজরা প্রাথমিক বিদ্যালয়, নয়তো রমজান আলী হাটের নিকটবর্তী কদলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা হেঁটেই স্কুলে যায়। অন্য সময় অসুবিধা না হলেও বর্ষাকালে ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে বেশ কষ্ট হয়। গ্রামের প্রবীণ অধিবাসী শ্রীকানাইলাল চৌধুরী পাঁচ বছর পূর্বে কমিউনিটি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ১০ কাঠা জমি দান করেছেন।[৪] কিন্তু কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে দীর্ঘ পাঁচ বছরেও সে-বিদ্যালয় এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। গ্রামীণ যুবকদের অবসর যাপনেরও কোনো সুযোগ নেই কদলপুর গ্রামে। এ গ্রামে খেলার উপযোগী কোনো মাঠ নেই। ফলে সরকারি রাস্তার পাশে মগধেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গ্রামের যুবকেরা একত্র হয়- গাল-গল্প-আড্ডায় সময় কাটায়। তরুণ সংঘের বিভিন্ন সভা এবং কর্মোদ্যোগ যুবকেরা এই মন্দির প্রাঙ্গণে বসেই গ্রহণ করে থাকে। তরুণ সংঘের অন্যতম সংগঠক শ্রীস্বপন সরকার নিজ অর্থে একটি ঘর নির্মাণের কথা আমাকে জানিয়েছেন। যদি এই ঘর নির্মিত হয় তাহলে তরুণ সংঘের কাজে নতুন উদ্দীপনা দেখা দেবে বলে তার ধারণা।[৫]

পেশা	গৃহস্থ	শতকরা হার
কৃষিকাজ (ধনী কৃষক)	০৭	৭.৭৮%
কৃষিকাজ (মাঝারি কৃষক)	৩০	৩৩.৩৩%
কৃষি শ্রমিক (ক্ষেত মজুর)	২৪	২৬.৬৭%
চাকুরি (দেশে)	১২	১৩.৩৩%
চাকুরি (বিদেশে)	০৫	৫.৫৬%
জেলে, মুচি, নাপিত, ধোপা, ভ্যানচালক ইত্যাদি	১২	১৩.৩৩%

সারণি -১১ : পেশাগত তথ্য

সাম্প্রতিক সময়ে কদলপুর গ্রামে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম প্রসারিত হয়েছে। গ্রামের অনেক দুঃস্থ মহিলা এনজিওদের উৎসাহে একটি সমিতি গঠন করেছে। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তারা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করে। যথাসময়ে তারা ঋণের

টাকা পরিশোধ করে। এভাবে স্থবির গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ সচলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। মাঠ-পর্যায়ে গবেষণা করার সময় লক্ষ্য করেছি, যারা ঋণ নিয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তাদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে এক ধরনের স্বাবলম্বীভাব ফুটে উঠেছে। তাদের দেখে অন্যরাও ঋণ গ্রহণে উৎসাহী হয়ে উঠছে। ঋণের টাকা দিয়ে কদলপুর গ্রামের দুঃস্থ নারীরা হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ, বেতের কাজ, মুড়ি ভাজা, মাছ ধরার জাল বোনা- এসব কাজে জড়িত হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য সাধারণত পার্শ্ববর্তী রমজান আলী হাটে বিক্রি হয়।[৬]

কদলপুর গ্রামে উঁচু কোনো মাঠ বা ঘাসের জমি নেই। ফলে এ-গ্রামে গবাদি পশুপালন বেশ কষ্টসাধ্য। বছরের সারাটা সময় সরকারি রাস্তাতেই গরু-ছাগল বিচরণ করে। বর্ষাকালে গ্রামবাসীদের পক্ষে গরু-ছাগল প্রতিপালন বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।[৭]

কদলপুর গ্রামের সামগ্রিক এই পরিচিতির পর এবার দৃষ্টি দেবো আলোচ্য গ্রামের জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্রিয়াশীল জাতিবর্ণ-ব্যবস্থার ওপর। এ গ্রামের হিন্দু জনমানসে যেমন রয়েছে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অমোঘ প্রভাব, তেমনি রয়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝেও। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার চারিত্র্য, মুসলিম সমাজে তার প্রভাব, আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা- ইত্যাদি বিষয় নিচে আলোচিত হলো।

কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা

কদলপুর গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম- উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর মাঝেই মর্যাদাগত বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। এ-গ্রামের হিন্দু সমাজ মূলত তিনটি বর্ণে বিভক্ত। এই বর্ণত্রয় হচ্ছে- উচ্চ-বর্ণ, নিম্ন-বর্ণ এবং নমশূদ্র। জাতিবর্ণের সনাতন ব্যবস্থা বর্তমানে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়লেও জন্ম-বিয়ে-মৃত্যুসহ নানা ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে এখনও এ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সক্রিয় আছে। বিশেষত জন্ম, বিয়ে এবং মৃত্যু-উত্তর পারলৌকিক কর্মে জাতিবর্ণের বিধি-বিধান কঠোরভাবে মানা হয়। এই তিনটি সামাজিকদিকসহ আরো কিছু বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাখ্যায় নানামাত্রিক বিভিন্নতা থাকলেও কার্ল মার্কস্ থেকে আরম্ভ করে ব্যাডেন পাওয়েল, চার্লস্ মেটক্যাফ, ডি. ডি. কোসাম্বী, এ. আর. দেশাই, ইরফান হাবিবসহ সকল সমাজ-নৃবিজ্ঞানীই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ (self-sufficient village community) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮] ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় এক একটি পেশাদার সামাজিক গোষ্ঠী এক এক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে, জন্মসূত্রেই ওই গোষ্ঠী বিশেষ এক কর্মে নিয়োজিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় এটা এক ধরনের সামাজিক শ্রমবিভাগও বটে। বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠী স্ব-স্ব পেশায় নিয়োজিত থেকে নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূরণ করে এবং এভাবে সৃষ্টি হয় এক ধরনের

স্বয়ংসম্পূর্ণতা। স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এক সময় পরিচালিত হতো বাংলার গ্রামীণ সমাজ। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করা যায় নীহাররঞ্জন রায়ের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা-

> বাঙলায় ইতিহাসের আদিপর্বে- এবং শুধু আদিপর্বেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এবং বহুলাংশে এখনও- বাঙালি জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক এবং বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ।...এই গ্রামকেন্দ্রিকতার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতি।...আমাদের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল কৃষি এবং ছোট ছোট গৃহশিল্প। কৃষি একান্তই ভূমিনির্ভর। ছোট ছোট গৃহশিল্পে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারাও প্রধানত না হউন অংশত কৃষকই, এবং তাঁহারাও সেইজন্যই একান্ত ভূমিসংলগ্ন জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষিভূমি তো সমস্তই গ্রামে; বস্তুত কৃষিভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তো গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিত। এই ভূমিই আবার গোষ্ঠী ও পরিবার-বন্ধনের আশ্রয়, অথবা একেবারে উল্টাইয়া বলা চলে, এক এক ভূম্যাংশ আশ্রয় করিয়াই এক একটি গোষ্ঠী ও পরিবার; এবং যেহেতু সেই ভূমি অনড় অচল এবং সেই ভূমিই সকলের জীবিকাশ্রয়, সেই হেতু গোষ্ঠী এবং পরিবারও স্থির এবং গোষ্ঠীর পরিবার-বন্ধনও দৃঢ়। তীর্থ পর্যটন, শিক্ষাদীক্ষা আহরণ, ধর্মপ্রচার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার কোনও প্রয়োজন কাহারও হইত না; জীবিকা সংগ্রহ হইত গ্রামেই, এবং গ্রামগুলি সাধারণত ছিল স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ।[৯]

প্রাচীন বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানী অনুপম সেনের ভাষ্যে সকল ব্যাখ্যারই একটি স্ফটিকসংহত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের চারিত্র্য তিনি নির্দেশ করেছেন এভাবে-

> গ্রামের মুখ্য অধিবাসী ছিল কৃষিজীবী ও গ্রামীণ কারিগর শ্রেণী, পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশার কিছু লোক যেমন, শিক্ষক, পুরোহিত পণ্ডিত, ঢালী, ঢুলি ইত্যাদি। প্রত্যেক গ্রামেই ছিল নিজস্ব কারিগরশ্রেণী অর্থাৎ কামার-কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, নাপিত, ধোপা প্রমুখ। কৃষক-গৃহস্থ ও অন্যান্য গৃহস্থের সারা বৎসরের কারুকর্মের চাহিদা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দা, খন্তা, লাঙল, লাঙলের ফলা, হাঁড়ি, কুড়ি, ঝুড়ি, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন এরাই মেটাত। প্রতিদানে এরা গ্রাম থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি এবং কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্তের অংশবিশেষ পেত। গ্রামগুলোকে নিজের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে সচরাচর বাইরের মুখাপেক্ষী হতে হতো না।[১০]

স্বনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ সৃষ্টিতে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেননা, বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠী স্ব-স্ব পেশার কাজে নিয়োজিত থেকে সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করতো। কিন্তু এখন আর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনো গ্রামে গ্রামে জাতিবর্ণের প্রভাবে বিশেষ একটি গোষ্ঠী বিশেষ কাজ করে থাকে বটে; তবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলতে যা বুঝায়, তার অস্তিত্ব আজ আর কোনো গ্রামেই বর্তমান নেই। এ প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য সমাজবিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ মুখার্জীর অভিমত। উত্তরবাংলার খেতলাল উপজেলার অন্তর্গত হাটশহর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ লিখেছেন-

> ...হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে (হাটশহর গ্রামে) বসবাস করে। নানা বর্ণের হিন্দু লোকজন বসবাস করলেও গ্রামটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বর্ণের লোকজনের প্রয়োজন, আজকাল আর এমনটি দেখা যায় না। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ লেখককে জানিয়েছেন সাম্প্রতিক কালে গ্রামটির সমাজকাঠামো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, এবং বহু পরিবারের উপায়ন্তর না থাকায় ভাগ্যের অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছে। এ ছাড়াও অনেক পরিবার দরিদ্রতা, রোগ এবং মৃত্যুর কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এসব পরিবারের সাথে সাথে গ্রামটি জন্মগত পেশাদার কিছু সংখ্যক কুমার, কামার ইত্যাদি বর্ণের পরিবারকে হারিয়েছে।[১১]

হাটশহর গ্রাম সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মুখার্জীর এই পর্যবেক্ষণ বস্তুত, বাংলাদেশের যে-কোনো গ্রাম সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কদলপুর গ্রামেও আমরা একই চিত্র লক্ষ্য করি। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রচল জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কদলপুর গ্রামে এখন আর সনাতন রূপে পাওয়া যায় না। ফলে হিন্দুদের বর্ণ-ব্যবস্থাতেও দেখা দিয়েছে নানা ধরনের পরিবর্তন। বিভিন্ন অঞ্চলে এখন নানা ধরনের বর্ণ-বিভাজন চালু আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এই চতুর্বর্ণের অস্তিত্ব কদলপুর গ্রামে আজ আর নেই। কদলপুর গ্রামে এখন ক্রিয়াশীল বর্ণব্যবস্থাকে আমরা শনাক্ত করতে পারি নিম্নোক্তভাবে-

ক. উচ্চ-বর্ণ (Upper caste);
খ. নিম্ন-বর্ণ (Lower caste);
গ. নমশূদ্র (Scheduled caste)।

কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর এই বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধের সূচনাতেই আমাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। উল্লেখ্য, নিম্নস্তরের এবং সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থায় জাতিবর্ণই কখনো কখনো শ্রেণীর মর্যাদা পায়। প্রসঙ্গত সমাজবিজ্ঞানী রংগলাল সেন জানাচ্ছেন- প্রাচীন বাংলায় কায়স্থদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে, তাদের ক্ষেত্রে বর্ণ ও শ্রেণী সমার্থ হয়ে পড়েছিল।[১২] কদলপুর গ্রামেও বর্তমানে এর কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। তবে যেহেতু আমাদের মূল পর্যবেক্ষণে শ্রেণী-বিষয় প্রতিপাদ্য ছিল না, তাই সে-বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। হিন্দুদের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অদৃশ্য প্রভাব কদলপুর গ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝেও ক্রিয়াশীল আছে বলে আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বৌদ্ধদের মাঝে সামাজিক মর্যাদা-বিভাজনের কোনো লক্ষণ নেই। কদলপুর গ্রামেও যে দুই বৌদ্ধ পরিবার বাস করে তাদের মাঝে, কিংবা পার্শ্ববর্তী অন্য গ্রামের বৌদ্ধদের মাঝে কোনো সামাজিক বিভাজনের কথা জানা যায় নি।

হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা

কদলপুর গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, কদলপুর গ্রামের হিন্দুদের মাঝে এখন তিন বর্ণের মানুষ বাস করছে। এরা হচ্ছে উচ্চ-বর্ণ, নিম্ন-বর্ণ এবং নমশূদ্র। এই তিন বর্ণ সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা এবার আমরা ক্রমানুযায়ী উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

উচ্চ-বর্ণ

উচ্চ-বর্ণের হিন্দু সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং বর্ণব্যবস্থা- উভয় দৃষ্টিকোণেই মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করে। উচ্চ-বর্ণের মাঝে স্পষ্টরেখায় দুটো বিভাজন রয়েছে। এই বিভাজনদ্বয় এ-রকম- ১. ব্রাহ্মণ এবং ২. অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ। সামাজিক স্তরবিন্যাসের দৃষ্টিকোণে কদলপুর গ্রামের ব্রাহ্মণরা মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করে। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মানুষ মর্যাদার দৃষ্টিকোণে ব্রাহ্মণদের চেয়ে নিজেদের নিম্ন-মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করে। উল্লেখ্য, উচ্চবর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণরা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের বাড়িতে যায়। জল পান করে- কিন্তু অন্ন স্পর্শ করে না। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণদের ঘরে উঠতে পারে এবং ব্রাহ্মণ প্রদত্ত যে-কোন খাবার গ্রহণ করতে পারে। ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মাঝেও আবার নানামাত্রিক বিভাজন আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে।

১. ব্রাহ্মণ

কদলপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারের সংখ্যা চার। এই চার ব্রাহ্মণ পরিবারে মোট জনসংখ্যা ২১ জন। কদলপুর গ্রামের বর্ণ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা সামাজিক মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণরা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে পূজা-অর্চনা করে, তাদের শোনায় ধর্মীয় কথা। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ কিংবা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে গেলেও তাদের দেওয়া কোনো খাবার ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করে না। বিয়ে, শ্রাদ্ধ বা অন্য কোনো সামাজিক উৎসবে কোনো উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর বাড়িতে ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রিত হলে তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে। একটি স্বতন্ত্র ঘরে রান্নার উপকরণ ও সামগ্রী দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো সদস্য রান্না করে এবং এক সঙ্গে আহার করে। খাদ্য-প্রস্তুতি এবং আহারের সময় ব্রাহ্মণরা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের কিংবা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের স্পর্শ এড়িয়ে চলে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় শাস্ত্রীয় পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণায় (ritual pollution and purity) খাদ্যপ্রস্তুতি এবং আহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ব্রাহ্মণরাও মনে করে, খাদ্যপ্রস্তুতি ও আহার গ্রহণ কালে ব্রাহ্মণ-জাতিবহির্ভূত অন্য কোনো ব্যক্তির স্পর্শ লাগলে অপবিত্রতার দোষে আক্রান্ত হবে ওই ব্রাহ্মণ। আহার গ্রহণ-বিষয়ক বর্ণ-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য কদলপুর গ্রামেও লক্ষ্য করা গেছে।

কদলপুর গ্রামের সরকার পাড়ায় শ্রীনারায়ণচন্দ্র সরকার-বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপে মহা ধূমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় সেখানে উপস্থিত থেকে বর্ণ-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য করেছি, ব্রাহ্মণরা খাদ্যপ্রস্তুতি এবং আহার গ্রহণে সনাতন প্রথাই অনুসরণ করছে। তারা স্বতন্ত্র ঘরে রান্না করে, তাদের হাতে প্রস্তুত অর্ঘ্য দেবীক উৎসর্গ করা হয়, তারা নিজেরাও সে-রান্না সামগ্রী আহার করে। আরো লক্ষ্য করেছি, অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের তৈরি আহার সামগ্রীকে পবিত্র প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের হাতে তৈরী আহারকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে 'ভোগ' বলা হয়। 'ভোগ' আহারকালে উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা প্রথমেই কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে নেয়। যে-সব শিশু

এখনো মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য কোনো আহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি, তাদেরও কপালে বা মাথায় ঠেকিয়ে 'ভোগ' গ্রহণ করে পরিবারের বয়স্ক কোনো সদস্য। 'ভোগ' গ্রহণের পর জল দিয়ে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করা হয়, যেন অন্য কোনো আহারের স্পর্শে তা অপবিত্র না হয়।[১৩]

কদলপুর গ্রামে যে চার পরিবার ব্রাহ্মণ আছে, মর্যাদাগত দৃষ্টিকোণে তারা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। সনাতন বর্ণ-ব্যবস্থায় প্রতিটি বর্ণের মাঝেই আবার কতগুলো জাতি (caste) থাকে। কদলপুর গ্রামে ব্রাহ্মণদের মাঝেও তা' লক্ষ্য করা যায়। চার পরিবার ব্রাহ্মণের মধ্যে এক ঘর ব্রাহ্মণ উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন, অন্যদিকে বাকি তিন ঘর নিম্ন-মর্যাদাভুক্ত। উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণ পরিবারের পদবী চক্রবর্তী, অন্যদিকে নিম্ন-মর্যাদাভুক্ত তিন ব্রাহ্মণ পরিবারের পদবী আচার্য। আচার্যদের কদলপুর অঞ্চলে মাশ্রাধী ব্রাহ্মণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী। তার ছেলের নাম কানাইলাল চক্রবর্তী। এই দুই ব্রাহ্মণই কদলপুর গ্রামের অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের বাড়ির যাবতীয় পূজা-অর্চনা, বিয়ে, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষে কৃত্য বিধানসমূহ সমাধা করে থাকে। মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে পূজা-অর্চনা করে না, কিংবা কোনো কৃত্যমূলক কাজে পৌরোহিত্যও করে না। মাশ্রাধী ব্রাহ্মণেরা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে যজমানী করে, অংশগ্রহণ করে নানা কৃত্য অনুষ্ঠানে। ব্রাহ্মণদের মাঝে মর্যাদাগত এই বিভাজন যুগের পর যুগ চলে আসছে কদলপুর গ্রামে।

কদলপুর গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধান কালে আমরা লক্ষ্য করেছি, অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর বাড়িতে দুর্গাপূজাসহ নানা কৃত্যমূলক কাজে চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণের সাহায্যকারী হিসেবে মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরা নানা কাজ করে। পূজার উপকরণ সাজানো, ফুল সংগ্রহ করা, ঘাট থেকে জল আনা, প্রদীপ জ্বালানো- এসব কাজ মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরাই করে থাকে। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে পূজা বা বিয়ের অনুষ্ঠানে মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরা মন্ত্র পাঠ করতে পারে না। আবার তারাই নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে পূজার সময় মন্ত্র উচ্চারণ করে, বিয়ের মন্ত্র পাঠ করে। সামাজিক দৃষ্টিকোণেও চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের অবস্থান মাশ্রাধী ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক উঁচুতে।

সামাজিক মর্যাদাগত এই বিভাজন ব্রাহ্মণ পরিবারের নানা কাজেও লক্ষ্য করা যায়। চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণ আচার্য ব্রাহ্মণদের বাড়িতে আহার গ্রহণ করেলেও, এই দুই মর্যাদার ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহপ্রথার প্রচলন নেই। বিয়ের বর বা কনের জন্য তারা অন্য গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অন্য জাতি বা বর্ণের কারো সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে সমাজে প্রবলভাবে নিন্দনীয়। এরূপ ঘটনা ঘটলে তা পাপ বলে গণ্য হয় এবং তাতে ওই পরিবার অপবিত্র বা polluted হলো বলে ধারণা করা হয়। প্রায় দশ বছর পূর্বে এই গ্রামের মাশ্রাধী পরিবারের এক যুবক চট্টগ্রাম শহরে পড়ালেখা করতে গিয়েছিল। সেখানে সে সহপাঠী নিম্ন-বর্ণের এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও

ছেলেটি, নাম যার বিপুল, ওই মেয়েকে সামাজিকভাবে বিয়ে করতে পারেনি। তবে শহরে গিয়ে বিপুল যখন তার প্রেমিকাকে বিয়ে করে সমাজে তা' ভয়াবহ পাপ বলে বিবেচিত হয়। বিপুলকে সমাজে একঘরে করা হয়। শেষ পর্যন্ত পরিবার-বন্ধন ছিন্ন করে তাকে চট্টগ্রাম শহরে চলে যেতে হয়। এখন সে চট্টগ্রাম শহরেই থাকে এবং এক সদাগরি ফার্মে কাজ করে স্ত্রীকে নিয়ে বিড়ম্বিত জীবন যাপন করছে।[১৪] কদাচিৎ সে মা-বাবাকে দেখার জন্য গ্রামে আসে। সাধারণত সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে, আবার অতি ভোরে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। গ্রামে এলে পরিবারের সদস্য ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না, কথা বলে না। বিপুল আচার্যের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি সাধ্যমত অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তার সাক্ষাৎ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কদলপুর গ্রামে জাতিবর্ণের শাসন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো যে কত দৃঢ়, বিপুল আচার্যের এই পরিণতি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিয়ের ক্ষেত্রেই জাতিবর্ণ ব্যবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে অন্য বর্ণের তরুণ-তরুণীর প্রণয়ের ফলে বিয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক অস্বীকৃতির কারণে বছরে এক হাজারেরও অধিক যুবক-যুবতী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়।[১৫] নৃবিজ্ঞানী বীণা দাসের অভিমত এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। উত্তর-ভারতের ধর্মারণ্য নামক গ্রামের ব্রাহ্মণদের জাতপাতের শাসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-

> Manu and other authors who had codified the religious laws had permitted the acceptance of wives from the lower *Varnas.* However, in the kaliyuga the Brahmans were not to be permitted to aceept wives from the lower *Varnas.* These new rules which restricted the acceptance of food and wives from other *jatis* were to be strictly followed by the residents of Dharmaranya.[১৬]

সমাজে এইকথা সবাই বিশ্বাস করে যে, ব্রাহ্মণরা কোনো পাপ করতে পারে না। যদি বা তারা কোনো পাপ করে, সে-ক্ষেত্রে আছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। প্রায়শ্চিত্ত পালন করলেই ব্রাহ্মণ পাপমুক্ত হতে পারে। তবে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পাপমুক্তির এই বিধান অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণ হিন্দুর মধ্যে পাওয়া যায় না। উল্লেখ করা যায়, জাতিবর্ণের এই বিধান সমাজে চালু করেছে ব্রাহ্মণরা, তাই নিজেদের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সে-দিকে তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে। প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পাপমুক্তির বিধান সেই স্বার্থচেতনারই এক অভ্রান্ত প্রমাণ। তবে নানা ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিধান চালু আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বীণা দাসের অভিমত-

> If a Brahman committed a murder, then he was to perform the requisite act of penance in accordance with the procedures laid down in the Dharmashastras. If a Brahman, a woman, a child or a cow had been killed, then a *Vrata* for the duration of twelve years would have to be performed. Drinking liquor was to be regarded as sinful as killing and accordingly punished.[১৭]

কদলপুর গ্রামের চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের বিয়ে বা অন্য কোনো ধর্মীয় কাজে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন দেখা দিলে অন্য গ্রামের উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়। মর্যাদাগত স্তরায়ণে আচার্য ব্রাহ্মণরা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের নীচে থাকায়, তারা কোনো কৃত্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণই কেবল উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণের বাড়িতে কৃত্যমূলক ধর্মীয় কাজে মন্ত্র পাঠ ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে এই-ই হচ্ছে চক্রবর্তী পদবীধারীদের দীর্ঘকালীন বিশ্বাস। আচার্য ব্রাহ্মণরা পূজার কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারে, সাজিয়ে দিতে পারে অর্ঘ্যও, কিন্তু পূজা করার কোনো অধিকার তাদের নেই। মৃত্যু-উত্তর শ্রাদ্ধের কাজ করার ক্ষেত্রে তারা পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নাম শুনানো, ধর্মকর্ম প্রতিপালন ইত্যাদি করেই তাদের জীবিকা পরিচালিত হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিয়েতে নানা বর্ণের লোক অংশগ্রহণ করে, ব্রাহ্মণদের তারা দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে জ্ঞান করে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের হিন্দুরাও মাশ্রাধী ব্রাহ্মণের তুলনায় চক্রবর্তী ব্রাহ্মণকেই বেশি মর্যাদা দিয়ে থাকে।

কদলপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবার-চতুষ্টয় পৌরোহিত্য করেই জীবন নির্বাহ করে। তবে মাশ্রাধী পরিবারের একজন ব্রাহ্মণ গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়েদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে কিছু উপার্জন করে। চক্রবর্তী পরিবারের আশুতোষ চক্রবর্তীর কিছু ধানের জমি আছে, তা দিয়ে তিনি কৃষি-শস্য লাভ করেন। এক নমশূদ্র বর্গাচাষীর কাছে তিনি জমি দিয়ে দেন চাষের জন্য । বিনিময়ে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেকটা তিনি লাভ করেন। অর্থনৈতিক অসহায়তার কারণে মাশ্রাধী পরিবারের নির্মল আচার্য রমজান আলী হাটে তরি-তরকারি বিক্রি করে। পূর্বে এ কাজকে গ্রামের লোকেরা ভালো চোখে দেখেনি, কিন্তু ক্রমে সকলেই তা মেনে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা পূজার বিধি-বিধান ভালোভাবে জানে, মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে। অতীতে এ গ্রামে আরো বেশ কিছু ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা অন্যত্র চলে গেছে। অতীত আমল থেকেই দেখা গেছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের ছোট ছেলে-মেয়েরা অন্য বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়ালেখা করতো না। বাড়িতে মা-বাবার কাছেই তারা শিক্ষা লাভ করতো। কিন্তু এ-অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ব্রাহ্মণ পরিবারের একাধিক সদস্য নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে লেখাপড়া করছে।

ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষ সদস্য উপনয়ন (পৈতা পরানো) উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হিসেবে ধর্মীয় সমাজজীবনে প্রবেশ করে। উপনয়নকে ব্রাহ্মণের জীবনে দ্বিতীয় জন্ম হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্ণপ্রথা কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা উপনয়ন অনুষ্ঠান থেকে অনুধাবন করা যায়। যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠে, তা নির্ভর করে অপেক্ষাকৃত নিচু বর্ণের ক্ষৌরকার কর্তৃক তার মস্তকমুণ্ডনের মাধ্যমে। মাথা ন্যাড়া করে দিয়ে নাপিত ওই ব্রাহ্মণকে পবিত্র করে তোলে। হাটশহর গ্রামে ব্রাহ্মণসমাজে

উপনয়ন অনুষ্ঠানেও সমাজবিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ মুখার্জী একই চিত্র লক্ষ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন-

> এই উৎসব (উপনয়ন অনুষ্ঠান) পালন করার সময় নাপিত দিয়ে তার (ব্রাহ্মণের) চুল ন্যাড়া করে দেয়া হয় এবং সে সাথে কান ছিদ্র করে সোনার অথবা রূপার রিং পরানো হয়। পরবর্তীতে তাকে গেরুয়া রং-এর ধুতি-চাদর দিয়ে সন্ন্যাসীর পোষাক পরানো হয়। তাকে অন্ততঃ পক্ষে এক বছরের জন্য কুমার এবং ব্রহ্মচারীর ন্যায় কষ্টকর জীবন অনুশীলন করার অঙ্গীকার করতে হয়।...এই উৎসব পরিচালনার জন্য পুরোহিত এবং কান ছিদ্র ও মাথা ন্যাড়া করার জন্য নাপিতদেরকে প্রণামী এবং উৎসবে যে সব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা অংশগ্রহণ করে তাদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।[১৮]

মৃত্যুর পর মরদেহ দাহের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কদলপুর গ্রামের ব্রাহ্মণরা। এ-ক্ষেত্রে চক্রবর্তী বা আচার্য- উভয় জাতিই অভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে। মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ মরদেহটি বাঁশের মাচা বা চার পা বিশিষ্ট কাঠের চৌকিতে করে পাড়াস্থ পুকুরের পাশে নিয়ে যায়। সেখানেই মরদেহটি আম কাঠ দিয়ে দাহ করা হয়। দাহের সময় কোনো এক পর্যায়ে এক টুকরা চন্দন কাঠও আগুনে দেওয়া হয়। ভাবা হয় মৃত ব্যক্তি চন্দন কাঠের গন্ধ পেয়ে প্রফুল্লিত হবে। দাহ করার পর উপস্থিত সবাই পুকুরে স্নান করে। এরপর মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে চিড়া ও গুড় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। দাহ করার এগার বা তের দিন পর অপবিত্রতা কাটানোর লক্ষ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই এগার দিন মৃত ব্যক্তির ঘরে রান্না হয় না; তাদের গৃহে কেউ জল বা কোনো খাবার গ্রহণ করে না। যে ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য মারা যায়, সে-পরিবারের কোনো ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে না। অন্য পরিবারের কোনো ব্রাহ্মণ এ দায়িত্ব পালন করে। কদলপুর গ্রামে উচ্চ-মর্যাদার যে এক পরিবার ব্রাহ্মণ আছে, তাদের পারলৌকিক কাজে এজন্য অন্য স্থান থেকে উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হয়। নিমন্ত্রিত ওই ব্রাহ্মণকে বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধের উপহারসহ প্রণামী দিতে হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেবল অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের নিমন্ত্রণ করা হয়। ব্রাহ্মণের কোনো ধর্মীয় অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে নিম্ন-বর্ণের হিন্দু অথবা নমশূদ্রদের নিমন্ত্রণ করা হয় না। কদলপুর গ্রামে এ ব্যবস্থা যুগের পর যুগ চলে আসছে।

২. অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ

কদলপুর গ্রামে অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দু আছে মোট পঁচিশ পরিবার এবং তাদের সংখ্যা ১২২ জন, যা গ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ২৯.৪০ ভাগ। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আছে সরকার, চৌধুরী, দত্ত, দে এবং তালুকদার পদবীধারী মানুষ। তারাই কদলপুর গ্রামের সামাজিক কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কদলপুর গ্রামে পাঁচ পদবীধারী উচ্চ-বর্ণের মধ্যে সরকারদের অবস্থান শীর্ষে। অভিন্ন বর্ণের মাঝেও যে নানামাত্রিক বিভাজন আছে, আছে নানা জাতির অস্তিত্ব, কদলপুর গ্রামের অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মাঝে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য

করা যায়। পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, কদলপুর গ্রামের উচ্চ-বর্ণের মধ্যে মর্যাদাগত বিভাজনের অনুক্রমটা এরকম- সরকার, চৌধুরী, দত্ত, দে এবং তালুকদার।[১৯]

কদলপুর গ্রামের অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ ও আন্তঃআহার চালু রয়েছে। সামাজিকভাবে অন্য বর্ণের নর-নারীর সঙ্গে উচ্চ-বর্ণের নর-নারীর বিয়ে নিষিদ্ধ। কঠোরভাবে এ বিধান পালন করা হয়। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের কোনো যুবক বা যুবতী নিম্ন-বর্ণের কাউকে বিয়ে করলে সমাজে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হয়। তবে মজার বিষয় হলো অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের কোনো নর-নারী ব্রাহ্মণ পরিবারের কাউকে বিয়ে করলে সামাজিকভাবে তা' প্রশংসার চোখে দেখা হয়। গ্রামে এটিকে সামাজিকভাবে উচ্চ-অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ার সমাজতাত্ত্বিক প্রবণতা বা কারণ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী এম. এন. শ্রীনিবাস কথিত 'সংস্কৃতায়ন' প্রত্যয়টিকে এ গ্রামে এভাবে ক্রিয়াশীল দেখতে পাওয়া যায়। তথ্যসংগ্রহকালে প্রায় দুই যুগ পূর্বের কদলপুর গ্রামের একটি ঘটনার কথা জানা গেছে। গ্রামের চৌধুরী পদবীধারী এক যুবক পার্শ্ববর্তী আন্ধারমানিক গ্রামের এক ব্রাহ্মণকন্যাকে ভালোবেসে বিয়ে করে। গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠী এ ঘটনায় প্রথমে খানিকটা অস্বস্তিতে থাকলেও, অচিরেই ঘটনাটিকে গর্বের চোখে দেখেছে। অন্য বর্ণের হিন্দুদের ওপর ব্রাহ্মণদের স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচারই হয়তো তাদের চিত্তে এই ঘটনা এক ধরনের প্রসন্নতা ছড়িয়েছে।[২০]

অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের বিয়ের সময় জাতিবর্ণের বিধি-বিধানকে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রামের সকল সদস্যই উদগ্রীব। কিন্তু সব সময় মর্যাদাসম্পন্ন পাত্র বা পাত্রী পাওয়া যায় না। বিয়ের সময় বর বা কনের বংশমর্যাদা গভীরভাবে দেখা হয়। এ এলাকায় একটি প্রবাদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, যে প্রবাদ থেকে সামাজিক মর্যাদার নিয়ামক হিসেবে বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। প্রচলিত প্রবাদটি এরকম- 'জাতের মেয়ে কালোও আলো/ নদীর জল ঘোলাও ভালো।' বংশমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিতবাহী এই প্রবাদটি এক সময় বাংলাদেশের সর্বত্রই বহুল প্রচলিত ছিল।

বিয়ের মন্ত্র পাঠ করেন চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। কদলপুর গ্রামের উচ্চ-বর্ণের প্রায় সকলেই আকাঙ্ক্ষা করেন তার পুত্র বা কন্যার বিয়েতে পুরোহিত হিসেবে শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী উপস্থিত থাকুন। এক লগ্নে একাধিক বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে এখন কানাইলাল চক্রবর্তীও পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করে। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তীর মতো কানাইলালও আস্তে আস্তে কদলপুরের হিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে দেন কন্যাপক্ষের কোনো একজন নারী। বিয়ের দিন কন্যার মতো তিনিও উপবাস ব্রত পালন করেন। বিয়ের পিঁড়ি এবং আসর তিনি আলপনা এঁকে অলঙ্কৃত করেন, সাজিয়ে দেন সমস্ত উপকরণ। তবে যজ্ঞের সমস্ত কাজ করেন একজন মাশ্রাধী ব্রাহ্মণ। যজ্ঞানুষ্ঠানের কোনো কিছু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারে না। কেননা

যজ্ঞের সামনেই থাকে নারায়ণের মূর্তি। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কারো নারায়ণের মূর্তি স্পর্শ করা মহা পাপকর্ম- এই ধারণা বর্ণনির্বিশেষে সকল হিন্দুই মনে-প্রাণে পোষণ করে।

পাত্রীর বাড়িতেই উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের দিন লগ্নের পূর্বেই বরযাত্রীসহ পাত্র বিয়ের আসরে উপস্থিত হয়। বরপক্ষেও কখনো কখনো একজন ব্রাহ্মণ থাকেন। তিনিও বিয়ের অনুষ্ঠানে পাত্রীপক্ষের ব্রাহ্মণকে সাহায্য করে থাকেন। তবে কখনো কখনো দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে কৃত্যের নানা বিষয় নিয়ে মতভেদও সৃষ্টি হয়। বরপক্ষের ব্রাহ্মণকে পাত্রীপক্ষের সবাই ভক্তিভরে গ্রহণ করে। তার জন্য থাকা-খাওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়। তবে রীতি অনুযায়ী পাত্রপক্ষের ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে রান্না করে খেতে হয়।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর বাড়িতে অন্নপ্রাশন[২১] উৎসব পালিত হয়। এ উৎসবও পরিচালনা করেন শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী। অন্নপ্রাশন উৎসবে বিভিন্ন বর্ণের লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়। তবে শিশুটির মুখে কেবল দেবতার 'ভোগ' দেওয়া হয়। আশুতোষ চক্রবর্তীই গ্রামের সকল শিশুর মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেন। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মাঝে শিশুর লেখাপড়ার আরম্ভ-বিষয়ক হাতেখড়ি অনুষ্ঠান হয়। আশুতোষ চক্রবর্তীকে দিয়েই সকলে তার সন্তানকে হাতেখড়ি দেওয়াতে চায়। আশুতোষ চক্রবর্তী নিজে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণ, দেবতার মর্ত্য-প্রতিনিধি- তাই সকলের বিশ্বাস তার মাধ্যমে পড়ালেখা আরম্ভ হলে শিশুটি উত্তরকালে উচ্চশিক্ষিত হবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। বর্তমানে অন্নপ্রাশন বা হাতেখড়ি অনুষ্ঠান উঠে গেছে বললেই চলে। অর্থনৈতিক সঙ্কটই এর প্রধান কারণ। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠান পুনরায় চালু হওয়া উচিত বলে মনে করেন শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী। তিনি জানালেন, অতীতে এ-সব অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য তিনি ভালো প্রণামী পেতেন, কিন্তু এখন তা' অনেক হ্রাস পেয়েছে।[২২] বোঝা যায়, তার এই অভিমতের পেছনে কাজ করছে অর্থনৈতিক চিন্তা।

শিশু জন্মের পর 'কোষ্ঠী'[২৩] তৈরির বিধান কদলপুর গ্রামের উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মাঝে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। কোষ্ঠীতে শিশুর যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। মঙ্গল-অমঙ্গলের নানা ইঙ্গিত তাতে লেখা হয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই কোষ্ঠী অতি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়। উত্তরকালে নানা কাজে, বিশেষত বিয়ের সময় এই কোষ্ঠী খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। সাধারণত আশুতোষ চক্রবর্তীই শিশুদের কোষ্ঠী তৈরি করে থাকেন। তবে মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরাও এ কাজ করেন। আশুতোষ চক্রবর্তীকে এ- বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানান- কোষ্ঠীর সঙ্গে দেবতা বা ধর্মের তেমন সম্পর্ক নেই। তাই মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরা এ কাজ করতে পারবে বলে তার পূর্ব-পুরুষেরাই অনুমতি দিয়ে গেছেন।[২৪]

উচ্চ-বর্ণের কোন হিন্দুর মরদেহ সৎকারে ব্রাহ্মণের অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি ও মুক্তির জন্য পারলৌকিক কর্ম পরিচালনা করেন উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণ। তবে ইদানীং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচার্য ব্রাহ্মণও এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বাঁশের মাচায় করে মরদেহ খাল অথবা পুকুর পাড়ে নির্দিষ্ট স্থানে নেওয়া হয়। বাড়ি থেকে মরদেহ

নেওয়ার সময় পথে খই ছিটানো হয় এবং ছোট পেতলের কলসিতে রাখা জল আম্র-পল্লব দিয়ে মরদেহ বাহকদের গায়ে ছিটানো হয়, ছিটানো হয় শবযাত্রায় অংশগ্রহণকারী অন্য ব্যক্তিদের গায়েও। মরদেহ আম কাঠ দিয়ে দাহ করার সময় সমবেত কণ্ঠে অনবরত 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। দাহের সময় চিতায় এক টুকরা চন্দন কাঠ দেওয়া হয়। ভাবা হয়, চন্দন কাঠের গন্ধ মৃত ব্যক্তিকে প্রফুল্লিত রাখবে। দাহ সম্পন্ন হলে সকলে পুকুরে স্নান করে বাড়ি ফেরে এবং চিড়া-দই আহার করে। মরদেহ দাহে অংশগ্রহণকারী কেউ-ই পরিধেয় বস্ত্রসহ ঘরে প্রবেশ করে না। স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে ঘরে ফেরাই শাস্ত্রীয় বিধান।

১১ বা ১৩ দিন পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান২৫ হয়। মৃত্যুর কখনো ৩০ দিন পরেও এ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অতীতে ৩০ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিয়ম ছিল। কিন্তু এখন তা ১১ বা ১৩ দিনে কমে এসেছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত পরিবারের লোকদের কঠিন 'গুরুদশা' বা ব্রহ্মচর্য পালন এবং সময়-ধারণার কারণে শ্রাদ্ধের দিন কমে এসেছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত পরিবারের সদস্যদের আতপচালের ভাত বা ঘৃতান্ন ভোজন করতে হয়। খাবারে কোনো লবণ দেওয়া যায় না। কেবল নারিকেল পাতা পুড়িয়ে রান্না করতে হয়। রান্না হয় মাটির হাঁড়ি-পাতিলে, ভাত খেতে হয় কলাপাতায়। এ সময় পরিবারের সদস্যরা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করে না। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা হাতে কুশাসন নিয়ে খালি পায়ে চলাফেরা করে। কোথাও বসতে হলে কুশাসনের ওপর বসে। পরিবারের বিবাহিতা সদস্যরা চুল আঁচড়ায় না, সধবা নারী কপালে সিঁদুর পরে না। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী থাকলে, তার হাতের শাঁখা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলা হয় এবং সকল প্রসাধন তিনি বর্জন করেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাকে সাদা বস্ত্র পরিধান করতে হয়। এ সময় পরিবারের সদস্যরা চুল কাটে না, পুরুষ সদস্যরা ক্ষৌরকর্ম করে না। শ্রাদ্ধের দিন পারলৌকিক কর্ম সমাপ্ত হলে পুকুরে স্নান করে তারা 'শুদ্ধ' হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা ওপরের নিয়মগুলো পালন করে থাকে।

জাতিবর্ণ প্রথায় এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের মানুষের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মৃতদেহ সৎকার এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকেও তার ধারণা পাওয়া যায়। সমাজে প্রামাণিক (পরামানিক) বা নাপিতদের অবস্থান নিম্ন-বর্ণে, মর্যাদায়ও তারা তুচ্ছ। কিন্তু বিয়ে বা অন্নপ্রাশন, জন্ম বা মৃত্যু- সব কাজেই তাদের অংশগ্রহণ অনিবার্য। মৃত্যুর পরে নির্দিষ্ট দিনে মৃতব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের নখ কেটে এবং পুরুষ সদস্যদের মস্তক মুণ্ডন করে দেয় পরামানিক সম্প্রদায়ের ক্ষৌরকার। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পূর্বে পুকুরে স্নান করার আগেই ক্ষৌরকার পরিবারের সদস্যদের 'শুদ্ধ' করে দেয়। যাদের শুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাদের পরিধেয় বস্ত্র ক্ষৌরকারই গ্রহণ করে।

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রামবাসীদের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করা হয়। অন্যত্র বসবাসরত আত্মীয়-স্বজনদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিরামিষ অন্ন

পরিবেশন করা হয়। মরদেহ সৎকারে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কদলপুর তরুণ সঙ্গের সদস্যরা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ বা নমশূদ্র নিমন্ত্রিত হলে তাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হয়। পৃথক একটি ঘরে ব্রাহ্মণের আহার ব্রাহ্মণকেই নিজ হাতে তৈরি করতে হয়। সেখানেই তারা আহার করে। অন্যদিকে নমশূদ্র ব্যক্তিরা একই আহার গ্রহণ করে, তবে তাদের বসতে দেওয়া হয় পৃথক একটি স্থানে। ইদানীং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা উঠে গেছে।[২৬] এখন উচ্চ-বর্ণ, নিম্ন-বর্ণ এবং নমশূদ্র হিন্দুরা একই ঘরে বসে আহার গ্রহণ করে। বেশ কিছু অনুষ্ঠানে এ-ব্যাপারে এখন সামাজিক বিভাজন মানা হয় না।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা বাড়িতে ধুতি-গেঞ্জি বা লুঙ্গি-গেঞ্জি পরিধান করে। তবে বাজারে বা গ্রামের বাইরে যাবার সময় তারা ধুতি-শার্ট, ধুতি-পাঞ্জাবী, লুঙ্গি-শার্ট, বা প্যান্ট-শার্ট পরে থাকে। অতীতে পুরুষ সদস্যরা অবশ্যই ধুতি পরে বাইরে যেত, কিন্তু ইদানীং ধুতির পরিবর্তে অধিকাংশই প্যান্ট পরিধান করে। উচ্চ-বর্ণের নারীরা বাড়ি এবং বাড়ির বাইরে সর্বত্রই শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করে, অল্প-বয়সী মেয়েরা পরে সালোয়ার-কামিজ।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে। তবে তারা প্রমিত বাংলাও বলতে পারে। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিতরা প্রমিত বাংলা বলতে পারে না এবং সঙ্গতকারণেই অধিকাংশ নমশূদ্রও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা বেশীর ভাগ সময়ই চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে। প্রমিত ভাষা ব্যবহারে নমশূদ্রদের এই অক্ষমতা বাংলাদেশের সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দু নারীরা গৃহস্থালী কাজ করে। সাধারণত তারা গ্রামের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করে না। ইদানীং কিছু তরুণী বাইরে গিয়ে চাকরি করছে। গ্রামের অধিকাংশ গৃহবধূই ঘরকন্নার কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। যারা সামান্য পড়ালেখা শিখেছে, তারা সন্তান-সন্ততির পড়ালেখায় সাহায্য করে থাকে। গৃহবধূরা স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে, সধবারা সিঁথি এবং কপালে সিঁদুর পরে। বাড়িতে পরিবার ভিন্ন কোনো পুরুষ এলে অবশ্যই তারা মাথায় ঘোমটা দেয়। স্বামীর বড় ভাই অর্থাৎ ভাসুরের সামনেও তারা সব সময় ঘোমটা দিয়ে থাকে।

উচ্চ-বর্ণের সরকার বংশের পাঁচজন যুবক পশ্চিম এশিয়ায় নির্মাণ-শ্রমিক হিসেবে চাকুরি করে। গ্রামের অধিকাংশই জানে, তারা ভালো চাকুরি করে, কিন্তু তাদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-সূত্রে জানা যায় তারা নির্মাণ-শ্রমিক হিসেবে চাকুরি করে। পশ্চিম এশিয়ায় চাকুরি করার ফলে এই পাঁচ পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও অনেকটা বেড়ে গেছে। মনে হয়, তাদের অবস্থান ব্রাহ্মণের মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

নিম্ন-বর্ণ

কদলপুর গ্রামে নিম্ন-বর্ণের হিন্দু পরিবারের সংখ্যা মোট ৪৪টি। এই ৪৪ পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ২২০ জন। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর মধ্যে আছে দাস ২৭, ভূঁই মালী ০৭, প্রামাণিক ০২, রজকদাস ০১ এবং বণিক ০৭ পরিবার। কদলপুর গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৩ ভাগ মানুষ নিম্ন-বর্ণের হিন্দু। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের তুলনায় নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে বেশ পিছিয়ে আছে। মর্যাদার দিক থেকে উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের পরে তাদের অবস্থান হলেও, ধর্মীয় কৃত্য ও সামাজিক বিধি-বিধানের দৃষ্টিকোণে তারা ব্রাহ্মণভিন্ন অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের কাছাকাছি। জন্ম, অন্নপ্রাশন, বিয়ে, পারলৌকিক কর্ম- এসব ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর অনুরূপ বিধান পালন করে থাকে।

নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের নানা ধর্মীয় কাজে, অন্নপ্রাশনে, বিয়েতে, মরদেহ সৎকারে উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণের পাশাপাশি আচার্য ব্রাহ্মণও অংশগ্রহণ করে। আচার্য ব্রাহ্মণরা উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের কোনো অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে না, কিন্তু নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের যাবতীয় কাজ তারা করতে পারে। মর্যাদার দিক থেকে আচার্য ব্রাহ্মণ এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা নিচে আছে বলেই এমনটা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিভিন্ন পদবীধারীর মধ্যে আন্তঃবিবাহ সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটা একেবারেই উল্টো। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে অন্য বংশের সঙ্গে বিয়ে সমাজ-অস্বীকৃত। ফলে ভূঁইমালীর সঙ্গে ভূঁইমালী, প্রামাণিকের সঙ্গে প্রামাণিক, রজকদাসের সঙ্গে রজকদাস এবং বণিকের সঙ্গে বণিকের বিয়ে হয়ে থাকে। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম দাস বংশ। দাস বংশের ছেলে-মেয়ের নিজেদের মধ্যে বিয়ে ছাড়াও উচ্চ-বর্ণের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দাস বংশের ছেলে-মেয়ের বিয়ে সমাজে স্বীকৃত। যদিও এ বিয়েকে অনেকে ভালো চোখে দেখে না। তবে অতীত আমল থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে। কেবল কদলপুর গ্রামেই নয়, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সামাজিক মর্যাদায় দাসরা পিছিয়ে থাকলেও, উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর সঙ্গে দাস-বংশোদ্ভূত ছেলে-মেয়ের বিয়ে সমাজে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

বিয়ের আসরে যেসব কৃত্য পালিত হয়, সে-ক্ষেত্রে উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের তেমন কোনো পার্থক্য আমাদের নজরে পড়েনি। কেবল একটি পার্থক্যের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা বিয়ের রাতে স্বামী-স্ত্রী পৃথক সজ্জায় ঘুমায়; কিন্তু নিম্ন-বর্ণের হিন্দু এ ক্ষেত্রে এক সজ্জায় ঘুমায়। বিয়ের পরের রাতে স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো মুখ দর্শন করে না- এ প্রথা উচ্চ-বর্ণ নিম্ন-বর্ণ উভয় শ্রেণীর হিন্দুদের ক্ষেত্রেই সত্য।

নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের ঘরে খেতে পারে, তাদের রান্নাঘরে যেতে পারে। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরাও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে আহার গ্রহণ করে। এ-ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোনো নিষেধ নেই। কদলপুর গ্রামে দেখা গেছে নিম্ন-বর্ণের দরিদ্র এক নারী উচ্চ-বর্ণের

এক পরিবারে অর্থের বিনিময়ে রান্না করে দেয়। সামাজিক বিধি-নিষেধ না থাকার দরুনই এমনটা সম্ভব হয়েছে।

নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের অনেকেই এমন কাজ করে, যা উচ্চ-বর্ণের ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না। দু'জন নিম্ন-বর্ণের মানুষ মাছ ধরে ও তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তিন জন অন্যের জমি বর্গা-চাষ করে। পার্শ্ববর্তী রমজান আলী হাটে তরি-তরকারি বিক্রি করে একাধিক নিম্ন-বর্ণের হিন্দু। নিম্ন-বর্ণের এক হিন্দু যুবক উপায়ন্তর না দেখে ভ্যান গাড়ি চালায়। প্রথমে সে অন্যত্র গাড়ি চালাতো, কিন্তু এখন আর সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে না। গ্রামের সবার সামনেই সে ভ্যান গাড়ি চালায়। দাস পরিবারের এক কিশোর বাজারে আইসক্রিম বিক্রি করে, ভুঁইমালী বংশোদ্ভূত এক যুবক কদলপুর হাটে ঔষধের দোকানে বিক্রেতার চাকুরি করে।

যে দুই প্রামাণিক বা পরামানিক পরিবার আছে, সেখানে বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা চার জন। চারজনই ক্ষৌরকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে। নেপাল সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রামাণিক। সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষৌরকর্ম করে। শিশুদের মাথা ন্যাঁড়া করা, মৃত্যুর পর শুদ্ধির কাজ করা, পূজার সময় প্রয়োজনীয় কাজ করা- এসব ক্ষেত্রে নেপালের জুড়ি মেলা ভার। সকলেই চায়, এসব কাজ নেপাল করুক। কিন্তু কখনো কখনো তার একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে-সময় তাকে সাহায্য করে পুত্র সুবল। সুবলও এখন পিতার মতো এ-সব কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছে। সেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষৌরকর্ম করে, কখনো ভিন্ন গ্রামেও চলে যায়। প্রামাণিক বংশের রাম প্রামাণিক ও যদু প্রামাণিক দুই ভাই। তারা রজমান আলী হাটে ক্ষৌরকর্ম করে। প্রতিদিন সকালে তারা হাটে গিয়ে অস্থায়ী সেলুনে বসে, চুল কাটে, দাড়ি কামায়।

সামাজিক মর্যাদায় প্রামাণিকরা নিচুতে অবস্থান করলেও তাদের ভূমিকা ছাড়া উচ্চ-বর্ণের অথবা নিম্ন-বর্ণের কোনো হিন্দুরই ধর্মীয় বা সামাজিক কাজ শুদ্ধ হয় না। তাই অন্য নিম্ন-বর্ণের তুলনায় প্রামাণিকদের অবস্থা খানিকটা উঁচুতে। এ কারণে সকলের কাছেই তাদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তারা উচ্চ-বর্ণের বাড়িতে যায়, রান্না ঘরে প্রবেশ করে, এমনকি তাদের দেওয়া খাবার উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা গ্রহণ করে। তবে ব্রাহ্মণরা প্রামাণিকসহ কোনো নিম্ন-বর্ণের দেওয়া খাবারই গ্রহণ করে না।

কদলপুর গ্রামে মাত্র এক ঘর রজকদাস বা ধোপার বাস। এই পরিবারে বয়স্ক পুরুষ আছে একজনই, নাম তার অধীর রজকদাস। অধীর রজকদাস জামা-কাপড় কেচে ও ইস্ত্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাড়িতে জামা-কাপড় কাচার বিশেষ ব্যবস্থা করে নিয়েছে অধীর। কোনো কোনো পারলৌকিক কাজে ধোপার প্রয়োজন হয়। এটা উচ্চ-বর্ণের হিন্দু, নিম্ন-বর্ণের হিন্দু, এমন কি নমশূদ্র হিন্দুদের বেলায়ও প্রযোজ্য। প্রামাণিকদেরও প্রয়োজন হয় নমশূদ্রদের পারলৌকিক কাজে। দেখা গেছে, নমশূদ্রদের মধ্যে প্রামাণিক বা রজকদাস না থাকায় নিম্নবর্ণের প্রামাণিক ও রজকদাসদের দিয়েই তাদের কাজ চালাতে হয়। এ-ক্ষেত্রে

বর্ণগত ভিন্নতার কথা কেউ কখনো বলে না। এ ব্যাপারে শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান- ধর্মীয়ভাবে এটা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা চলে আসছে। তার মতে অর্থনৈতিক কারণেই হয়তো নিম্ন-বর্ণের প্রামাণিক বা রজকদাস নমশূদ্র পাড়ায় গিয়ে কিছু পারলৌকিক কাজ করে থাকে।[২৭]

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পরিবারের কেউ মারা গেলে ৩০ দিন পরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতো। ইদানীং কেউ কেউ ১১ বা ১৩ দিনেও অনুষ্ঠান করে। কিন্তু নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ৩০ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কোনো বিধান নেই। সকলেই হয় ১১, নয়তো ১৩ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উচ্চ-বর্ণের হিন্দু এবং নমশূদ্রদের নিমন্ত্রণ করা হয়। দেখা গেছে, উচ্চ-বর্ণের এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দু একাসনে বসে আহার করলেও, নমশূদ্ররা ভিন্ন স্থানে উপবেশন করেছে। এমনকি পরিবেশনকারীও আলাদা। যে ব্যক্তি উচ্চ-বর্ণের হিন্দু বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর আসরে খাবার পরিবেশন করে, সে কখনোই নমঃশূদ্রদের খাবার দিতে যায় না। এটা জাতিবর্ণের কুফল বলেই অনেকে মনে করে।

প্রায় চার যুগ পূর্বে 'দাস' পরিবারের এক সদস্য নিজের পদবী রাতারাতি বদলিয়ে তালুকদার পদবী গ্রহণ করে। প্রথমে গ্রামের কেউ এটা গ্রহণ করেনি। কিন্তু ক্রমে সবাই তার পরিবারকে মেনে নিয়েছে। সেই ব্যক্তি মারা গেলেও তার বংশধররা এখন তালুকদার পদবীতে পরিচিত এবং তারা উঠে গেছে উচ্চ-বর্ণের স্তরে। এভাবে কদলপুর গ্রামে শ্রীনিবাস-উচ্চারিত 'সংস্কৃতায়ন' প্রত্যয়ের উপস্থিতিও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

নমশূদ্র

কদলপুর গ্রামে মোট ৮ পরিবার নমশূদ্র হিন্দুর বাস। এই ৮ পরিবারে মোট ৫২ জন সদস্য রয়েছে, যা গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২.৫৩ ভাগ। নমশূদ্ররা সামাজিক মর্যাদার সবচেয়ে নিচে অবস্থান করে। উচ্চ-বর্ণের বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর তুলনায় জন্ম, বিয়ে বা মৃত্যু-উত্তর পারলৌকিক কাজে নমশূদ্রদের মাঝে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

নমশূদ্র পুরুষ নানা ধরনের কাজ করে, যে-সব কাজ সমাজে সম্মানিত বলে মনে করা হয় না। এরা কৃষিকাজ করে, বাজারে মাছ বিক্রি করে, শামুক দিয়ে চুন তৈরি করে, রিক্সা ও ভ্যান চালায়, ঘর তৈরি করে, পানের বরজে পান চাষ করে। নমশূদ্র পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখায় মোটেই উৎসাহী নয়। অভিভাবকেরাও এ দিকে তেমন একটা নজর দিতে চায় না। কিশোর বয়সেই তাদের কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আর্থিক সচ্ছলতার আশায়। অধিকাংশ নমশূদ্রই আর্থিকভাবে খুব দুর্বল। এজন্য তাদের খাবারের অবস্থা ভালো নয়, পোষাক-পরিচ্ছদও অতি সাধারণ। বাড়িতে পুরুষেরা ধুতি পরে থাকে, কাজেও যায় ধুতি পরে, শরীরের ওপরের অংশে কিছু নাই বললেই চলে। পরিবারের নারী সদস্যরা নানা রকম কাজ করে আর্থিক অসহায়তা কাটানোর চেষ্টা করে। দু'জন গৃহবধূ উচ্চ-বর্ণের দুই হিন্দুর বাড়িতে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে, রান্নার কাঠ সরবরাহ করে, থালা-বাসন ধুয়ে দেয়। নমশূদ্র পরিবারের নারী সদস্যরা অল্প দামের শাড়ি পরিধান করে।

নমশূদ্রদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ ও আন্তঃআহার চালু রয়েছে। অন্য বর্ণের কারো সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ। তবে কোনো নমশূদ্র যদি উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের কোনো পুরুষ বা নারীকে বিয়ে করে, সমাজে সেটা গর্বের সঙ্গে দেখা হয়। বিয়ের সময় বরকনের বাড়িতে এলে প্রথমেই বরের পা জল দিয়ে ধোয়ানো হয়; তারপর কনে তার মাথার চুল দিয়ে বরের পা মুছে দেয়। উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মতো বিয়ের পরের রাতে স্বামী-স্ত্রীর মুখদর্শন না করার বিধান নমশূদ্রদের মাঝেও প্রচলিত আছে।

আমরা যে তিন পর্যায়ে কদলপুর গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধানের কাজ সমাধা করেছি, সে-সময়ে কোনো নমশূদ্রের মৃত্যু হয় নি। ফলে মৃত্যু-উত্তর পারলৌকিক কর্ম নমশূদ্ররা কীভাবে পালন করে, আমাদের পক্ষে তা পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয় নি। তবে বয়োজ্যষ্ঠ নমশূদ্র হারাধন মণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যা জেনেছি, তা উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের অনুরূপ বলে মনে হয়েছে। নমশূদ্ররাও আমকাঠ দিয়ে মরদেহ পোড়ায়, দাহশেষে সকলে পুকুরে স্নান করে বাড়ি ফেরে, পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে নেয়।[২৮]

নমশূদ্ররা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে যেতে পারে। অবশ্য তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকে। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর বাড়িতে পূজা-পার্বণে তারা অংশগ্রহণ করে, কিন্তু মন্দিরে উঠতে পারে না। তাদের দেওয়া অন্ন উচ্চ-বর্ণের বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা গ্রহণ করে না। তবে জল, ফল এবং মিষ্টিদ্রব্য তারা গ্রহণ করে। একই ধরনের বিধান আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী লক্ষ্য করেছেন ঢাকা জেলার মেহেরপুর গ্রামে।[২৯] বর্তমানে নানামাত্রিক পরিবর্তনের ফলে নমশূদ্রদের মাঝে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, পরিবর্তন দেখা দিয়েছে উচ্চ-বর্ণের হিন্দু কিংবা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মাঝেও। খাবার-দাবারের বাধা-নিষেধ এখন প্রায় উঠে গেছে। বিশেষত তরুণসমাজ এখন আর এ-সব বাধা মানে না। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় নমশূদ্র বর্ণ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী কে. এস. সিং- এর ভাষ্য-

> At present there are no restrictions on accepting or exchanging water and food with neighbouring communities. They can visit the same religious places, share sources of water, and also take part in festivals along with other communities. Cultivator-labour relationships, commercial links with other communities, and also modern intercommunity linkages, are forged and perpetuated.[৩০]

অনেক নমশূদ্র পরিবারের পূর্বপুরুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল শিকার। এখন ব্যাধবৃত্তি উঠে গেছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন পরিবার। কিন্তু বসতবাটির পরিমাণ অভিন্ন রয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের মধ্যে অনেক নমশূদ্রকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

কদলপুর গ্রামের হিন্দুদের মাঝে ক্রিয়াশীল জাতিবর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে এইকথা বলা যায় যে, এখনো এই গ্রামে জাতিবর্ণের শাসন অনেকাংশে অক্ষুণ্ন রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সনাতন ধারণার জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কদলপুর গ্রামেও আজ আর খুঁজে

পাওয়া যাবে না। নানামাত্রিক পরিবর্তনের ফলে জাতিবর্ণ ব্যবস্থাও আজ বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে, গ্রহণ করছে নতুন নতুন রূপ।

মুসলিম সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব

কদলপুর গ্রামে মোট ৭টি মুসলিম পরিবারের বাস- এই সাত পরিবার মিলে মুসলিম জনসংখ্যা ৪১ জন, যা গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮.৮২ ভাগ। সাত পরিবার মুসলিমের মধ্যে কাজী বংশোদ্ভূত দুই পরিবার মুসলিম অভিজাত বা খান্দানী মর্যাদার; বাকি পাঁচ পরিবার মুসলিম মোল্লা বংশোদ্ভূত নিম্নস্তরের তথা দিনমজুর। নিম্নস্তরের বা আতরাফ মর্যাদার দিনমজুরকে কদলপুর গ্রামে গৃহস্থ নামে আখ্যায়িত করা হয়। ধর্মীয় বিধান অনুসারে মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুরূপ জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রচলন নেই। তবে পাশাপাশি অবস্থানের কারণে হিন্দু জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব পড়েছে মুসলিম সমাজের ওপর। কোনো মুসলিমকে বলা হয় আশরাফ বা খান্দানী; আবার কাউকে বলা হয় আতরাফ বা গৃহস্থ। বস্তুত এই বিভাজনের মাঝেই লুকিয়ে আছে হিন্দুধর্মের অদৃশ্য জাতিবর্ণ ব্যবস্থার ছায়া। এ প্রসঙ্গে এ. কে. নাজমুল করিমের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য-

> It is difficult to determine the nature of social stratification among the Bengali Muslims during the nineteenth century. The traditional 'fanciful' fourfold classification of the Muslim society in imitation of the four main Hindu caste divisions does not describe the character of the Muslim social structure. ...In Bengal, on conversion to Islam from the Hindu social order most of the converts assumed the title Sheikh, and others (who migrated to Bengal from outside or were converted earlier) according to convenience and their economic and social status, began to claim to be Syeds, Mughals or Pathans. ...It seems that if we classify the Bengali Muslims of the nineteenth century into : (i) *Ashraf* or *Sharif,* and (2) *Atraf* or *Ajlaf* we would possibly get a better pictuer of the nature of social stratification among them. Generally speaking, the *Ashraf* or the landed gentry claimed noble ancestry, while the *Atraf*, or the toiling masses and peasant proprietors could not lay any such claim to noble ancestry.[৩১]

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী উল্লেখ করেছেন মুসলিম সামাজিক স্তরবিন্যাস হিন্দুর চতুর্বর্ণ অনুসরণেই সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জে. ডি. কানিংহাম-এর অভিমত উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন- "The Mohomedans of India fancifully divided themselves into four classes, after the manner of the Hindus, viz, Syeds, Shekhs, Moghuls, and Puthans."[৩২] উইলিয়াম ক্রুক-ও অবশ্য মুসলিমদের সামাজিক স্তরবিন্যাসকে হিন্দুদের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার অনুসরণ বলেই বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে-

> In fact, to such an extent does the Hindu idea of a fourfold social division prevail, that is : Brahman, Kshatriya, Vaishya and Sudra, that in some parts of the country converts to Islam consider that they are bound to enrol themselves as either Sayyid, Shaykh, Mughal, or Pathan.[৩৩]

তবে সকলেই এ মত স্বীকার করেননি। অনেক সমাজ-নৃবিজ্ঞানীই বলেছেন যে, মুসলিম সামাজিক স্তরবিন্যাস হিন্দু বর্ণাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মুসলিমদের মধ্যে বংশানুক্রমিক কোনো পেশা নির্ধারিত নেই। ধন-সম্পদের অধিকারী হলেই যে-কেউ সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সচলতার (Social Mobility) ধারা হিন্দুদের থেকে ভিন্নতর। মুসলিমদের মধ্যে ব্যক্তিগত সামাজিক সচলতার প্রচলন রয়েছে এবং এখানে নেই শুচি-অশুচি বা পবিত্রতা-অপবিত্রতার (Purity and Pollution) প্রশ্ন। এসব কারণে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিমদের সামাজিক স্তরবিন্যাস হিন্দুদের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অনুরূপ নয়; বরং তা স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছে।[৩৪]

কদলপুর গ্রামের কাজী বংশ অভিজাত খান্দানী মুসলিম। পার্শ্ববর্তী মোল্লাদের সঙ্গে আন্তঃআহার থাকলেও দুই বংশের মধ্যে আন্তঃবিবাহ চলে না। এটা ইসলামের কোনো ধর্মীয় বিধান নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণ আঞ্চলিক। শিক্ষিত এবং বিত্তবান হলে যে-কোনো মুসলমান সমাজে নিজেকে খান্দানী বলে জাহির করতে পারে। কিন্তু হিন্দুসমাজে প্রচলিত ধর্মীয় বিধানে তা সম্ভব নয়। কাজীরা বর বা কনে সংগ্রহ করে অন্য অঞ্চল থেকে। কাজী শাহ আলমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন-

> ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি আমরা খান্দানী আর মোল্লারা নিচু জাতের। ওদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হয় না। তবে অন্যসব সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনো পার্থক্য নেই যেমন আহার, মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা, মসজিদে একসঙ্গে নামাজ আদায় করা ইত্যাদি।[৩৫]

কাজী বংশের মুসলিমরা শিক্ষিত এবং ভূ-সম্পত্তির মালিক। কাজী শাহ আলম স্নাতক পাস করে গ্রামেই বাস করছেন। জমিজমার আয় থেকেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। তার ভাই কাজী দিদারুল আলম এম. এ. পাস করে চট্টগ্রাম শহরে চাকরি করেন। তিনি মাঝে মাঝে গ্রামে আসেন, তবে স্থায়ীভাবে বাস করেন না। কাজী শাহ অলম কদলপুর গ্রামে সম্মানিত ব্যক্তি। চারিত্রিক গুণের কারণে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। 'কদলপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি' পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেন। গ্রাম্য সালিস বা এ ধরনের কাজে কাজী শাহ আলম সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

কদলপুরবাসী সকলেই কাজী বংশের দুই মুসলিম পরিবারকে খান্দানী মুসলিম হিসেবেই মান্য করে। খান্দানী মুসলিমদের সমাজে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়। কেননা, তাদের শিক্ষা আছে, জমিজমা আছে, সমাজে আছে গ্রহণযোগ্যতা। প্রসঙ্গত আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর অভিমত উল্লেখ করা যায়। খান্দানের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-

> A *khandan* is he who is long associated with ownership and control of land and has at least some education and who can be distinguished from the *girhastas* and *kamlas* by a particular style of life.[৩৬]

খান্দানী মুসলিমরা মাঠে কাজ করে না, নিজেরা বাজার-পণ্য বহন করে না। খান্দানী বংশের নারীরা বোরকা পরিধান না করে বাইরে যায় না। অতীতে এ বংশের মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর আর স্কুল-কলেজে যেত না। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কাজী শাহ আলমের কন্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, দিদারুল আলমের দুই যমজ কন্যা রাউজান কলেজে পড়ালেখা করে। লক্ষণীয় তারা গ্রামে এলে বোরকা ছাড়া চলাফেরা করে না, কিন্তু কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরকা পরিধান করে না। এ বিষয়ে কাজী শাহ আলমের কন্যাকে প্রশ্ন করলে সে জানায়,

> গ্রামে সবাই আমাকে চেনে। গ্রামবাসী আব্বাকে খুব মান্য করে। এখানে যদি বোরকা ছাড়া রাস্তায় বের হই, তাহলে সেটা আব্বার অপমান হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আলাদা। সেখানের পরিবেশ ভিন্ন। আর একটা কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরকা পড়লে অনেকেই নেতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে তাকায়।[৩৭]

কাজী শাহ আলম এবং কাজী দিদারুল আলমের পূর্ব-পুরুষের অনেক সম্পদ ছিল, ছিল অনেক জমিজমা। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে অর্থনৈতিক চাপে পরিবারের জমিজমা কমতে থাকে। পারিবারিক কাজে টাকার প্রয়োজন হলে পরিবারদ্বয় কিছু জমি বিক্রি করেছে। জমি বিক্রি করে এরা দুই ভাই কদলপুর এবং পার্শবর্তী পূর্ব-গুজরা ও উত্তর-গুজরা গ্রামের মুসলিমদের অনুরোধে একটি মসজিদ স্থাপন করেছে। এখন এই মসজিদে শুক্রবারে কদলপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে মুসলিমরা এসে নামাজ আদায় করে।

কদলপুর গ্রামের গৃহস্থ বা নিম্নস্তরের মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। মোল্লা বংশোদ্ভূত নিম্ন-মর্যাদার গৃহস্থরা প্রধানত কৃষি-শ্রমিক। তারা মাঠে কাজ করে, ভ্যান চালায়, বাজারে তরি-তরকারি বিক্রি করে। একজন গৃহস্থ যুবক চট্টগ্রাম শহরের এক আবাসন কোম্পানিতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। সপ্তাহে একবার সে বাড়ি আসে, তার পরিবার-পরিজন বাস করে কদলপুরেই। খান্দানী মুসলমানদের সঙ্গে গৃহস্থ মুসলমানদের অনেক দিকেই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চাল-চলন, রুচি ও সংস্কৃতি- যে-কোন দিকেই খান্দানী মুসলমানদের মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। খান্দানী মুসলমান পুরুষ পাজামা-পাঞ্জাবী পরিধান করে, মাথায় টুপি পরে; পক্ষান্তরে গৃহস্থ ঘরের পুরুষ পরিধান করে লুঙ্গি-গেঞ্জি। খান্দানী মহিলারা শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট পরে, অন্যদিকে গৃহস্থ নারী কেবল শাড়ি পরে। কাজী বংশের কোনো নারী বাইরে গেলে অবশ্যই বোরকা পরিধান করে, গৃহস্থ নারীর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা নেই বললেই চলে। খান্দানী মুসলিম নিজেদের মধ্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও, প্রয়োজনে তারা প্রমিত বাংলায়ও কথা বলতে পারে। কিন্তু গৃহস্থ মুসলিম প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারে না। নিম্ন-মর্যাদার মানুষদের মধ্যে প্রমিত বাংলা বলার এই সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের সকল গ্রামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কদলপুরের নমশূদ্রদের সঙ্গে মুসলিম গৃহস্থদের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নমশূদ্ররাও প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারে না। লেখাপড়ার অভাবই এর

মূলে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে; বাড়িতে বাইরের কেউ এলে তার সঙ্গেও গৃহস্থরা কথা বলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়। খান্দানী বাড়িতে গৃহস্থ এলে ঘরে প্রবেশ করে, রান্নাঘরে যায়; তবে পানি চাইলে স্বতন্ত্র গ্লাসে পানি পাবে, যে গ্লাসে খান্দানী পরিবারের কেউ পানি পান করে না।

গৃহস্থ পরিবারে শিক্ষার জন্য তেমন আগ্রহ নেই। ছেলে-সন্তান বড় হলেই মাঠের কাজে নিয়োজিত হয়; পক্ষান্তরে মেয়েদের বয়স আঠারো পৌঁছার অনেক পূর্বেই বসতে হয় বিয়ের আসনে। গ্রামের গৃহস্থ পরিবারের তিনটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিন্ন চিত্র খুঁজে পাই কদলপুর গ্রামের নমশূদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝেও।

গৃহস্থ ঘরের নারীরা খুবই পরিশ্রমী। তারা বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখে, রান্না-বান্না করে, সন্তান প্রতিপালন করে, কখনো-বা মাঠে গিয়ে স্বামীকে সাহায্য করে। গ্রামের গৃহস্থ বধূরা কোনো ধরনের চাকরি করার কথা কল্পনাও করে না। আহার, পরিশ্রম আর নিদ্রাকেই তারা জীবন বলে জানে ও মানে।

মুসলিমদের মধ্যে নাপিত বা ধোপা সম্প্রদায় নেই। তবে সময় বদলেছে। এখন অনেক মুসলিমই প্রয়োজনের তাগিদে এই দুই পেশা গ্রহণ করেছে। অবশ্য গ্রামের চিত্র একেবারে ভিন্ন। কদলপুর গ্রামের প্রামাণিক আর রজকদাসই মুসলিম পাড়ায় যায় এবং প্রয়োজনীয় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। এটাকে কেউ ধর্মবিরোধী বা জাতিবর্ণের ধারণা বহির্ভূত কাজ বলে মনে করে না।

পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে মুসলিম সমাজের স্তরবিন্যাসে হিন্দুদের জাতিবর্ণের প্রভাব পড়েছে। তবে হিন্দুদের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রভাবেই যে মুসলিম সমাজের স্তরবিন্যাসে চারটি পৃথক মর্যাদা গোষ্ঠীর (শেখ, সৈয়দ, মোঘল ও পাঠান) সৃষ্টি হয়েছে, একথা যথার্থ নয় বলে সমাজ-নৃবিজ্ঞানীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ. কে. নাজমুল করিম মনে করেন- বাংলাদেশের মুসলিম স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি হলো বংশ বা খান্দান। ই. গেইল-ও অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।[৩৮] কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিম স্তরবিন্যাসের ভিত্তি হল কাল্পনিক বংশমর্যাদা বা খান্দানী বা শরাফতী। বিত্তই হল মুসলিম স্তরবিন্যাসের প্রধান নিয়ামক; একজন ব্যক্তি বিত্তবান হলে সে তার সামাজিক মর্যাদা নানাভাবে বদলাতে পারে, যেটা হিন্দু বর্ণপ্রথায় কখনোই সম্ভব নয়।৩৯ পক্ষান্তরে এম. এন. শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ন প্রত্যয় দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, হিন্দু জাতিবর্ণ ব্যবস্থাতেও একজন মানুষ তার সামাজিক মর্যাদা-ভিত্তি পাল্টে দিয়ে উচ্চ-বর্ণে উত্তীর্ণ হতে পারে। আমাদের ধারণায় কাল্পনিক বংশমর্যাদা, ধন-সম্পদ, সামাজিক গতিশীলতা, শিক্ষা এবং হিন্দু চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা- এ সবের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তরক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস, যার কিছুটা পরিচয় আমরা কদলপুর গ্রামে লক্ষ্য করেছি।

জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন-প্রবণতা

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি। অতীতের এই ব্যবস্থার কঠোরতা এখন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। বহু সামাজিক সংস্কার ও প্রগতিশীল আন্দোলনের ফলে জাতিবর্ণের কড়াকড়ি আজ অনেকটা কমে এসেছে। শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ন তত্ত্ব এই কথা প্রমাণ করেছে যে, জাতিবর্ণের জন্মগত পরিচয় আজ আর সর্বাংশে সত্য নয়। যে-সব কারণে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা একালে হীনবল হয়ে পড়েছে, সেগুলো শনাক্ত করা যায় এভাবে- শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা, আধুনিক আইন ব্যবস্থা ইত্যাদি। কে. সিং জাতিবর্ণ ব্যবস্থার শিথিলতা ও তার বর্তমান প্রবণতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যা বলেছেন, এখানে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-

> The caste system in the modern age has undergone several changes. These changes are to be seen in the form of new trends. The trends that are visible in the caste system are of the following types—
> 1. Decline of caste supremacy;
> 2. Equality among all castes;
> 3. Relaxation in restrictions on food and drink;
> 4. Weakening of the restrictions relating to marriages;
> 5. Changes in the occupational pattern;
> 6. Improvement in the position of lower castes.[৪০]

সামাজিক গতিশীলতা ও শিল্পায়নের ফলে পেশাভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। জন্মসূত্রে যে পেশাদার গোষ্ঠী জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য বহন করতো, আজ সে ধারণায় মৌল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যন্ত্রশিল্পের বিকাশ, তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন এবং বিশ্বায়ন জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে ফেলে দিয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে।[৪১] সনাতন পেশাদার গোষ্ঠী আজ আর বংশানুক্রমিক পেশায় টিকে থাকতে পারছে না। বংশানুক্রমিক পেশায় অবস্থান করলে অনেকের জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই অনেকেই পরিত্যাগ করছে বংশানুক্রমিক পেশা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ- বর্তমানে ধাঙ্গড়, রজক, পরামানিক, ধীবরের পেশায় অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের হিন্দু- এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও আসতে বাধ্য হচ্ছে। নতুন নতুন শহর পত্তনের ফলে পেশা-পরিবর্তন এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

অতীতে নিচু বর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের শাসন-শোষণকে নির্বিচারে মেনে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মানুষকে সেবা করার জন্যই তাদের জন্ম- এই ছিল নিম্ন-বর্ণের মানুষের বদ্ধমূল ধারণা। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তারা মেনে নিয়েছে সংখ্যালঘিষ্ঠের শোষণ-নির্যাতন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় উপমহাদেশের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট সংগঠক ও তাত্ত্বিক বি. টি. রণদিভের বিশ্লেষণ-

> হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিচু স্তরের বা নিচু জাতের মানুষরাই প্রকৃত পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা কেন জাতপাতের বৈষম্যের কলঙ্কমোচন করতে পারলেন না? কেন

> তাঁরা পারলেন না, কিছু ব্রাহ্মণ কিংবা উঁচু জাতবর্ণের মানুষদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে? বাস্তব সত্য হচ্ছে, জাতবর্ণ বিভাজনের শিকার যারা, তাঁদের নিজেদের মধ্যে জাতবর্ণ বিভাজনের বিষটা যে গভীরভাবে ঢুকে গেছে। তাঁরাও যে আবার বিভক্ত হয়ে পড়েছেন বেশ কিছু জাতবর্ণে। সেই সব জাতবর্ণ আবার বিভক্ত হয়েছে আরও তলার থাকের জাতবর্ণে। নিচু স্তরের জাতবর্ণের সব মানুষই হাড়ে হাড়ে বুঝছেন, উঁচু জাতবর্ণের মানুষদের হাতে তাঁদের কিরকম অন্যায় আচার-আচরণ পেতে হয়েছে, কিন্তু ওঁদের নিজেদেরই ভেতরকার উঁচু থাকের মানুষরা তাঁদের তলার থাকের মানুষদের ওপরে যে-সব অন্যায় আচার-আচরণ করে থাকেন, তার প্রতিবিধান করতে তো প্রস্তুত নন।[৪২]

বি. টি. রণদিভে যা বলেছেন, এখন সে-অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। জাতিবর্ণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ ভারতের নানা অঞ্চলে চলছে সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই। সে লড়াইয়ে ক্রমশ যুক্ত হচ্ছে নিম্ন-বর্ণের অধিকারবঞ্চিত মানুষেরা। মহাত্মা গান্ধী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন অস্পৃশ্যতা প্রথার বর্জন, আবার চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন। তিনি বলেছেন, চতুর্বর্ণের চেয়ে আরো সুসমন্বিত ব্যবস্থা কল্পনা করা শক্ত। কোনো জাতের উৎকৃষ্টতা বা কোনো জাতের অপকৃষ্টতা জাত ব্যবস্থার গূঢ়ার্থ নয়।[৪৩] কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা শুনি ভিন্ন কথা। রামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ শিষ্য বিবেকানন্দ একই সঙ্গে ধর্মবেত্তা এবং সমাজতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তাই অধ্যাত্ম সাধনায় নিরত থেকেও তিনি অকপটে বলতে পারেন নিম্ন-বর্ণের মানুষের সামূহিক জাগরণ বিষয়ক এই ইতিবাচক সম্ভাবনার কথা-

> প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী মূল উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনের সমূহ ফল থেকে বঞ্চিত এবং বাধ্যতামূলক মজুরিশ্রম বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো মতে বাঁচার তপস্যায় নিয়োজিত। শূদ্র শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের প্রকৃতিও তাই। এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় : শূদ্ররা একটা শোষিত শ্রেণী। কিন্তু তাঁরা চিরকাল শোষণের শিকার হন না। তাঁরাও এক সময় শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হন : মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়- পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), এবং মজুর (শূদ্র)। ...সর্বশেষে শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হবে- শূদ্র যুগ আসবেই আসবে- এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।[৪৪]

'তথাকথিত নিচুজাত বলে কিছু নেই প্রকৃত হিন্দু ধর্মে।'- এই দাবি উচ্চারণ করে যারবেদা কারাগারে আমরণ অনশন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, পঁচাত্তর বছর পূর্বে। তারপর গঙ্গা-পদ্মায় বহু জল গড়িয়েছে, কিন্তু জাতিবর্ণ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়নি। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বহুমুখী পরিবর্তন ঘটেছে, তবু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার পথে, এমন ভাবার কোনো অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কে. এস. সিং-এর ভাষ্য-

> Thus in recent years caste-system has changed its patterns. Restrictions that went with the caste sometimes ago are getting relaxed. In spite of it, it cannot be said that the caste system has come to an end. It will undergo further change in future. It will disintegrate only when the democratic values get deep rooted and the country makes good deal of economic progress and industrial advancement then new economic and political structure will emerge and it will change the pattern of the caste system.[৪৫]

জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সাম্প্রতিক প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা শেষে কদলপুর গ্রামের দিকে তাকালে কী দেখতে পাবো আমরা? ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাতিবর্ণের সনাতন ধারণা কদলপুর গ্রামে অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। নানা বর্ণের মধ্যে এখন বিয়ে হচ্ছে, বংশানুক্রমিক পেশা পরিত্যাগ করে অনেকেই ইচ্ছা মতো নতুন কোন পেশার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। আন্তঃআহারও আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুব সম্প্রদায় জাতিবর্ণের বিধি-নিষেধকে গ্রাহ্য করতে চায় না। বেঁচে থাকার জন্য নিম্ন-বর্ণের হিন্দু কিংবা নমশূদ্ররা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করছে।

কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণের পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নারী সমাজের ওপর। জাতিবর্ণে নারীর অস্তিত্ব প্রবলভাবে অস্বীকৃত। এ প্রেক্ষাপটে কদলপুর গ্রামের নারীসমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তারা ক্রমশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার অর্থই হলো জাতিবর্ণের শেকড়ে কুঠারাঘাত হানা। গ্রামের দুঃস্থ নারী-পুরুষকে নৈশ বিদ্যালয়ে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়েও সনাতন বর্ণ ব্যবস্থার মূলে আঘাত হানা হয়েছে।

নমশূদ্র পাড়াতেও লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। অনেকেই এখন বংশানুক্রমিক পেশা পরিত্যাগ করে নতুন পেশায় অভ্যস্ত্ম হয়ে উঠেছে। বিয়ের ক্ষেত্রেও খানিকটা শিথিলতা এসেছে। এখন ভিন্ন বর্ণের নারী-পুরুষের মধ্যে মাঝে মাঝে বিয়ে হচ্ছে। তবে মুসলিম পাড়ায় ভিন্ন ছবি। সেখানে খান্দানী বংশের সঙ্গে গৃহস্থ ঘরের ছেলে বা মেয়ের বিয়ে কল্পনাও করা যায় না।

বিয়ে, শ্রাদ্ধ বা এ-ধরনের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আন্তঃআহারের ধারণাও এখন বদলে গেছে। এখন হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ এক আসরে বসে এক অন্ন গ্রহণ করে থাকে। কদলপুর গ্রামে এই দৃশ্য দেখে আমরা গর্ব অনুভব করেছি। সরকার পাড়ায় শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সরকার-বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপে দুর্গাপূজার সময় দেখেছি, পূজার আনন্দে বর্ণ-ব্যবস্থার সব বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।

এতসব পরিবর্তন ঘটেছে, তবু একথা কি বলা যাবে- বর্ণ ব্যবস্থা কদলপুর গ্রামে নেই? না, সেকথা বলা সম্ভব নয়। এখনও এ গ্রামের মানুষ নানা অনুষঙ্গে বর্ণ-ব্যবস্থার কঠিন শাসন মেনে চলে। যে-মানুষ আজ সামাজিক সচলতার কথা বললো, দেখা গেল আগামী কালই সে নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে হয়ে উঠেছে ঘোরতর বর্ণবাদী। বর্ণব্যবস্থা মিশে আছে গ্রামবাসীদের মর্মে সত্তায় স্মৃতিতে। প্রসঙ্গত ভি. এস. নাইপল-এর একটি স্মৃতি-অনুষঙ্গ দিয়ে আমরা এ আলোচনার সমাপ্তি টানতে পারি। নাইপল লিখেছেন-

> Men might rebel ; but in the end they usually make their peace. There is no room in India for outsiders. The Arya Samaj, the Aryan Association, a reformist group opposed to traditional ideas of caste, and active in north India earlier in the century, failed for a simple reason. It couldn't meet the marriage needs of its members ; India called them back to the castes and

rules they had abjured. And five years ago in Delhi I heard this story. A foreign businessman saw that his untouchable servant was intelligent, and decided to give the young man an education. He did so, and before he left the country he placed the man in a better job. Some years later the businessman returned to India. He found that his untouchable was a latrine-cleaner again. He had been boycotted by his clan for breaking away from them; he was barred from the evening smoking group. There was no other group he could join, no woman he could marry. His solitariness was insupportable, and he had returned to his duty, his *dharma*; he had learned to obey.[৪৬]

তথ্যনির্দেশ

১. কদলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৯.১২.২০০৬।

২. কদলপুর গ্রামের প্রবীণ অধিবাসী শ্রীবীরেন্দ্রলাল দত্ত (সম্প্রতি লোকান্তরিত) জানিয়েছেন যে, ব্রিটিশ আমল থেকে গ্রামের মূল রাস্তাটিকে কেন্দ্র করে মন্দিরের পাশে উত্তরায়ণের মেলা বসে থাকে। মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে দোকানি ও ক্রেতারা উপস্থিত হয়। কেনা-বেচা চলে নানা ধরনের খাবার ও লোকপণ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১০.০১.২০০৭।

৩. এ প্রসঙ্গে ড. এ. কে. নাজমূল করিমের বিশ্লেষণ স্মরণ করা যায়। তিনি লিখেছেন- শ্রেণিহীন সমাজ বলে দাবি করলেও মুসলমান সমাজের মধ্যে উনিশ শতক থেকে আশরাফ ও আতরাফ- এই অদৃশ্য শ্রেণিবিন্যাস চলে আসছে বাংলার মুসলমান সমাজে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন- A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society,* (New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1980), pp. 47-69

৪. শ্রীকানাইলাল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। কানাইলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৯.১১.২০০৮।

৫. অপরাহ্নে মগধেশ্বরী মন্দিরের পাশে প্রশস্ত একটি জায়গায় আড্ডারত যুবকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি, খেলার কোনো মাঠ না থাকার জন্যই তারা রাস্তার পাশে বসে সময় কাটায়। কদলপুর তরুণ সঙ্ঘের স্থায়ী কোনো কার্যালয় না থাকায় রাস্তায় বসেই তারা সভা করে, সঙ্ঘের কার্যাবলি পরিচালনা করে। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীগোবিন্দ সরকার, সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজিত তালুকদার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রীস্বপন সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানা গেছে। শ্রীগোবিন্দ সরকার, শ্রীঅজিত তালুকদার এবং শ্রীস্বপন সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮.১২.২০০৮, ২০.১২.২০০৮ এবং ২১.১২.২০০৮।

৬. কদলপুর গ্রামের দরিদ্র মহিলারা গঠন করেন 'কদলপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি'। সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী ছবি রানী চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মিনতি রানী দে। এক সাক্ষাৎকারে (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১১.১২.২০০৮) শ্রীমতী মিনতি রানী দে আমাকে জানিয়েছেন যে, এখন সমিতির সদস্য ৪৯ জন। সমিতির সদস্যরা এককালীন সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা ঋণ নিতে পারেন। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে অনেকেই আর্থিকভাবে এখন ক্রমশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। গ্রামের দুঃস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সমিতি নানা

উদ্যোগ নিয়েছে। যারা অক্ষরজ্ঞানহীন তাদের জন্য সমিতি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে। সরকার পাড়ার শ্রীনারায়ণচন্দ্র সরকারের বাড়িতে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা চলে। নৈশ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমতী করুণা সরকার, শ্রীমতী ছবি রানী চৌধুরী এবং জনাব কাজী শাহ আলম।

৭. শ্রীরতন তালুকদার জানিয়েছেন যে, বর্ষাকালে গরু-ছাগল পালনের মতো কোনো জায়গা নেই কদলপুর গ্রামে। রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে গবাদি পশু সেখানে নেওয়া যায় না। গবাদি পশুগুলোকে বসতবাড়িতেই রাখতে হয়। দরিদ্র মানুষের বসতবাড়ির অবস্থা ভালো নয়, ফলে তাদের পক্ষে গবাদি পশু প্রতিপালন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৭. ১২. ২০০৮।

8. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন- মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০০৯), পৃ. ৫৫০-৫৩

9. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস- আদিপর্ব,* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, দ্বি. সং. ১৪০২), পৃ. ৭০০-০১

10. অনুপম সেন, *"আদি-অন্ত বাঙালি : বাঙালি সত্তার ভূত-ভবিষ্যৎ"*, বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বক্তৃতা, ৩রা ডিসেম্বর ২০০৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭

11. রামকৃষ্ণ মুখার্জী, *বাংলার ছ'টি গ্রাম* (ঢাকা : জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ১৯৯৭), পৃ. ৩৮

12. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বি. সং. ১৯৯৭), পৃ. ২৮

13. কদলপুর গ্রামের মিনতিবালা দাস আমাকে জানিয়েছেন যে, 'ভোগ' হচ্ছে দেবতার প্রসাদ। 'ভোগের' অপমান বা অপবিত্র করা হচ্ছে দেবতাকেই অপমান করা। স্নান সমাপনান্তে তাই ভোগ গ্রহণকালে তারা শুদ্ধ কাপড় পরিধান করে। 'ভোগ' আহার করার পর তারা হাত-মুখ জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেয়। মিনতিবালা আরো জানিয়েছেন যে, রজঃস্বলা অবস্থায় কোনো নারী ভোগ গ্রহণ করে না, মন্দিরে যেতে পারে না- কেননা, ওই অবস্থায় নারী নিজেকে অপবিত্র ভাবে। অপবিত্র দেহ নিয়ে দেবতার কোনো প্রসাদ তারা নেয় না, এমনকি মন্দিরের কাছেও যায় না।

14. কদলপুর গ্রামের মাশ্রাধী ব্রাহ্মণ বিপুল আচার্যের এই করুণ পরিণতির কথা আমাকে জানিয়েছেন তারই প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীসন্তোষকুমার আচার্য। সন্তোষকুমার আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১২. ১২. ২০০৮।

15. দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ৬ই জুন ২০১০। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টটিতে বলা হয়- "সনাতন সমাজে জাত প্রথাজনিত হত্যাকে 'অসম্মানজনক' আচরণের শাস্তি বলে যথার্থতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। জোরপূর্বক বিয়ে ও জাত প্রথাজনিত হত্যা পরস্পর সম্পর্কিত। ভারতে জাত বাঁচানোর অজুহাতে, বিশেষ করে নারীদের জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়েতে রাজি না হলে কিংবা পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতে চাইলে তাদের প্রথমে নির্যাতন করা হয়। তাতেও কাজ না হলে 'সম্মান রক্ষায়' নারীদের হত্যা করা হয় কিংবা নিজেরাই আত্মহত্যা করে থাকে।"

16. Veena Das, *Structure and Cognition : Aspects of Hindu Caste and Ritual* (Delhi : Oxford University Press, 1990), p. 63

17. ভিনা দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
18. রামকৃষ্ণ মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ১১, পৃ. ৩২৮
19. গ্রামের প্রবীণ পুরোহিত শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী জানান যে, গ্রামে উচ্চ-বর্ণের মধ্যে সরকাররা সবার ওপরে আছে। এরপর যথাক্রমে চৌধুরী, দত্ত, দে, এবং তালুকদার। মন্দির স্থাপন, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং সরকার পদবীধারী কয়েকজন ব্যক্তির নেতৃত্বগুণ ঐ বংশটিকে উচ্চ-বর্ণের মাঝে শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে বলে শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী মনে করেন। শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১৭. ১২. ২০০৮।
20. কদলপুর গ্রামের প্রবীণ সদস্য শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত এ-তথ্য আমাকে জানিয়েছেন। শ্রীবীরেন্দ্র দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০. ০১. ২০০৭।
21. শিশুর মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তাকে বলে অন্নপ্রাশন। বাড়িতে বা মন্দিরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রাহ্মণ পূজা দিয়ে নিজ হাতে শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেন। এ অনুষ্ঠানে কখনো কখনো শিশুর নাম চূড়ান্তভাবে রাখা হয়।
22. শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১২.০১.২০০৭।
23. 'কোষ্ঠী' হচ্ছে জন্ম-পত্রিকা। কোষ্ঠীতে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের শুভ-অশুভ সবকিছু লেখা থাকে। একজন ব্রাহ্মণ শিশুর জন্মের সময় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও তিথি বিচার করে 'কোষ্ঠী' তৈরি করেন। উত্তরকালে নানা কাজে এই কোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়।
24. শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৪. ০১.২০০৭।
25. 'শ্রাদ্ধ' হচ্ছে এক ধরনের ধর্মীয় কৃত্যমূলক অনুষ্ঠান। হিন্দু ধর্মমতে মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনায় পিণ্ডদানাদি অনুষ্ঠানের নামই শ্রাদ্ধ। এ অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অন্নাদি দান করা হয়। ভাবা হয়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির আত্মমুক্তি লাভ করে না।
26. এ বিষয়ে তরুণ সঙ্গের সভাপতি শ্রীগোবিন্দ সরকার বলেন- এখন এ-প্রথা মানা আর সম্ভব নয়। সমাজ অনেক অগ্রসর হয়েছে। এখন এই প্রাচীন বিভাজন মানুষ মানতে চায় না। তবে আমরা যতই এটা না মানার চেষ্টা করি না কেন, নমশূদ্ররা নিজেদের সব সময় অধস্তনই ভাবে। শ্রীগোবিন্দ সরকারের সঙ্গে সাক্ষৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২০.০১. ২০০৭।
27. শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৫.০১.২০০৭।
28. হারাধন মণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২২.০১.২০০৭।
29. Anwarullah Chowdhury, *A Bangladesh Village : A Study of Social Stratification* (Dhaka : Centre for Social Studies, 1978), p. 99
30. K. S. Singh, *The Scheduled Caste* (Delhi : Oxford University Press, 1993), p. 17
31. A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society* (Dacca : Nawroze Kitabistan, 1980), pp. 127-28
32. J. D. Cunningham, *A History of the Sikhs* (Calcutta : Sanyal and co, 1903), p. 31
33. William Crooke (editor), *Qarun-i-Islam* by Jafor Sharif (London : Penguin Books, 1921), p. 13
34. এ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন- হেলালউদ্দিন খান আরেফিন, "বাংলাদেশের মুসলিম স্তরবিন্যাসের ধারা", *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা ১৪, ১৯৮৪; সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৩৪-৬৭

35. কাজী শাহ আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৭. ০৪. ২০০৯।
36. Anwarullah Chowdhury, *ibid*, Note no. 29, pp. 87-88
37. কাজী শাহ আলমের কন্যা দিলরুবা সুলতানার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৭. ০৪. ২০০৯
38. E. Gait, *Census of India—1901* (Calcutta, 1902), Vol. 6, part-1, p. 193
39. হেলালউদ্দিন খান আরেফিন, "বাংলাদেশের মুসলিম স্তরবিন্যাসের ধারা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
40. K. Singh, *Social and Cultural Anthropology* (Lucknow : Prakashan Kendra, 1993), p. 213
41. মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ৮, পৃ. ৫৫৩
42. বি. টি. রণদিভে, *জাত বর্ণ শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ১৫
43. বি. টি. রণদিভে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯
44. স্বামী বিবেকানন্দ, *জাতি, সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র* (কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৬), পৃ. ৫৮
45. K. Singh, পূর্বোক্ত, note No. 40, p. 215
46. V. S. Naipaul, *India : A Wounded Civilization* (Calcutta : Penguin Books, 1977), pp. 171-72.

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

উচ্চশিক্ষায় নারীর অবস্থা ও অবস্থানের একটি বিশ্লেষণ: পরিপ্রেক্ষিত ব্রিটিশ-ভারত ও বাংলাদেশ

আছমা বিন্‌তে ইকবাল*

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও উন্নয়নের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে। মৌলিক অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। শুধুমাত্র সাংবিধানিক অঙ্গীকারের প্রাসঙ্গিকতায় নয়, প্রাগ্রসর সমাজের দাবী ও উন্নয়নের ভাবনায় দক্ষ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ হওয়ায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ঔপনিবেশিক শাসনামলেই নানারকম সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থিক ও প্রথাগত বাধা পেরিয়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ধীরে ধীরে নারীর প্রবেশাধিকার ঘটেছিলো। আজকের বাংলাদেশে সেই ধারায় গতি সঞ্চারিত হয়েছে। শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তবে বর্তমান শ্রেণিবিভক্ত ও বৈষম্যপূর্ণ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার উপাদানগুলো আজও সক্রিয়। সময়ের সাথে সাথে নতুন সমস্যাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ সব সমস্যা উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণকে সীমিত করেছে। এ নিবন্ধে বৃটিশ শাসনামলে ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় নারীর অনগ্রসরতার কারণ, অবস্থা ও অবস্থানের চিত্র অনুসন্ধানপূর্বক নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নের সাথে রাষ্ট্রের উন্নয়ন, রাষ্ট্রের সুষম কাঠামো ও সমৃদ্ধিকরণের গভীর সম্পর্ক ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকা

শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির সহজাত বুদ্ধি বিকাশের এক প্রক্রিয়া। শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে, মানুষের বিবেককে উজ্জীবিত করে, সচেতন করে তোলে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে। শিক্ষাকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে অপরটি ব্যাপক অর্থে। সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন বিশেষ কৌশল বা জ্ঞান অর্জন।[১]

সংকীর্ণ অর্থে, শিক্ষার পরিধি প্রতিষ্ঠানগত পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা, সনদ প্রাপ্তি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যাপক অর্থে, শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলে এবং তাকে আর্থ-সামজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনে

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সমর্থ করে তোলে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগত ও পরিবেশগত সকল শিক্ষায় পূর্ণতা আনে। উচ্চশিক্ষার স্তর বহুমাত্রিক উৎস, লক্ষ্য ও কার্যের সঙ্গে যুক্ত। উচ্চশিক্ষা জ্ঞানের সঞ্চায়ন, নুতন জ্ঞানের উন্মোচন, অবাধ বুদ্ধি চর্চা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। মানুষের সৃজনশীল, বিচারিক ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এ স্তরে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষা জীবনের চলমান প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত জ্ঞানের পূর্ণতায় দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রবহমানতাকে বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চাহিদা ও বাস্তবতায় উন্নয়নভিত্তিক সকল প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন ও অগ্রগতিতে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা অসামান্য।

শিক্ষা কাঠামো: ব্রিটিশ-ভারত থেকে বাংলাদেশ

ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক গৃহীত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে নিজস্ব আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক উপাদানে নির্মিত হয়েছিলো তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা যা 'দেশীয় শিক্ষা' নামে আখ্যায়িত হত। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম ইত্যাদি বিভিন্ন শাসনের ধারাবাহিকতায় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ ধর্ম ও নিজস্ব দেশীয় লোকাচার ও সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে তোলে দেশীয় শিক্ষা। ১২০৪ সালে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ দেশের শাসকবৃন্দ রাজ্য পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।[২] দেশীয় ব্যবস্থায় মুসলিম শিক্ষা ছিলো সর্বশেষ ব্যবস্থা যা সুসংহত রূপে মুঘল সাম্রাজ্যের পরও অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। মুঘল শাসনামলের শিক্ষা ছিলো মূলত মক্তব ও মসজিদ কেন্দ্রিক। শিক্ষার মাধ্যম ছিলো ফার্সি। এটি ছিলো সেকালের রাজভাষা। তবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবি ভাষার আলাদা গুরুত্ব ছিলো। আরবির পাশাপাশি বাংলারও প্রচলন ছিলো। সতের শতকের দিকে উর্দু ভাষার উৎপত্তি ঘটে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলায় ফার্সি ভাষার স্থান দখল করে ইংরেজি ভাষা।

মুসলিম শাসনামল থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা– এই তিনটি ধাপে বিন্যস্ত ছিলো। বাংলা প্রদেশে মুসলিমদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মক্তব বলা হতো। ধর্মভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন ছিলো সে সময়। হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় বিষয়ের সাথে লৌকিক বিষয়ও শিক্ষা দেয়া হত। অবশ্য পরবর্তীকালে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ-সব প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক পরিচালিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যদিয়ে প্রসার লাভ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশে শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করলেও প্রথম দিকে এই কোম্পানি এ দেশের শিক্ষা প্রসারে কোনো গুরুত্ব

দেয়নি। পরে অবশ্য তারা শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর পাশাপাশি চলছিলো ইউরোপীয় মিশনারিদের শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন তৎপরতা। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসকগণ সনদ ও আইনগত কাঠামোয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলে আসে ১৮৫৪ সালে এবং তা' ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকে।

ব্রিটিশ শাসনামলে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দু' ধরনের বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। যথা: মধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়। মধ্যম বিদ্যালয়গুলো দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো। এগুলো হলো: ইংরেজি ও স্বদেশীয়। ইংরেজি বিদ্যালয়গুলোতে দেশীয় পাঠক্রম ও ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হতো। অপরদিকে দেশীয় বিদ্যালয়গুলো দেশীয় পাঠক্রমের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। উভয় বিদ্যালয়ে পাঠদানে মাতৃভাষার প্রচলন ছিলো। ১৮৩৫ সালে ইংরেজির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং ১৮৫৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়।

১৮৩৫ সালের পর ব্রিটিশ শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষার ওপর আলাদা গুরুত্ব আরোপিত হয়। উচ্চ শিক্ষা ছিলো এ সময় কলেজকেন্দ্রিক। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার বিকাশ ও আধুনিকায়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন সময়ে সরকারি বা বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ নিয়ম ও সুবিধা অনুযায়ী পরিচালিত হতো। ১৮৫৭ সালে 'Act of Incorporatrion' অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা প্রসারে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েই ভারতীয় উপমাহাদেশে উচ্চ শিক্ষার বিকাশ ঘটে।

স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোতে ব্রিটিশ পর্যায়ের অনুরূপ শিক্ষায় তিনটি স্তর বিদ্যমান থাকে। ১৯৭৫ সনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ শুরু হয় এবং এর ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-শিক্ষায় ঘটে ব্যাপক সংস্কার।[৩]

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনি পর্যন্ত– যা পাঁচ বছর মেয়াদী। সাধারণত ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা এ স্তরের শিক্ষার্থী। বর্তমানে দেশে অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৯১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করা হয়। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার মত মাধ্যমিক স্তরেও ১৯৭৫ সালে প্রথম সংস্কার করা হয়। ধাপে

ধাপে বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এ পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত। মাধ্যমিক-শিক্ষা বহুমুখী। এ স্তরে বাংলা, ইংরেজি বাধ্যতামূলক রেখে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-বিভাগ ভিত্তিক বিষয় চালু রাখা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা মেধা এবং সৃজনশীল ক্ষমতানুযায়ী পড়ার সুযোগ পায়। শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) কৈশোরোত্তর শিক্ষাকে মাধ্যমিক-শিক্ষা নামে অভিহিত করেছে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যবর্তী পর্যায়।[৪] শিক্ষার্থীদের মেধা, যোগ্যতা ও প্রবণতানুযায়ী উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো মাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক-শিক্ষার কাঠামোটি দুই স্তর বিশিষ্ট।

প্রথমত: নিম্ন মাধ্যমিক স্তর যা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং এর সময়কাল তিনবছর মেয়াদী।

দ্বিতীয়ত: মাধ্যমিক স্তর যা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি এবং এর সময়কাল চার বছর।

নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু, সরকারি ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে এ-সকল বিদ্যালয় পরিচালিত। মাধ্যমিক স্তরটিতে মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভাগ ভিত্তিক বহুমুখী শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরেও বহুমুখী শিক্ষাক্রম চালু। কলেজ পর্যায়ে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়ন করা হয়। সাধারণত ডিগ্রি পর্যায়ের কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়া হয়।

শিক্ষানীতি ২০০৯ অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিন্যস্ত স্তরগুলো হলো:

(ক) তিন বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

(খ) আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি)।

(গ) চার বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)।

(ঘ) তিন বছর থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী উচ্চশিক্ষা (প্রথম বর্ষ স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর)।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখ থাকলেও সরকারি পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাসম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষা বলা হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি ধারা প্রচলিত রয়েছে। এ সমস্ত ধারায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.ফিল, পিএইচ.ডি, বিভিন্ন কার্যক্রম– রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিজস্ব পাঠক্রম অনুযায়ী পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা কার্যক্রম

পরিচালিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮টি (জাতীয়, উন্মুক্ত, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইসলামী আরবী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ) এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮টি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত তবে স্বায়ত্তশাসিত। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অন্য দেশের তুলনায় বেশি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এগুলো হলো:

- তিন বছর মেয়াদী স্নাতক পাস ডিগ্রি যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে পড়ানো হয়।
- চার বছর মেয়াদী (সম্মান) স্নাতক। সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে এ কার্যক্রম রয়েছে।
- পাঁচ বছর মেয়াদী চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন।
- তিন বছর মেয়াদী স্নাতক পাস ডিগ্রির পর ২ বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি।
- চার বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রির পর ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রি।
- প্রকৌশল বিদ্যায় চার বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রির পর ২ বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি।
- ২ বছর মেয়াদী এম.ফিল. কোর্স।
- ৩ বা তদূর্ধ্বো বছরের পিএইচ.ডি. কোর্স।

নারীশিক্ষায় বিভিন্ন দলিল: বৈশ্বিক ও জাতীয়

নারীর প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন এবং এর থেকে নারী মুক্তির উপায় সম্পর্কিত বিভিন্ন নারীবাদী চিন্তায় নারী শিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। উদারনৈতিক নারীবাদী চিন্তাবিদ মেরিউলস্টোনক্রাফ্‌টের ভাবনায় নারীশিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর অধস্তনতার জন্য তিনি নারীশিক্ষার অভাবকে দায়ী করেন। উলস্টোনক্রাফ্‌ট্ তৎকালীন সময়ে সমাজে নারীর মানস গঠনের প্রচলিত প্রথা ভিত্তিক শিক্ষার সমালোচনা করে নারী-পুরুষের জন্য অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী জানান। উলস্টোনক্রাফট মূলত জেন্ডার সমতা আনয়নে নারী-পুরুষের জন্য একই শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি জানান। তিনি তাঁর 'A Vindication of the Rights of Women' (1792) গ্রন্থে উক্ত ভাবনার প্রতিফলন ঘটান। তিনি এমন এক শিক্ষার কথা বলেছেন যা নারীকে বুদ্ধি, নৈতিকতা, বিচারিক সক্ষমতায় পূর্ণ মানবীয় সত্তায় তৈরি করবে। এ ধরনের শিক্ষা গৃহস্থলির কাজ ও সন্তান পালনের ধারাকে উন্নতই শুধু করবে না, রাষ্ট্রীয় কল্যাণেও কাজে আসবে। জন স্টুয়ার্ট মিলও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছেন। তিনি মনে করেন, নারী-পুরুষের মধ্যকার শিক্ষা ও পেশাগত পার্থক্য পুরুষতন্ত্রের

স্বার্থে। তিনি শিক্ষাকে নারীমুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনিও উলস্টোনক্রাফ্‌টের মতো প্রচলিত প্রথা ও সংস্কৃতিভিত্তিক শিক্ষা যা নারীর বিকাশে বাধা দেয়, তার সমালোচনা করেন। তিনি তৎকালীন সময়ে প্রচলিত বৈষম্যমূলক শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন দাবি করেন। উলস্টোনক্রাফ্‌ট্ ও মিলের মত বিভিন্ন নারীবাদী চিন্তাবিদ, নারীমুক্তি আন্দোলন, নারী মুক্তির অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে শিক্ষাকে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে। বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রণীত বিভিন্ন সনদ ও দলিলে নারীর শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতায়নের কথা বলা হয়েছে। এ-সব দলিল ও সনদে শিক্ষা নারীর অধিকার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মানব অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ ঘোষণাপত্রের ২৬নং অনুচ্ছেদে মানুষের শিক্ষার অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে এবং মেধা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের (নারী-পুরুষের) সমতায়নের কথা বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদের ১ নং উপধারায় উল্লিখিত, প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। ন্যূনপক্ষে প্রাথমিক এবং মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে হবে। কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা সবার জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে এবং মেধার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সকলের সমান সুযোগ থাকবে।[৫]

১৯৬০ সালে জাতিসংঘ জাতি ধর্ম,বর্ণ, ভাষা, লিংগ, শ্রেণি, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল মানুষের শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত (Convention Against Discrimination in Education) চুক্তি করে। এই চুক্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এবং উচ্চ শিক্ষার মেধার ভিত্তিতে সকলের সমান অধিকারের নীতি অনুসরণের জন্য জাতিসংঘ সকল সদস্য রাষ্ট্রকে আহবান জানায়।[৬] ১৯৬২ সালের ২২ মে তারিখ থেকে এটি কার্যকর হয়।

১৯৭৯ সালে প্রণীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও CEDAW অর্থাৎ Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women কার্যক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সনদে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। সিডও সনদের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে শিক্ষা গ্রহণে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। এর অর্থ হল– শিক্ষা ও কারিগরি নির্দেশনা, অভিন্ন পাঠক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষণ এবং সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিতকরণ, বৃত্তি ও অনুদানের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের সমান সুযোগ প্রদান করা।[৭]

১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের আয়োজনে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব-নারীসম্মেলনে উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখার প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়। বেইজিং ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, শিক্ষা একটি মানবিক অধিকার এবং সমতা, উন্নয়ন ও প্রগতির লক্ষ্য অর্জনে এক অপরিহার্য হাতিয়ার। অধিকাংশ নারীকে যদি পরিবর্তনের বাহক হতে হয় তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমতা থাকা প্রয়োজন।[৮]

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে ১৮৯টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘের সহস্রাব্দের সম্মেলনে বিশ্বশান্তি, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরমুক্ত বিশ্ব, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন, সমতার নীতি ইত্যাদি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক ঘোষিত এই বৈশ্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিই সহস্রাব্দের ঘোষণা (Millennium Declaration) নামে খ্যাত। সংক্ষেপে একে MDG বলা হয়। মোট আটটি লক্ষ্য এই ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্টের ৩ নম্বর লক্ষ্যটি ছিলো প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস। জেন্ডার সমতা সংক্রান্ত লক্ষ্যের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শিক্ষাকেই এখানে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।[৯]

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জনতিয়েন-এ সবার জন্য শিক্ষার বিশ্ব ঘোষণায় (World Declaration on Education) সকল শ্রেণির মানুষের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষায় সর্বজনীন সুযোগ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বৈশ্বিক পর্যায়ে গৃহীত শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি, নীতি ও পদক্ষেপগুলো জাতীয় পর্যায়ে পালনের জন্য বিভিন্ন দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে বাংলাদেশ সরকারেরও নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ ও ২৮নং ধারায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ১৭নং ধারায় বর্ণিত আছে:

ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[১০]

সংবিধানের ২৮নং ধারায় বর্ণিত আছে:

> কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।[১১]

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। নীতিমালায় শিক্ষার সকল পর্যায়ে অসমতা দূর করা এবং কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও উচ্চশিক্ষাসহ সব পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে।

জীবনমুখী শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে সকল স্তরের পাঠ্যসূচিতে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায়ও শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

নারীর উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দক্ষ মানবসম্পদের একট অপরিহার্য অংশ হচ্ছে নারী, যারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত অংশ নিচ্ছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও এটি একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। ড. আনিসুজ্জামান বলেন-

> নারীর ক্ষমতায়নের আর্থিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। সেই আর্থিক স্বাধীনতা হয়তো সস্তায় শ্রম বিক্রি করে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তা অনেক বেশি করে আসছে উচ্চশিক্ষার পথ বেয়ে। নারীকে কেউ আর ভালো স্ত্রী মা হবার শিক্ষা দিতে যাচ্ছে না। শিক্ষা আজ তার সর্ববিধ বিকাশে ভূমিকা রাখতে চাইছে। উচ্চশিক্ষা আজ তাকে মানুষ হিসেবে নিজের মূল্য নিরূপণ করতে শেখাচ্ছে। নিজের সত্তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অবহিত করছে।[১২]

দেশজ লোকাচার ও প্রবাদ-প্রবচনে নির্মিত নারীর সনাতন রক্ষণশীল মানসিক অবয়বের ইতিবাচক ও আধুনিক পরিবর্তন এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণে উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। উচ্চশিক্ষা নারীকে পুরুষসুলভ আচরণে উদ্বুদ্ধ করেনা, কিংবা পুরুষ-বিদ্বেষী করেনা, বরং পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর নির্মমতাকে পরিহার করে সমতায়নের ভাবধারায় ও মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ নারী পুরুষের সমানাধিকারের একটি নিয়ামক হলো উচ্চশিক্ষা। উচ্চশিক্ষার সুযোগ নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরীতে ভূমিকা রাখে। কারণ নারীর উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও তার সুষ্ঠু ও ইতিবাচক প্রয়োগ নারীর আত্মরক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ, আর্থিক সচ্ছলতা ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান নারীর আর্থ-সামজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার তাগিদ সৃষ্টি করে এবং সেই সাথে নারীর আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতার সুউচ্চ স্তর তৈরী করে তার আত্মশক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রেণের সামর্থ্য বাড়ায়।

ব্রিটিশ শাসনামল ও উচ্চশিক্ষায় নারী

মুসলিম শাসনামলে সীমিত পর্যায়ে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিলো। এ সময়ের শিক্ষা ছিলো মূলত ধর্মভিত্তিক এবং সামাজিক আচার-ক্রিয়া সম্পর্কিত। মুসলিম শাসক এবং অভিজাত নারীরাই এ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতেন। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েরা গৃহশিক্ষকের সাহায্যে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাও লাভ করত।[১৩] এ সময় মেয়েদের উচ্চশিক্ষার

উদাহরণও রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিম নারীগণ ইসলামি সংস্কৃতিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতেন।[১৪] তৎকালীন সামাজিক কাঠামোয় উচ্চশিক্ষায় নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত। ইতিহাসে এ সময় মুসলিম শাসক কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগে উচ্চ বংশীয় নারীদের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের নজির রয়েছে। মুঘল সম্রাট আকবর এবং সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ এ ধরনের প্রয়াস দেখিয়েছেন। বাংলায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা ঘটে বৃটিশ শাসনামলে। ইংরেজদের প্রচেষ্টায় এ দেশে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ছাপাখানার বিকাশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী অগ্রসরতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনামলে নারীশিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত প্রসার ঘটেনি। বৃটিশ শাসন নারীশিক্ষা বিরোধী ছিল না, কিন্তু সামাজিক কাঠামোয় ধারণকৃত রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা শিক্ষায় নারীকে অনগ্রসর করে রেখেছিলো। সামাজিক রক্ষণশীলতা ও ধর্মান্ধতার ফল হলো অশিক্ষা, বাল্য বিবাহ, তালাক ও যৌতুক প্রথার মত বিষয়গুলো — যা তৎকালীন সময়ে নারীশিক্ষার যুগোপযোগী উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। বৃটিশ সরকার কর্তৃক নারীশিক্ষা উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ ও তৎপরতার অভাবও এ ক্ষেত্রে দায়ী। উল্লেখ্য, বৃটিশ শাসক কর্তৃক 'শাসন ও বিভাজন' নীতি সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবাষ্প ছড়িয়েছিলো তা শতাব্দী ধরে চলে আসা হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক সংহতি ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের ওপর আঘাত হানে। ব্রিটিশ সরকারের এই শাসনতান্ত্রিক কূটকৌশল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে কেবল অনিবার্যই করে তোলেনি, তা সামাজিক কাঠামোয় চর্চিত হয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে শিক্ষা সংস্কারের অংশ হিসেবে ১৮৩৫ সালে প্রণীত অ্যাডাম শিক্ষা সংস্কারের রিপোর্টে নারীশিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সরকার তার নিজ দেশ ইংল্যান্ডেও নারী শিক্ষায় তৎকালীন সময়ে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেয়নি। ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের শিক্ষাবার্তা অনুযায়ী ভারতে নারীশিক্ষার প্রসারে সরকার প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণ করে। খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত ধরেই কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনামলে সামাজিক পর্যায়ে নারীশিক্ষার প্রচলন ঘটে । নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে লেডিস সোসাইটি নামক সংগঠনটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূচনা হয় ১৮৪৯ সালে 'বেথুন স্কুল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে কোলকাতায় মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে বাঙালি সমাজ-সংস্কারক ও মহীয়সী নারীদের কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উদ্যোগে নারীশিক্ষায় গঠিত কমিটির কার্যক্রম এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব, ধর্মান্ধতা, সামাজিক রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বৈরী মনোভাব, পর্দাপ্রথা, অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ, প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের অভাব, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি কারণগুলো তৎকালীন সময়ে নারীশিক্ষাকে বিলম্বিত করেছিল।

১৮৭৯ সালে 'বেথুন' স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করার মধ্যদিয়ে উচ্চশিক্ষায় নারীদের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়। 'বেথুন' স্কুল থাকাকালীন সময়ে সেখানে কেবল হিন্দু ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিলো। কলেজে রূপান্তরিত হওয়ার পর এটি সকল সম্প্রদয়ের নারীদের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৯১৭ সালে গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নারীদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে আর্থিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উক্ত রিপোর্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে ইডেন স্কুল ইন্টারমিডিয়েট স্তরে উন্নীত করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে নারীরা তৎকালীন সময়ে উচ্চশিক্ষায় একধাপ এগিয়ে যায়। ১৯১৮ সালের এক হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, এ সময় ৩৮৯ জন ছাত্রী[১৫] ঐ প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে। এই অবস্থায় সরকার পরবর্তী এক দশকের মধ্যে মুসলিম নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মধ্যম বিদ্যালয় এবং মধ্যম বিদ্যালয়কে উচ্চবিদ্যালয়ে রূপান্তর করে।[১৬] পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯৩০ সালে প্রণীত 'সারদা এ্যাক্ট' (বাল্যবিবাহ রোধে প্রণীত হয়েছিলো), ১৯৩০-৩৫ সালে ঢাকায় কামরুন্নেসা স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে রূপান্তর এবং ফজলুল হক মন্ত্রীসভা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নারীর উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করে।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ হলো:

- ১৯৩৯ সালে জুলাই মাসে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে 'লেডি ব্রাবোর্ণ' কলেজ প্রতিষ্ঠা ও অনুদান প্রদান।
- উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধিতে পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আরবি ও ফার্সি শিক্ষার ব্যবস্থা।
- মুসলিম নারীর উচ্চশিক্ষার প্রসারে মুসলিম ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ ।
- মুসলিম নারীর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতায়াত ও আবাসিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।
- মেডিকেল স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্রীদের উচ্চ হারে বৃত্তি প্রদান।

ব্রিটিশ শাসনামলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নারীর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছিলো।

পর্দাপ্রথা: পর্দাপ্রথা তৎকালীন সময়ে প্রাথমিকশিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোনো বড় বাধা হয়ে না দাঁড়ালেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা ছিলো। পর্দাপ্রথার কারণে অভিজাত শ্রেণির চেয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা অনেক বেশি নিরুৎসাহিত ছিল উচ্চশিক্ষা গ্রহণে। পারিবারিক ও সামাজিক রক্ষণশীলতাও এ ক্ষেত্রে দায়ী। সম্প্রদায়িক মনোভাব ও স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বাস্তবতায় মেয়েদের আলাদা শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠলেও এ ক্ষেত্রে সরকার এবং এর সাথে সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা, প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের অভাব এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি। কলেজশাখা খোলার পূর্ব পর্যন্ত বেথুন স্কুলে মুসলিম ও অন্য সম্প্রদয়ের মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৯৩৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম নারীদের জন্য বিশেষ কোনো কলেজও ছিল না। মুসলিম নারী শিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব হিন্দুদের চেয়ে মুসলিম নারীদের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

বাংলার মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার ১৯১২-১৯৪১[১৭]

বছর	শিক্ষারস্তর	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	হিন্দু ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রীর হার	হিন্দু ছাত্রীর হার
১৯১২	উচ্চশিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)	৪০	১	৩১	২.৫%	৭৭.৫%
১৯২১	ঐ	২১৬	৩	১৪৬	১.৩৮%	৬৭.৫৯%
১৯৩০-৩১	ঐ	৩৭৫	৩	৩৬৬	০.৮%	৯৭.৬%
১৯৪১	ঐ	২৭৬৫	১৬০	৩৬২	৫.৭৮%	৮৫.৩৬%
১৯১২	মাধ্যমিক শিক্ষা (মধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়)	৫৯৬৬	১৩৩	৪১৮২	২.২২%	৭০.০৯%
১৯২১	ঐ	১৩২৩১	৫২১	৬৭৫৪	৩.৯৩%	৫১.০৪%
১৯৩০-৩১	ঐ	৮৭৭১	২৩৩	৫১১৬	২.৬৫%	৫৮.৩২%
১৯৪১	ঐ	২৩৮২২	১৮৯৯	১৯৮০১	৭.৯৭%	৮৩.১২%
১৯১২	প্রাথমিক	২০৭২৬১	৭৬৩৫৩	১২৪৯১৭	৩৬.৮৩%	৬০.২৭%
১৯২১	ঐ	৩২৯৭৫৪	১৭৮৩৭১	১৪৫১৮৮	৫৪.০৯%	৪৪.০২%
১৯৩০-৩১	ঐ	৫১১০৭৫	২৮০৯০৩	২১৯২১৯	৫৪.৯৬%	৪২.৮৯%
১৯৪০-৪১	ঐ	৭৭৯১৯২	৪২৫১০৩	৩৩৯৬০৫	৫৪.৫৫%	৪৩.৫৮%

যোগ্য **নারীশিক্ষকের অভাব:** নারীদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মত নারীশিক্ষকের অপ্রতুলতাও ছিল তৎকালীন সময়ের বাস্তবতা। সরকারি অনুদান ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষিকাদের নিজস্ব ও সামাজিক রক্ষণশীলতা প্রভৃতি কারণে যোগ্য নারীশিক্ষকের অভাব উচ্চশিক্ষায় একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিলো। সরকার পরিচালিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা যেমন হাতে গোনা ছিলো তেমনি ভারতবর্ষে অনেক প্রদেশ বা অঞ্চলে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়নি। শিক্ষিকাদের আবাসিক সংকটও ছিলো অন্যতম সমস্যা।

নারীশিক্ষার প্রতি বৈরী মনোভাব: তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈরী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজ নারী-শিক্ষাকে ভাল চোখে দেখেনি। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্য:

> সর্ব্বশুভকরী পত্রিকায় (১৮৫০) প্রকাশিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের স্ত্রী শিক্ষা প্রবন্ধ, প্যারীচাঁদ মিত্রের রামারঞ্জিকা (১৮৬০) ও রামসুন্দরীদেবীর আমার জীবন (১৮৬৮) প্রভৃতি রচনায় দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ধ্যানধারণা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল: উপযোগী মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি মেয়েদের নেই; স্ত্রীশিক্ষা লোকাচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ; বিদ্যাশিক্ষা করলে স্ত্রীলোক দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখের ভাজন হয়ে চিরকাল কষ্ট পাবে; স্ত্রীলোক সংসারের কাজ অর্থাৎ রান্নাবান্না ও সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি না করলে কী করে চলবে, এসব কাজ কি পুরুষ করবে? স্ত্রীশিক্ষা দিয়েই বা লাভ কি! তারা চাকরিবাকরি করবে না, আদালতে যাতায়াত করতে পারবে না, কাজকর্ম করবে না, সাহেবসুবোর সংগে আলাপ করবে না, দেশান্তরে যাবেনা, হাটবাজারে যাবে না সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা কি। বিদ্যাবতী হলে স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারী, মুখরা, অহংকারী, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাকারী ও দুঃশ্চরিত্র হয়ে নিজেরা পতিত হবে এবং তাদের কুলকেও পতিত করবে।[১৮]

বাল্যবিবাহ: বাল্যবিবাহ উচ্চশিক্ষার পশ্চাৎপদতার আর একটি কারণ। তৎকালীন রক্ষণশীল সামাজিক ব্যবস্থায় মেয়েদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া হতো। এই বিয়ের মধ্যদিয়ে মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতো। সাধারণত দেখা যেতো যে, কোনো রকমে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেই মেয়েদের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হতো। এই বিয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটতো। শেষ হতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকদের জাগ্রত ভূমিকা, প্রতিবাদ, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা, প্রতিরোধ, বিভিন্ন আইন বাল্যবিবাহের সংখ্যাগত পরিমাণ কমিয়েছে, কিন্তু সমাজ থেকে তা চিরতরে নির্মূল করা যায়নি।

উপর্যুক্ত কারণ ছাড়াও আর্থিক অসংগতি, তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে নারীদের উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির অভাব ইত্যাদি বিষয় নারীর উচ্চশিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে। ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন বাধাবিপত্তি পেরিয়ে গুটিকয়েক নারীর উচ্চশিক্ষায় আগমনের পরিসংখ্যানে নারীদের অনগ্রসরতার চিত্র ফুটে উঠলেও সমকালীন সময়ে এর আবেদন সমগ্র নারী সমাজকে আন্দোলিত করে এবং আজকের বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের পদচারণা সে-ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় নারীর অবস্থান

বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নারীশিক্ষার অনুপাত বেড়েছে। প্রাথমিকশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমান সমান। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত প্রাথমিক ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলেদের

অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৪৫: ৫৫ যা ২০০৮ এ এসে দাঁড়িয়েছে ৫০: ৪৯-এ।[১৯] প্রাথমিক স্তরে এখন মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার যার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ৮২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৫৪ জন।[২০] প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষা, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে বই বিতরণ নারীশিক্ষার হার বাড়িয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত অর্থ মওকুফ করা হয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময়ে এ-সব পদক্ষেপে নারীশিক্ষায় যথেষ্ট সাফল্য এসেছে। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী পুরুষের মধ্যে রয়েছে বেশ ব্যবধান।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) ২০০৮-এর ৩৫তম প্রতিবেদন অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৬৯ জন, যার মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ৭ লক্ষ ২০ হাজার ৫২০ জন এবং ছাত্রীসংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৪৯ জন। আলোচ্য বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১টি।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিসংখ্যান

শিক্ষার্থী সংখ্যা: বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক[২১]

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯১১৬	৯৬৫৬	২৮৭৭২
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৯১৩৩	৭৭৭৬	২৬৯০৯
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩২১১	১৪১০	৪৬২১
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৫৮৬৫	১৩৫৩	৭২১৮
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৪১৯২	৫১০৯	১৯৩০১
৬	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭০৮২	৩৩৩৫	১০৪১৭
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৭৯১৩	২১৯৬	১০১০৯
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬১৫৬	১৭৭৪	৭৯৩০
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪৪০	৯৮৩	৪৪২৩
১০	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৫৫১০১৫	৩৮৮৭১৫	৯৩৯৭৩০
১১	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬৪৬৪	২৬১৫১	৭২৬১৫
১২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯৫	৪২১	১১১৬
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৩৩	২০২	৫৩৫

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১৪	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৯৮৬	৫০৮	১৪৯৪
১৫	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১০৩৯	৩১১	১৩৫০
১৬	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১০৩৯	৩১১	১৩৫০
১৭	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১০৩৩	৫০৯	১৫৪২
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৫৬২	১৯৯	১৭৬১
১৯	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬৫৯	১৮৩	১৮৪২
২০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২২২২	২৪২	২৪৬৪
২১	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬৮৫	১৩৭	১৮২২
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৮৩	১৩৫	৫১৮
২৩	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২১৭৭৪	৪১২২	২৫৮৯৬
২৪	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	৪১৭	১৭৪	৫৯১
২৫	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	৩১০	১৭৩	৪৮৩
২৬	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	২৪২	৭৩	৩১৫
২৭	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৩৫	১০৪	৫৩৯
২৮	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	---	---	---
২৯	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্	৮৯৮	১০৮	১০০৬
৩০	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়-রংপুর	২২১	৭৯	৩০০
৩১	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	---	---	---
	মোট=	৭২০৫২০	৪৫৬৪৪৯	১১৭৬৯৬৯

উপরোক্ত ছকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ছাত্র-ছাত্রীর হার যথাক্রমে ৬১.২২% এবং ৩৮.৭৮% অর্থাৎ ছাত্রীর তুলনায় ছাত্রের হার শতকরা ২২.৪৪% বেশি।

পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ৩১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ১ম বর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর হার যথাক্রমে ৫৮.৯০% এবং ৪১.১০%। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর হার যথাক্রমে ৫৯.৫৩% এবং ৪০.৪৭%। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৩টিতে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৩১ জন, যার মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ২ লক্ষ ০৮ হাজার ১৫৪ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ১ লক্ষ ০৮ হাজার ১৭৭ জন। এখানে ছাত্র সংখ্যা ৩২% বেশি।[২২]

মোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ২০১০ সালে বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ১ম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রমি. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা (১ম বর্ষ)	ছাত্রসংখ্যা (১ম বর্ষ)	ছাত্রীসংখ্যা (১ম বর্ষ)	বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৯৯৬৭	৬৬২৮	৩৩৩৯	২৯৫৭৩	১৯২০০	১০৩৭৩
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৭৩৭৩	৫৩৩৫	২০৩৮	৩১৫৩৮	২২০২৭	৯৫১১
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬৮৯	১০৪৩	৬৪৬	৪৮৮৮	৩১৪৭	১৭৪১
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৯৮৪	৭৯৮	১৮৬	৭৬৬৭	৬১৯৯	১৪৬৮
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৭২৬১	৫৩৮৯	১৮৭২	১৯৫৩৫	১৪২৫৩	৫২৮২
৬	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭৪৭	২৫৭৯	১১৬৮	১১৭৩৫	৭৯৩৭	৩৭৯৮
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	১৫৫৫	১০৮৭	৪৬৮	১০৭৭৬	৮২২৩	২৫৫৩
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২৫	১৪২১	৫০৪	৭৮১২	৫৮৩৭	১৯৭৫
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৮৯	১০১০	৪৭৯	৩৭৯০	২৬৪৫	১১৪৫
১০	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৪৮৪৯১৭	২৭৭৬৫৫	২০৭২৬২	১২৭০৮৪৩	৭৩৪৪৯৯	৫৩৬৩৪৪
১১	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	২০৫৬১৭	১২১৪৪২	৮৪১৭৫	১২২৫০৩	৭৩০২৩	৪৯৪৮০
১২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	১৩০৬	৬৯৭	৬০৯	১৭০৬	৯৫৬	৭৫০
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৮	১১৪	৮৪	৬৭১	৪০২	২৬৯
১৪	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৭৬২	৪৬১	৩০১	২০৯৮	১২৮৩	৮১৫
১৫	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬০৫	৪৪৩	১৬২	২০৫২	১৫৩৮	৫১৪
১৬	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৬৭	৪১৬	১৫১	১৭১২	১২৬৪	৪৪৮

ক্রমি. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা (১ম বর্ষ)	ছাত্রসংখ্যা (১ম বর্ষ)	ছাত্রীসংখ্যা (১ম বর্ষ)	বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৭	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৫০৩	৩৫৫	১৪৮	১৯০১	১২৫৯	৬৪২
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৫৫	৫৬৭	৮৮	২০১১	১৭৬৩	২৪৮
১৯	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৪৫	৪৬০	৮৫	২৪৮১	২১৬৩	৩১৮
২০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৬৮৮	২৩৮৫	৩০৩	২৬৩২	২৩৩৬	২৯৬
২১	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৪৪	৫১৯	২৫	১৯২৯	১৭৯৮	১৩১
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬৬	৩২১	১৪৫	১২৬০	৮৯৯	৩৬১
২৩	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৯৭২২	৭৩৮৮	২৩৩৪	২২৮৭৭	১৭৬৪৯	৫২২৮
২৪	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	৫১৩	৩৫৩	১৬০	১৫১৯	১০১৮	৫০১
২৫	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯৬	৪০৯	২৮৭	১৯৩৬	১১৬২	৭৭৪
২৬	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	১১০	৮৫	২৫	৫৩২	৪০৩	১২৯
২৭	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩০৯	২২৯	৮০	১১১৯	৮৩৮	২৮১
২৮	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৪২	২৭৬	১৬৬	৮৯৪	৬০৩	২৯১
২৯	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্	১৫৩	১০৯	৪৪	২৩৯	১৭৫	৬৪
৩০	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	৯১১	৬১৯	২৯২	১৮৭৩	১৩০৪	৫৬৯
৩১	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৮৮	৩৯৪	৯৪	৪৮৮	৩৯৪	৯৪
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা =		৭৪৮৭০৭	৪৪০৯৮৭	৩০৭৭২০	১৫৭২৫৯০	৯৩৬১৯৭	৬৩৬৩৯৩

উৎস: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত ৩৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০-এর আলোকে লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

২০১১ সালে দেশের ৩৪টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৭০ জন, তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ০৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৭২০ জন।[২৩] অর্থাৎ ছাত্রীর তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা ১১.৪৮% বেশি। বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর বৈষম্য কমে এসেছে।

শুধু সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ই নয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যকার যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ:

২০১০ সালে বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

ক্রমি. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
০১	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	১৩৭১০	৯৫৬৩	৪১৪৭
০২	ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চিটাগং	৩৯৯২	২৪৯৪	১৪৯৮
০৩	ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	২৯৬৪	২০৭৩	৮৯১
০৪	দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি	৩৫২৫	২৮৩৬	৬৮৯
০৫	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি	৩৪৬৩	২৯০০	৫৬৩
০৬	ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং	৭৪১০	৫২৬৯	২১৪১
০৭	আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	৫৯২৯	৪৪৯৫	১৪৩৪
০৮	আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ	৯৭৬৪	৭৪১৯	২৩৪৫
০৯	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	৯৮১৯	৭০৬৮	২৭৫১
১০	ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	৭১৮৫	৪৯৫৩	২২৩২
১১	দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া পেসিফিক	৩৯৪৬	২৮০৮	১১৩৮
১২	গণ বিশ্ববিদ্যালয়	১৯১৮	১০৯১	৮২৭
১৩	দি পিপল'স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	২৭২৩	২১৬৭	৫৫৬
১৪	ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	৫৯৫৯	৫৩৪৯	৬১০
১৫	ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি	৩৪০৩	১৯৪৬	১৪৫৭
১৬	মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২৮০১	১৬৬৮	১১৩৩
১৭	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	২১১৭	১৫৭২	৫৪৫
১৮	লিডিং ইউনিভার্সিটি	১৭৯৪	১১৭৪	৬২০
১৯	বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	১৯৭৫	১৬২৫	৩৫০
২০	সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২২৭৩	৫৬৭	১৭০৬
২১	ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ	৪৩৪৫	২৭৪৩	১৬০২
২২	প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি	৬৭৩০	৪৫৩৫	২১৯৫
২৩	সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটি	১১৬২০	৮৪৩২	৩১৮৮
২৪	স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি	৯৫৭৮	৬৬৫৬	২৯২২
২৫	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	৬৯৪৪	৫৪৫৯	১৪৮৫

ক্রমি. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
২৬	স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	২৫৭৩	১৮১৩	৭৬০
২৭	ইবাইস ইউনিভার্সিটি	৩৩৭২	২৯৩২	৪৪০
২৮	সিটি ইউনিভার্সিটি	২৫৯৯	২৩১৩	২৮৬
২৯	প্রাইম ইউনিভার্সিটি	৫০৭৯	৪১১৭	৯৬২
৩০	নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	৭১৯৫	৫৩২২	১৮৭৩
৩১	সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	২৯৭৮	২৬১০	৩৬৮
৩২	গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১৯৮৯	১৮২৩	১৬৬
৩৩	ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	৪৭৮৪	৪২৬২	৫২২
৩৪	শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি	৪৬০৬	৩১৬৮	১৪৩৮
৩৫	দি মিলিনিয়াম ইউনিভার্সিটি	৩৫৯	২৫৯	১০০
৩৬	ইস্টার্ণ ইউনিভার্সিটি	৩৪৪৫	২৫৯৭	৮৪৮
৩৭	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনেলজি	৩৬২৩	১২২২	২৪০১
৩৮	মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি	১৯৫৬	১৪৩৭	৫১৯
৩৯	উত্তরা ইউনিভার্সিটি	৪৭৭৮	৩৫৭৬	১২০২
৪০	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	৩৮৪১	২৬২৮	১২১৩
৪১	ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১০৫৪	৮০৬	২৪৮
৪২	ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া	২০৮৭	১৯০৫	১৮২
৪৩	প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি	১৩৫৪	১৩০৮	৪৬
৪৪	ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস	৩৩৭৫	২৮৭৩	৫০২
৪৫	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	৪৫৮৮	৪১৭২	৪১৬
৪৬	রয়াল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা	৬৮০	৫৩৫	১৪৫
৪৭	ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশ	২৬৯৭	১৮১৩	৮৮৪
৪৮	অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	৫৯৫৮	৫৩০৬	৬৫২
৪৯	বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি	৫১৩৭	৪৩৫৭	৭৮০
৫০	আশা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	৩৮৮৯	৩০১৬	৮৭৩
৫১	ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, চিটাগং	১৭১	১২২	৪৯

উৎস: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-এর আলোকে লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

উপর্যুক্ত ছকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১০-এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর হার যথাক্রমে ৭৪.১৪% এবং ২৫.৮৬%; অর্থাৎ ছাত্রীর তুলনায় ছাত্র সংখ্যা ৪৮.২৮% বেশি।

নারীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাসমূহ

ধর্মীয় বাধার কারণে অনেক নারীই উচ্চশিক্ষার স্তর স্পর্শ করতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'বিদ্যাশিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম- নারী ও পুরুষের উপর ফরজ।' তিনি আরও বলেছেন, 'জ্ঞানের সন্ধান কর, এজন্য যদি চীন দেশে যেতে হয় তবুও।' এ সমস্ত নির্দেশ সমগ্র মানবজাতির জন্য, নারীও যার অর্ন্তভুক্ত। ইসলামে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার সর্বস্তরে জ্ঞান প্রাপ্তির সুযোগ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য উন্মুক্ত। ইসলামে জ্ঞান অর্জন নারী-পুরুষের কেবল অধিকার নয়, তাদের জন্য বাধ্যতামূলক অর্থাৎ ফর্‌জ্‌। আল-কোরআনে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ মর্যাদা দানের ঘোষণা রয়েছে। এই জ্ঞান অর্জনের ঘোষণাই নারীকে শিক্ষার সর্বস্তরে প্রবেশের অধিকার দেয়। ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষকতা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধাত্রিবিদ্যা, গার্হস্থ্যবিদ্যা, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অথচ ধর্মের দোহাই দিয়ে এখনও বাংলাদেশের কিছু মুসলিম পরিবার ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠিবিশেষ নারীর উচ্চশিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করছে— এদের অনেকে অপরাজনীতির হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্নতাও নারীর উচ্চশিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে। বাল্যবিবাহ ব্রিটিশ শাসনামলে নারীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। বর্তমানেও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো থেকে এ বাধা অপসারিত হয়নি। ১৯৩০ সালে প্রণীত সারদা এ্যাক্ট, বিভিন্ন আইন, বিশ্বায়নের অবাধ তথ্য প্রবাহের ধারায় মানুষের সচেতনতা বাল্যবিবাহের মাত্রাকে কিছুটা কমিয়েছে কিন্তু সমাজ থেকে একে নির্মূল করা যায়নি। এখনও বাল্যবিবাহ হচ্ছে, তবে গ্রাম ও শহর ভেদে এর মাত্রার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

দারিদ্র্য সকল পর্যায়ের শিক্ষা-ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। একটি দরিদ্র পরিবারে পুত্র সন্তানই শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। অতি দরিদ্র পরিবারের পুত্র সন্তান টিউশনি করে, মেসে থেকে পড়াশুনার খরচ চালায়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে মেয়েদের এ ধরনের ব্যবস্থায় লেখাপড়া চালিয়ে নেয়া কঠিন। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ হলেও অনেক সময় আর্থিক সংকটের কারণে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। আবার দেখা যায় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজসহ সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগের অভাবে বিকল্প হিসেবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। কিন্তু এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া অনেক ব্যয়বহুল যা দরিদ্র পরিবারগুলোর পক্ষে তা' বহন করা প্রায় অসম্ভব।

বিবাহজনিত কারণও নারীর উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষাকে নিরুৎসাহিত করে। বিয়ের সাথে সাথে নারীর জীবনে সাংসারিক দায়িত্ব ও মাতৃত্বযুক্ত হয় যা তাকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তবে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতিতে নারী, স্ত্রী, কন্যা, মা — যে ভূমিকাতেই থাকুক না কেন সাংসারিক দায়িত্বের দায় নিয়েই তাকে শিক্ষার পথে এগুতে হয়।

যাতায়াত ব্যবস্থার সমস্যা নারীর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিদ্যালয়ের মত অঞ্চলে অঞ্চলে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংখ্যাগত আধিক্য নেই। ফলে কষ্ট করে ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থান, দূরত্ব, পরিবহনের স্বল্পতা, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ইত্যাদি নারীর উচ্চশিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে। আবাসিক সংকটও এক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধক। বাংলাদেশের সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সুবিধা নেই। প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ছাত্রী হলের সংকট রয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীনিবাসের সংকট আরও প্রকট। সাধারণ ও মেডিকেল কলেজসহ সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্রীরা এই সমস্যার সম্মুখীন।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা[২৪]

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	মোট শিক্ষার্থী	আবাসিক শিক্ষার্থী			শতকরা হার
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৮৯৭২	১১৩৩৮	৬৩৩০	১৭৬৬৮	৬১
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৭২৭০	৪৮৪৭	২৮০৬	৭৬৫৩	২৮
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৭৬৭	২৮৩৭	১৬৭২	৪৫০৯	৯৫
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৭৫৪৩	২৪৮২	৩৮০	২৮৬২	৩৮
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৯০৫৫	২৬৭৭	১৭৬৩	৪৪৪০	২৩
৬	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১১৩৯৫	৩৪৬২	২০৭২	৫৫৩৪	৪৮
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	১০৪২৫	১৪২৪	৬৭৪	২০৯৮	২০
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৯২৭৪	৮৭০	৬১২	১৪৮২	১৯
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৪১৩৮	৬৯২	৩৭৫	১০৬৭	২৬
১০	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১১১৯২৭৫	০	০	০	০
১১	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৯৭০০৪	০	০	০	০
১২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	৭৫৫	২১৮	৫৯	২৭৭	৩৭
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬০২	৪২৩	০	৪২৩	৭০
১৪	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৮১	৬৯০	৩১০	১০০০	৬৭
১৫	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৩৭	১৮৩	১৫৫	৩৩৮	২৩
১৬	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৭৯২	১২৯১	৪৫২	১৭৪৩	৯৭
১৭	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৭৪২	১১১৯	৫১২	১৬৩১	৯৪
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৭৬৭	১১৯২	২৩৬	১৪২৮	৮১

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	মোট শিক্ষার্থী	আবাসিক শিক্ষার্থী			শতকরা হার
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১৯	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৫৫	১৩৬৪	১৮৮	১৫৫২	৭৯
২০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৫৮৭	১২২৮	১৬৮	১৩৯৬	৫৪
২১	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৮৫৮	৮০৬	৯০	৮৯৬	৪৮
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৭১৫	২৪৬	১৭৩	৪১৯	৫৯
২৩	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২০৯	০	০	০	০
২৪	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫১৭	২৭২	০	২৭২	১৮
২৫	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	৮০৭	১১৪	৬৪	১৭৮	২২
২৬	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭৪	২২৭	৭০	২৯৭	৭৯
২৭	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬১০	৪৭৩	১১৮	৫৯১	৯৭
২৮	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০	০	০	০	০
২৯	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্	২৫২৮	০	০	০	০
৩০	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়-রংপুর	৯৬৩	০	০	০	০
৩১	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯	০	০	০	০
	মোট	1382216	৪০৭৭৫	১৯২৭৯	৫৯৭৫৪	৪.৩১

উপর্যুক্ত ছকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশের ৩৪টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ) ৬৮.১১% ছাত্র এবং ৩১.৮৯% ছাত্রী আবাসিক সুবিধা ভোগ করছে। অর্থাৎ ছাত্রের তুলনায় ৩৬.২২% ছাত্রী কম আবাসিক সুবিধা ভোগ করছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন নিপীড়নের বিষয়টি বহুল আলোচিত। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রবণতা অনেক বেশি দৃশ্যমান। এ ধরনের ঘটনা নিন্দনীয় ও অমার্জনীয় অপরাধ। সব ঘটনা আবার প্রকাশিতও হয় না। পরীক্ষায় কম নম্বর প্রাপ্তির আশংকা, হুমকি কিংবা সামাজিক মর্যাদার কারণেও অনেকে মুখ খোলে না। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের বিধান নির্যাতনকারী দমনে যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র সাময়িক বরখাস্ত, কয়েক মাসের ছুটি দিলেই এই প্রবণতা নির্যাতনকারীকে নিবৃত্ত করবে না। বর্তমানে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যৌন নিপীড়ন রোধকল্পে দেশের প্রত্যেকটি উচ্চ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিনিধির

সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইনের কঠোর বিধান ও কমিটির সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক এবং বলিষ্ঠ কার্যক্রম এ ধরনের অপরাধ রোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়াও নারীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাত্রাকে হ্রাস করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে যখন উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়, তখন মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ থাকে ১১ শতাংশের বেশি, কিন্তু যখন তারা দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় তখন তাদের অংশগ্রহণ কমে যায় ১১ থেকে ১২ শতাংশ।[২৫] মেয়েশিশুর ঝরে পড়ার কারণ হলো পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। প্রাথমিক স্তরের পর মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েশিশুর স্কুলে গমনের প্রতিকূল পরিবেশ, স্যানিটেশন সমস্যা, বাল্যবিবাহ, আর্থিক সংকট, স্কুলের দূরত্ব, সাংসারিক কাজে পরিবারকে সহায়তা দান ইত্যাদি কারণ এ জন্যে দায়ী। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ এবং প্রদত্ত সুবিধাদি এই ঝরে পড়াকে হ্রাস করেছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রোধ করা যায়নি। এই ঝরে পড়াও উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের হারকে হ্রাস করেছে অনেকাংশে।

উপসংহার

পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অধস্তনতা ও আধিপত্যশীল কাঠামোর বিরুদ্ধে নারীর নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ পর্যন্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, এটি নারীকে দক্ষ মানবশক্তিতে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করতে সহায়তা করে। আমরা মনে করি যে, নারীদের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান পাথেয় হলো উচ্চশিক্ষা, কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলো নারীর উচ্চশিক্ষার পথকে সমস্যাসংকুল করছে। নানারকম প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত ও ধর্মীয় সামাজিক চরিত্রে বিন্যস্ত সমস্যাসমূহ এ প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি। নারীর শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের সরকারের ভূমিকা কম নয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান এই স্তরের শিক্ষার হারকে বাড়িয়েছে। উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতা একমাত্র ভিত্তি হওয়ায় এ স্তরের নারীদের কোটাভিত্তিক সুবিধা থাকছে না। এ প্রশ্ন করাও অবান্তর। তবে উচ্চশিক্ষায় বিরাজিত সমস্যা চিহ্নিত করে বিভিন্ন নীতিমালায় এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। এই নীতিমালায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমতায়নের কথা বলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষা কমিশন-২০০৩ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালায় নারীকে শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে বৈষম্য দূর করার জন্য যথাযথ নীতি, বিধান ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।[২৬] জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ একটি বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত শিক্ষানীতি। এই নীতিমালায় শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানো, নারী শিক্ষাখাতে বিশেষ বরাদ্দসহ

নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে।[২৭] জাতীয় নারীউন্নয়ন-নীতিমালা এবং বিভিন্ন শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষা সম্প্রসারণের মধ্যদিয়ে নারীকে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এ সব নীতিমালায় মানবসম্পদ গড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর উচ্চশিক্ষায় নারীর অবস্থা ও অবস্থানের সমস্যা চিহ্নিত পূর্বক কোনো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা উল্লিখিত হয়নি এবং এর পূর্ণ বাস্তবায়নও হয়নি। ফলে নারীকে দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা বিঘ্নিত হচ্ছে। শুধুমাত্র নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই যথেষ্ট নয়, এ-জন্যে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, সুষ্ঠু সংস্কৃতির অবাধ চর্চা ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন — যার মধ্য দিয়ে নারীর উচ্চশিক্ষায় অগ্রগতি আসতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

1. আবদুল মালেক ও অন্যান্য, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা,* বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১০
2. মো. আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা ও প্রসার,* ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃ. ৮
3. আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা: সংস্কারের ভবিষ্যৎ,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা, পঞ্চবিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, জুন ২০০৭, পৃ. ১৫৬
4. আবদুল মালেক ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
5. বিস্তারিত দেখুন, *মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র,* জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ৫-১৬
6. ফরিদা আখতার সম্পাদিত, *আটই মার্চ: আর্ন্তজাতিক নারী দিবস,* নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১ মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৫
7. *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন,* জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা-২০০১
8. উদ্ধৃত: ফারাহ্ দীবা চৌধুরী, *বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী,* আল মাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,* ঢাকা ২০০২, পৃ. ২৭৫
9. শাহীন রহমান, *মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল; জেন্ডার প্রেক্ষিত,* উন্নয়ন পদক্ষেপ, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ৩৬
10. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৮
11. ঐ
12. *দৈনিক প্রথম আলো,* ঢাকা, ১৩ জুলাই ২০১২, পৃ. ৩
13. মো: আবদুল্লাহ আল- মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫
14. ঐ
15. ঐ, পৃ. ৫৫৮
16. ঐ

17. ঐ, পৃ. ৫৮০
18. *দৈনিক প্রথম আলো,* ঢাকা, ১৩ জুলাই, ২০১২
19. *দৈনিক প্রথম আলো,* ঢাকা ৮ মার্চ ২০১২, পৃ. ৯
20. ঐ
21. *৩৫তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, পৃ. ৪০৩
22. *৩৮তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১,* বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, পৃ. ১২৮
23. ঐ, পৃ. ১২৭
24. *৩৬তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, পৃ. ৪৯৯
25. *দৈনিক প্রথম আলো,* ঢাকা, ৮ মার্চ ২০০৯
26. বিস্তারিত দেখুন, *জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩,* প্রতিবেদন, ঢাকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
27. বিস্তারিত দেখুন, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২০/ডিসেম্বর ২০১৩

সরকার ঘোড়াঘাটের তিন গম্বুজ মসজিদ : গঠনশৈলী ও উৎস পর্যালোচনা

এ টি এম রফিকুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

মোগল শাসনামলে সমগ্র সুবা বাংলা ১৯টি সরকার ও ৬৮৮টি মহলে বিভক্ত ছিল যার মধ্যে সরকার ঘোড়াঘাট ছিল অন্যতম। সরকার ঘোড়াঘাট ২৪০৬ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৯০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত যার উত্তরে কোচ বিহার রাজ্য, পশ্চিমে সরকার পাঞ্জারা ও বারবকাবাদ, দক্ষিণে সরকার বারবকাবাদ ও বাজুহা এবং পূর্বে সরকার বাজুহা ও কোচবিহার রাজ্য অবস্থিত। এ সময় সরকার ঘোড়াঘাট তথা সমগ্র বাংলায় অসংখ্য ধর্মীয় ও লোকায়ত ইমারত নির্মিত হতে দেখা যায়। ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে আবার অধিকাংশই ছিল তিন-গম্বুজ রীতির মসজিদ যেগুলো উত্তর ভারতীয় তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মোগল রীতির এক জনপ্রিয় অনুকরণ। এই তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদসমূহ আবার দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত— ক) বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত মসজিদ যার উভয় পার্শ্বের গম্বুজ অপেক্ষাকৃত ছোট, এবং খ) সম-আকৃতির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ যার 'বে'সমূহ সমায়তনের বিধায় এদের ছাদও সমরূপ তিনটি গম্বুজে আচ্ছাদিত। উল্লেখ্য যে, সরকার ঘোড়াঘাট অঞ্চল বলতে বর্তমান দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, বৃহত্তর রংপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, বৃহত্তর বগুড়া জেলার (বর্তমানে সমগ্র জয়পুরহাট জেলাসহ) উত্তর-পূর্বাংশ এবং বৃহত্তর রাজশাহী জেলার (বর্তমান নওগাঁ জেলা) উত্তরাংশ ব্যাপী বিস্তৃত ভূ-ভাগকে চিহ্নিত করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে কেবলমাত্র সরকার ঘোড়াঘাট অঞ্চলের অন্তর্গত বিদ্যমান সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদসমূহের ভূমি-নকশা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিশেষ উল্লেখপূর্বক উৎস পর্যালোচনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

ভূমিকা

মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫) রাজা টোডরমল প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৫৮২ সনে সমগ্র সুবা বাংলাকে ১৯টি সরকার ও ৬৮৮টি মহলে বিভক্ত করেন।[১] সুবা বাংলার ১৯টি সরকারের মধ্যে সরকার ঘোড়াঘাট বরেন্দ্র ভূমির উত্তরাঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল এবং এ সরকারের কেন্দ্রীয় শহর ছিল ঘোড়াঘাট। কিন্তু ১৭৬৫ সনে ইংরেজ সেনাপতি মি. কোট্রিলের নেতৃত্বে ঘোড়াঘাট নগর বিজিত হলে প্রাথমিক অবস্থায় প্রায় সমগ্র উত্তর বঙ্গ নিয়ে ঘোড়াঘাট নামক বৃহৎ জেলা গঠন করা হয় এবং ১৭৯৩ সনে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ফলে ঘোড়াঘাট জেলার নাম পরিবর্তন করে দিনাজপুর জেলা নামকরণের মধ্য দিয়ে ঘোড়াঘাট

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

থেকে সদর দপ্তর দিনাজপুরে স্থানান্তরিত হয়। ফলে আলোচ্য নগরের গুরুত্ব কার্যত হারিয়ে যায়।[২] সরকার ঘোড়াঘাটের পরিসীমা বা বিস্তৃতি কতটুকু ছিল সে সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা পাওয়া না গেলেও আবুল ফজল রচিত *Ain-i-Akbari* (Vol. II), গোলাম হোসেন সলীমের *রিয়াজ-উস-সালাতিন,* হেনরী ব্লকম্যানের *Contributions to the Geography and History of Bengal*, জন বীম্‌স্ রচিত প্রবন্ধ "Notes on Akbar Shuba with reference to the Ain-i-Akbari" এবং ইরফান হবিবের *An Atlas of the Mughal Empire* প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণ থেকে টোডরমল কর্তৃক বিভক্ত সরকারসমূহের অবস্থান ও সীমানা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে এ সরকারের ভৌগোলিক পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৩] জন বীম্‌স্ ও ইরফান হবিব *আইন-ই-আকবরী*-র বর্ণনা অনুযায়ী সুবা বাংলার ১৯টি সরকার ও কিছু মহল চিহ্নিতকরণ পূর্বক মানচিত্র সন্নিবেশ করেছেন (মানচিত্র-১)। এসব সূত্রমতে সরকার ঘোড়াঘাট অঞ্চল বলতে বর্তমান দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, বৃহত্তর রংপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং বৃহত্তর বগুড়া জেলার উত্তর-পূর্বাংশ (বর্তমানে সমগ্র জয়পুরহাট জেলাসহ) এবং বৃহত্তর রাজশাহী জেলার (বর্তমান নওগাঁ জেলা) উত্তরাংশ ব্যাপি বিস্তৃত ভূ-ভাগকে চিহ্নিত করা যায় (মানচিত্র-২)। *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী সরকার ঘোড়াঘাটের যে ভৌগোলিক সীমারেখা পাওয়া যায় সে-মতে বর্তমানকালের বৃহত্তর বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ, গাবতলী, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, কালাই, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি ও আক্কেলপুরের কিয়দাংশ; রংপুর জেলার পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও বদরগঞ্জসহ সমগ্র গাইবান্ধা জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, ফুলবাড়ী ও পার্বতীপুরের বৃহদাংশসহ নওগাঁ জেলার বদলগাছী ও ধামইরহাটের কিয়দংশ এবং মালদহ জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল (মানচিত্র-৩)। সরকার ঘোড়াঘাট ২৪০৬ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তরে কোচ বিহার রাজ্য, পশ্চিমে সরকার পাঞ্জারা ও বারবকাবাদ, দক্ষিণে সরকার বারবকাবাদ ও বাজুহা এবং পূর্বে বাজুহা ও কোচবিহার রাজ্য অবস্থিত।

১৫৭৬ সনে বাংলার ইতিহাসে এক যুগ পরিবর্তনকারী ঘটনা। অর্থাৎ উক্ত সনে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ন্যায় স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রেও এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটে। সুলতানি আমলে দেশজ উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত স্থাপত্যকলার নির্মাণশৈলী ও আলঙ্কারিক রীতি-নীতি মোগলদের নিকট সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হলেও একেবারে পরিত্যাজ্য হয়নি। বরং কিছু পরিবর্তন ও কিছু নতুন সংযোজনের মধ্য দিয়ে সুলতানি আমলে বাংলায় মসজিদ স্থাপত্যের যে ধারার উন্মেষ ঘটেছিল তা মোগল আমলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং এক নতুন ধারার মসজিদ নির্মাণের সূচনা হয়।

উদাহরণস্বরূপ পাবনা জেলার চাটমোহর মসজিদ (১৫৮১) ও বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২) উল্লিখিত বিষয়টির সমর্থনে উপস্থাপন করা যায়।[৪] মসজিদ দুটিতে সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের অনেক বৈশিষ্ট্য যেমন– উল্টানো বাটির ন্যায় গম্বুজাবৃত ছাদ, অবস্থান্তর পর্যায়ে পান্দানতিফের ব্যবহার, কার্নিস পর্যন্ত উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, বক্রাকার কার্নিস, কৌণিক খিলানের ব্যবহার, অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব, পোড়ামাটির অলঙ্করণ প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হলেও উভয় মসজিদের এক কক্ষ বিশিষ্ট নামাজঘর তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে' আবার একটি করে গম্বুজ দ্বারা আবৃত যা বাংলার স্থাপত্যে এক নতুন রীতির সূচনা করে, যে রীতি পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত আকারে সমগ্র মোগল বাংলায় ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়। যাহোক, মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা স্থাপত্যধারা প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা– (ক) ধর্মীয় স্থাপত্য (Religious architecture) ও (খ) লোকায়ত স্থাপত্য (Secular architecture)। ধর্মীয় স্থাপত্য হিসেবে বাংলাতেও প্রধানতম হলো মসজিদ, অতঃপর সমাধিসৌধ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, ঈমামবাড়া প্রভৃতি। অন্যদিকে লোকায়ত স্থাপত্যের মধ্যে প্রাসাদ, দুর্গ ও দুর্গ-নগরী, তোরণ, কাটরা, অফিসভবন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলায় মুসলমানদের নির্মিত ধর্মীয় ইমারতসমূহ বিশেষ করে মসজিদ ও সমাধিসৌধ এখনো যেভাবে টিকে রয়েছে সে হিসেবে টিকে থাকা লোকায়ত ইমারতের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, ধর্মীয় ইমারতসমূহ পরিত্যক্ত হলেও সাধারণ জনগণের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি, সম্মানবোধ ও ধর্মীয় ভয়-ভীতি সদা জাগ্রত থাকায় এদের উপকরণসমূহ লুণ্ঠিত হয়নি। পক্ষান্তরে লোকায়ত ইমারতসমূহের প্রতি জনগণের এ ধরনের অনুভূতি না থাকায় সেগুলো সহজেই অপহৃত হওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় নির্মিত বিদ্যমান ধর্মীয় ও লোকায়ত ইমারতসমূহের ভূমি-নকশা, গঠনশৈলী বা অবকাঠামো ও অলঙ্করণ কার্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে প্রতিটি ইমারতেই স্বদেশী ও বহির্দেশীয় নির্মাণ রীতির অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

ভূমি-নকশা ও অবকাঠামোগত ভিন্নতার কারণে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের প্রধানতম ও পবিত্র ধর্মীয় স্থাপত্য হিসেবে মসজিদসমূহকে নিম্নবর্ণিত ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা— (ক) প্রশস্ত কেন্দ্রীয় অংশসহ (Nave) বহু গম্বুজ মসজিদ, (খ) বহু গম্বুজ আয়তাকৃতির মসজিদ, (গ) এক গম্বুজ বর্গাকার মসজিদ, (ঘ) বারান্দাযুক্ত এক ও বহু গম্বুজ মসজিদ, (ঙ) গম্বুজ সংবলিত খোলা চত্বরবিহীন মসজিদ এবং (চ) প্রাচীর ঘেরা খোলা চত্বর-বিশিষ্ট মসজিদ। বাংলার বিদ্যমান মসজিদসমূহকে আবার গম্বুজের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত শিরোনামে উপস্থাপন করা যায়। যেমন— ১) এক গম্বুজ মসজিদ, ২)

তিন গম্বুজ মসজিদ, ৩) পাঁচ গম্বুজ মসজিদ, ৪) ছয় গম্বুজ মসজিদ, ৫) সাত গম্বুজ মসজিদ, ৬) নয় গম্বুজ মসজিদ, ৭) দশ গম্বুজ মসজিদ, ৮) পনর গম্বুজ মসজিদ, ৯) আটাশ গম্বুজ মসজিদ, ১০) পঁয়ত্রিশ গম্বুজ মসজিদ, ১১) চুয়াল্লিশ গম্বুজ মসজিদ, ১২) তেষটি গম্বুজ মসজিদ, ১৩) সাতাত্তর বা একাশি গম্বুজ মসজিদ, ১৪) তিনশ ছয় গম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি। সুলতানি আমলে বাংলায় তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের উদাহরণ পাওয়া না গেলেও মোগল আমলে এ ধরনের অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে গম্বুজের আকৃতির ওপর ভিত্তি করে তিন গম্বুজ রীতির মোগল আদর্শের মসজিদকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— ক) সম-আকৃতির তিন গম্বুজ মসজিদ ও খ) বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত মসজিদ। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে কেবলমাত্র সরকার ঘোড়াঘাট অঞ্চলের অন্তর্গত বিদ্যমান সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদসমূহের ভূমি-নকশা ও অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখপূর্বক উৎস পর্যালোচনার করা হয়েছে।

ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ (ভূমি-নকশা-১, আলোকচিত্র-১)

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদীর ডান তীরে অবস্থিত ঘোড়াঘাট দুর্গাভ্যন্তরে এ মসজিদটি অকেটাই ভগ্নদশা অবস্থায় বিদ্যমান। ইট নির্মিত এ মসজিদটি আয়তাকৃতির (১৭.২০ মি. × ৬.৪০ মি. এবং ১২.৯৫ মি. × ৪.৬৬ মি.)। আলোচ্য মসজিদের নামাজগৃহের পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ ছিল যেগুলোর মধ্যে দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথ এবং পূর্ব দেয়ালের সর্ব দক্ষিণের প্রবেশপথটি অদ্যাবধি অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। পূর্ব দিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত বহু খাঁজ খিলান বিশিষ্ট এবং সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত। এ বর্ধিত পরিকল্পনা উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং উভয় পার্শ্বের বহিস্থঃ কোণে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ (turret) সংযোজিত। পূর্ব ফাসাদের খিলানপথ বরাবর পশ্চিমের দেয়ালে তিনটি মিহরাব ছিল বলে অনুমেয় যার মধ্যে সর্ব দক্ষিণের মিহরাবটি দৃশ্যমান এবং এর গর্ভাংশ অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি কেন্দ্রীয় খিলানপথের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে কিছুটা বর্ধিত এবং এ বর্ধিত অংশের উভয় কোণে দুটি করে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ দ্বারা শোভিত ছিল। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় অবস্থিত অষ্টভুজাকৃতির বুরুজের নমুনা থেকে অনুমতি হয় যে, এর উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণেও অনুরূপ অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ ছিল এবং বুরুজগুলো একদা কার্নিসের ওপরে কিছু দূরে সম্প্রসারিত হয়ে নি ি দ্র ছত্রিতে সমাপ্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। দু'টি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহ তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে' আবার একটি করে গম্বুজ দ্বারা ছিল পরিবৃত। গম্বুজগুলো দরজাসমূহ,

মিহরাব এবং আড়াআড়ি খিলানের উপর স্থাপিত ছিল বলে অনুমিত হয়। কারণ খিলানগুলোর চিহ্ন এখনো পূর্ব ও পার্শ্ব দেয়ালে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মসজিদের সম্মুখে প্রাচীর বেষ্টিত একটি খোলা চত্বর ছিল। এ চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি অষ্টভুজাকৃতির ফাঁপা বুরুজের (২.৪৫ মি.) ভিত্তিমূল এখনও অবলোকন করা যায় (আলোকচিত্র-২) এবং এ বুরুজের ন্যায় আবেষ্টনী চত্বরের উত্তর-পূর্ব কোণেও অনুরূপ বুরুজ ছিল বলে মনে হয়। উক্ত বুরুজের অবস্থান থেকে নামাজগৃহের সম্মুখে উন্মুক্ত অঙ্গনের ধারণাটি সুস্পষ্ট। মসজিদের এ আবেষ্টনী খোলা চত্বরে প্রবেশের জন্য কোনো প্রবেশপথ থাকা যৌক্তিক। কিন্তু আবেষ্টনী প্রাচীরটি সম্পূর্ণরূপে খনন না হওয়ায় উল্লিখিত প্রবেশপথের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে বাংলার জ্ঞাত বিদ্যমান সুলতানি ও মোগল মসজিদসমূহের ন্যায় এ মসজিদের প্রবেশপথটিও সম্ভবত পূর্ব প্রাচীরের মধ্যাংশে নামাজগৃহের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর নির্মিত হয়েছিল। যেমন– ঘোড়াঘাটের কাজী সদর উদ্দীন মসজিদ (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে), এগারসিন্ধুর শাহ মুহাম্মদ মসজিদ (সপ্তদশ শতক), গৌড়ের শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ (১৬৩৯-৫৯), ঢাকার খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদ (১৭০৪-০৫), মাঝোপাড়া মসজিদ (অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে), মিঠাপুকুর মসজিদ (১৮১০) প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যায়। মসজিদটির দক্ষিণ পার্শ্বে একটি পাকা ইন্দারা রয়েছে এবং বর্তমানে এটি প্রত্নজঞ্জাল দিয়ে প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। সম্ভবত এটি ওজুর পানি সরবরাহের জন্য মসজিদ নির্মাণের সময় নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেয়ালের বিদ্যমান অংশে পলেস্তারায় সৃষ্ট আয়তাকার প্যানেল-নকশা দৃশ্যমান। ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্সিস বুকানন আবিষ্কৃত একটি শিলালিপির তথ্যানুযায়ী আলোচ্য মসজিদটি সরকার ঘোড়াঘাটের তদানীন্তন মোগল ফৌজদার জয়নুল আবেদীন কর্তৃক ১৭৪০-৪১ সনে নির্মিত হয়।[৫]

ফুলহার মসজিদ (ভূমি-নকশা-২, আলোকচিত্র-৩)

মসজিদটি করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ফুলহার গ্রামে অবস্থিত। আয়তাকৃতির এ মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট (১৮.০৫ মি. × ৬.৮৫ মি. এবং ১৫.২০ মি. × ৪.০৫ মি.)। এর পূর্ব দেয়ালে চতুষ্কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে রচিত তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা কিছুটা বড়। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বর্তমানে ইটের জাফরী দিয়ে বন্ধ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও উভয় পার্শ্বের প্রবেশপথগুলো সম্মুখ দিকে সামান্য বর্ধিত এবং এ বর্ধিত অংশের উভয় দিকে দুটি করে গোলাকার সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দিকের দেয়ালে চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান সংবলিত তিনটি মিহরাব

সন্নিবেশিত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা সামান্য বড় ও পশ্চাত দিকে কিছুটা বর্ধিত। এর উভয় প্রান্ত-সংলগ্ন দুটি গোলাকার বুরুজ কলসাকৃতির ভিত্তিভূমি থেকে ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগ দুটি খিলান দ্বারা সৃষ্ট তিনটি সম-আকৃতির 'বে'-র ছাদ হিসেবে অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর তিনটি গম্বুজ সন্নিবেশিত। গম্বুজের শীর্ষবিন্দুতে পদ্ম ও কলস- শিরোচূড়া বিদ্যমান। পিপার নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থানসমূহ ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। মসজিদের ছাদের উপরিভাগের চতুর্দিকে একটি অনুচ্চ ভূমি প্রসারিত। এর চার কোণায় সংযোজিত চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ বর্গাকৃতির ভিত্তিস্তর থেকে উঠে ছাদের উপরিভাগ পর্যন্ত বর্ধিত এবং এদের শিরোভাগ নি ি দ্র কিউপোলাতে সমাপ্ত। মসজিদটির আন্তঃ ও বহির্গাত্র বর্তমানে সামগ্রিকভাবে পলেস্তারায় আচ্ছাদিত।

আলোচ্য মসজিদের উন্মুক্ত অঙ্গনের (১৪.৩০ মি. × ১১.৭৮ মি.) পূর্ব প্রান্তে একটি দোচালা ইমারত (আলোকচিত্র-৪) অদ্যাবধি দণ্ডায়মান (৪.৫৭ মি. × ১.১৮ মি.)। এর সম্মুখ দেয়ালে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে একটি মাত্র প্রবেশপথ বিদ্যমান (০.৮৭ মি.)। এ প্রবেশপথ বরাবর অভ্যন্তরভাগে পূর্ব দেয়াল সংলগ্ন একটি অনুচ্চ মঞ্চ অবস্থিত (০.৪৫ মি. × ০.৩৭ মি.)। এর সম্মুখ দেয়ালের ঊর্ধ্বাংশে আয়তাকার প্যানেল নকশা ও প্যানেলগুলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন পুষ্প প্রস্ফুটিত বৃক্ষের নকশা খোদিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে দুটি কুলঙ্গি-নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কুলঙ্গিগুলো আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে সন্নিবেশিত। ইমারতটির কার্নিস বক্রাকার যা এক সারি আলঙ্কারিক ঠেস বা ব্রাকেটের (Bracket) মধ্যে অবস্থিত। এর নিম্নাংশ ছাঁচে তৈরি ব্যান্ড নকশায় সজ্জিত। আবার মসজিদের সম্মুখভাগে সমান্তরাল কার্নিসযুক্ত একটি চৌচালা ইমারত (৪.১৬ মি. × ২.৮০ মি.) অবস্থিত (আলোকচিত্র-৫)। এর সম্মুখ দেয়ালে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে একটি মাত্র প্রবেশপথ (০.৯১ মি.) সংযোজিত। এর অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ও প্রবেশপথের অবস্থান থেকে ধারণা করা যায় যে, এটি ইমাম সাহেবের আবাসস্থল হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। আলোচ্য মসজিদের উপরোক্ত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করলে ১৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত দরিয়াপুর মসজিদের (১৭১৭-১৮) সমসাময়িক বলে অনুমিত হয়।[৬]

কামদিয়া মসজিদ (ভূমি-নকশা-৩, আলোকচিত্র-৬)

ফুলহার মসজিদ থেকে ১০.৫ কি.মি. সোজা পশ্চিমে এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামদিয়া বাজারে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আলোচ্য মসজিদটি অবস্থিত। আয়তাকার পরিসরে (১৪.৮০ মি. × ৫.৮০ মি. এবং ১২.৫০ মি. × ৩.৫০ মি.) ইট দ্বারা নির্মিত এ মসজিদের পূর্ব গৃহমুখে চতুষ্কেন্দ্রিক রীতিতে নির্মিত তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি

পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা কিছুটা বড় ও সম্মুখদিকে সামান্য বর্ধিত। মসজিদটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও অনুরূপ একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব সন্নিবেশিত এবং কেন্দ্রীয় মিহরাব পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় ও পিছন দিকে সামান্য প্রসারিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের এ প্রসারিত অংশের উভয় পার্শ্বে আবার সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজিত। মিহরাবগুলো বহু খাঁজ খিলান বিশিষ্ট চতুষ্কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত। এক গলিপথ বিশিষ্ট নামাজগৃহটি দুটি খিলান দ্বারা তিনটি সম-বর্গকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-র ওপর একটি করে গম্বুজ সন্নিবেশিত যেগুলো অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজের নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থান চিরাচরিত বাংলা পান্দানতিফ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত এবং গম্বুজ শীর্ষে পদ্ম ও কলস শিরোচূড়া সংস্থাপিত। মসজিদের প্রতি কোণায় সংযোজিত কলস ভিত্তিভূমি থেকে উত্থিত অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজগুলো আনুভূমিক ক্ষেত্র ছেড়ে ওপরে উঠে নি দ্র ছত্রিতে সমাপ্ত। এদের শীর্ষদেশেও পদ্ম ও কলস শিরোচূড়া বিদ্যমান। মসজিদের কার্নিস সমসাময়িক মোগল মসজিদের ন্যায় ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল।

মসজিদ কমিটির ভাষ্যানুযায়ী নিকটবর্তী ফুলহার মসজিদের অব্যবহিত পরেই আলোচ্য মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, উভয় মসজিদের পরিকল্পনা, ব্যাপ্তি, দেয়ালের প্রশস্ততা ও বাহ্যিক অবকাঠামো অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। তা ছাড়া উভয় মসজিদের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন– শিরোচূড়াযুক্ত কন্দাকৃতির গম্বুজ, পিপার ওপর গম্বুজ স্থাপন, কেন্দ্রীয় মিহরাব ও কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের প্রক্ষিপ্ততা এবং সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজন, ভূমি থেকে ওপরে উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, অবতলাকৃতির মিহরাব কুলঙ্গি, চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানপথ, সমান্তরাল কার্নিস, পলেস্তারার ব্যবহার প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে, আলোচ্য মসজিদটিও অষ্টাদশ শতকের কোনো এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

মাস্তা মসজিদ (ভূমি-নকশা-৪, আলোকচিত্র-৭)

আলোচ্য মসজিদটি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে সোজা ৪.৫০ কি.মি. দক্ষিণে মাস্তা গ্রামে অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার (১০.৪৫ মি. × ৩.৮০ মি. এবং ৮.৭০ মি. × ২.০৫ মি.) এ মসজিদটি ইট দ্বারা নির্মিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত যে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি ঐতিহ্যগতভাবেই পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা বড়। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও একটি করে চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব সংস্থাপিত যেগুলো পূর্ব দেয়ালে অবস্থিত প্রবেশপথ বরাবর সন্নিবেশিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি উভয় পার্শ্বের মিহরাব দুটি অপেক্ষা কিছুটা বড় এবং পশ্চাৎ

দিকে সামান্য বর্ধিত। এভাবে আলোচ্য মসজিদের চার দেয়ালের অক্ষ বিন্দুতে প্রসারিত এবং এদের কৌণিক সীমান্তে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজিত। তা ছাড়া মসজিদের চারকোণায় সংযোজিত অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজগুলোর ভিত্তিভূমি কলসাকৃতির যেগুলো আনুভূমিক ক্ষেত্র ছেড়ে ওপরে উত্থিত এবং শিরোভাগ নিরেট কিউপোলাতে সমাপ্ত। আলোচ্য মসজিদের নামাজগৃহটি দুটি খিলান দ্বারা তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং তিনটি সম-আকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজগুলো আবার অষ্টভুজাকৃতি পিপার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অবস্থান্তর পর্যায় বাংলা পান্দানতিফ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। গম্বুজ শীর্ষবিন্দুতে পদ্ম ও কলস শিরোচূড়া সংস্থাপিত। মসজিদের অনুভূমিক ক্ষেত্র, পিপার নিম্নাংশ ও কৌণিক বুরুজের উপরিভাগের ছত্রিগুলোর চতুষ্পার্শ্ব সারিবদ্ধ মার্লন নকশায় সজ্জিত। মসজিদের সম্মুখ দিকের পূর্বভাগ একদা নানা ধরনের প্যানেল নকশায় সজ্জিত ছিল যার নমুনা অদ্যাবধি কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। মাস্তা মসজিদের ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলী সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে ১৭৬২ সনে নির্মিত লালমনিরহাট জেলার নয়ারহাট মসজিদ ও অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত রংপুর জেলার কাজীতাড়ী মসজিদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।[৭] আর এ কারণে মাস্তা মসজিদের নির্মাণ কালও অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বলে ধারণা করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

সাহেরদিঘি মসজিদ (ভূমি-নকশা-৫, আলোকচিত্র-৮)

আলোচ্য মসজিদটি সুরা মসজিদ থেকে ৩ কি.মি. উত্তরে এবং ঘোড়াঘাট উপজেলা থেকে ১০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে সিংড়া ইউনিয়নের রামপুর-তোপঘরিয়া গ্রামে অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার এ মসজিদটি (৯.১০ মি. × ৩.৬০ মি. এবং ৭.৯০ মি. × ২.৪২ মি.) পলেস্তারায় আচ্ছাদিত। মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে যেগুলো বহু খাঁজ খিলান বিশিষ্ট চতুষ্কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত ও আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে সন্নিবেশিত। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মসজিদের দক্ষিণ দিকে একটি মাত্র প্রবেশপথ বিদ্যমান। তবে উত্তর দিকে প্রবেশপথের স্থলে দুটি কুলঙ্গি সংস্থাপিত। পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব অবস্থিত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ ও গভীর এবং পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অনেকটাই প্যানেলাকৃতির। আলোচ্য মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাব কিছুটা বর্ধিত এবং এ অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি করে চারটি সংলগ্ন বুরুজ কলসাকৃতির ভিত্তিস্তর থেকে উঠে ভূমির উপরিভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পলেস্তারায় সৃষ্ট ফুলেল নকশায় বিশেষভাবে অলঙ্কৃত (আলোকচিত্র-৯)। তা ছাড়া আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে সন্নিবেশিত কেন্দ্রীয় মিহরাবের সম্মুখ ভাগ বহু খাঁজ খিলান নকশায় সজ্জিত এবং খিলানটি দুটি সংলগ্ন কোণ দণ্ড থেকে উত্থিত। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ দুটি খিলান দ্বারা তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং

নামাজগৃহের আচ্ছাদন হিসেবে অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর তিনটি গম্বুজ সংস্থাপিত ছিল যা বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। পিপার নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানসমূহ বাংলার ঐতিহ্যবাহী রীতি পান্দানতিফ পদ্ধতিতে পূরণকৃত। পিপার গোড়াতে খিলানাকৃতির প্যানেল নকশার অলঙ্করণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদের চার কোণায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ সমান্তরাল কার্নিস থেকে কিছুটা উপরে বর্ধিত যেগুলো একদা ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত ছিল যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে মসজিদটি পূর্ব উল্লিখিত মাস্তা মসজিদের (অষ্টাদশ শতক) সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।[৮] সুতরাং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে আলোচ্য মসজিদটিও যে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে নির্মিত হয়ে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বারিয়া মসজিদ (ভূমি-নকশা-৬, আলোকচিত্র-১০)

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ৮ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে বারিয়া নামক গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকৃতির (১৫.১০ মি. ও × ৬.৫০ মি. এবং ১১.৪০ মি. × ৩.৫০ মি.)। মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা আকৃতিতে বড়। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগে পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর একটি মাত্র অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব সন্নিবেশিত। মিহরাবটি অবতলাকৃতির, কিন্তু এর উপরিভাগে অর্ধ-গম্বুজ সদৃশ চালাছাদ বিদ্যমান। এ মিহরাবের পিছন দিকের দেয়াল কিছুটা বর্ধিত এবং বর্ধিত অংশের উভয় প্রান্ত-সংলগ্ন দুটি সরু ক্ষুদ্র বুরুজ কলসাকৃতির ভূমি থেকে উত্থিত হয়ে ক্ষেত্রের উপরিভাগ পর্যন্ত বর্ধিত। মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগ দুটি খিলান দ্বারা সৃষ্ট তিনটি বর্গাকৃতির 'বে'-র ছাদ হিসেবে অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর তিনটি সম-আকৃতির গম্বুজ সন্নিবেশিত। পিপার নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থান ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ পদ্ধতিতে আচ্ছাদিত। গম্বুজের শীর্ষবিন্দু পদ্ম ও কলস শিরোচূড়ায় শোভিত। মসজিদের ছাদের উপরিভাগের চতুর্দিকে একটি অনুচ্চ ক্ষেত্র বিদ্যমান। এর চারকোণায় সংযোজিত চারটি গোলাকার বুরুজ কলসাকৃতির ভিত্তিভূমি থেকে উঠে সমান্তরাল ক্ষেত্রের কিছু ওপরে প্রসারিত এবং নিরেট কিউপোলাতে সমাপ্ত। বারিয়া মসজিদটি নির্মাণ শৈলীগত দিক থেকে লালমনিরহাট জেলার নয়ারহাট মসজিদের (১৭৬২-৬৩) সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।[৯] সুতরাং, আলোচ্য মসজিদটিও অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়।

দরিয়াপুর মসজিদ (ভূমি-নকশা-৭, আলোকচিত্র-১১)

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন দরিয়াপুর গ্রামে এক প্রাচীন দিঘির পশ্চিম পাড়ে আয়তাকার এ মসজিদটি অবস্থিত (১৪.৭০ মি. × ৬.৩৫ মি. এবং ১২.৩৪ মি. × ৩.৮৫

মি.)। এর পূর্ব দেয়ালে চতুষ্কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি ঐতিহ্যগতভাবেই কিছুটা বৃহৎ ও সম্মুখ দিক বর্ধিত। সম্মুখভাগের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়াল তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত যেগুলো চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান সংবলিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির হলেও পার্শ্ববর্তী দুটি আয়তাকৃতির। তা ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে যা বর্তমানে জানালা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলান বহু খাঁজবিশিষ্ট চতুষ্কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত। এ খিলানগুলো আবার আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সন্নিবেশিত যার উপরিভাগে পাড় নকশা ও বদ্ধ মার্লন পদ্ধতির অলঙ্করণ বিদ্যমান। মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগ দুটি খিলান দ্বারা তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং পিপার ওপর সংস্থাপিত তিনটি গম্বুজ নামাজগৃহের আচ্ছাদন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কোণের ফাঁকা স্থান সারিবদ্ধ ইট দ্বারা তৈরি বাংলা পান্দানতিফ পদ্ধতিতে পূরণকৃত। গম্বুজগুলো চিরাচরিত পদ্ম ও কলসযুক্ত শিরোচূড়ায় শোভিত। আনুভূমিক ক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে রচিত বন্ধ মার্লন পদ্ধতির অলঙ্করণ দৃশ্যমান। মিহরাবগুলোর উভয় পার্শ্বে জোড়া-জোড়া আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতির বৃক্ষরাজিসহ বিভিন্ন ধরনের পুষ্প শোভিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরিভাগে একটি অগভীর প্যানেলের উভয়পার্শ্বে পলেস্তারায় সৃষ্ট গোলাপ সদৃশ নকশা বিশেষভাবে দর্শনীয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরিভাগে সংযোজিত ফার্সি ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটি ১৭১৭-১৮ সনে কোনো এক অমাত্য কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[১০]

মহিতলা পুকুর মসজিদ (আলোকচিত্র-১২)

মসজিদটি জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার অন্তর্গত ঐতিহাসিক নান্দাইল দিঘি থেকে ২.৫ কি.মি. উত্তরে মোহাইল গ্রামে অবস্থিত। ইট দ্বারা নির্মিত ও পলেস্তারায় আচ্ছাদিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকৃতির (৯.৩২ মি. × ৩.৪০ মি. এবং ৭.৭৬ মি. × ১.৯০ মি.)। এর সম্মুখ দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা কিছুটা বড় ও সম্মুখ দিকে সামান্য প্রসারিত। প্রবেশপথগুলোর খিলান চতুষ্কেন্দ্রিক ও বহু খাঁজ বিশিষ্ট এবং পলেস্তারায় রচিত ফুলেল নকশায় সজ্জিত (আলোকচিত্র-১৩)। আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে সন্নিবেশিত এ প্রবেশপথের খিলানগুলো গোলাকার কোণ দণ্ড থেকে উত্থিত যেগুলো আবার বিভিন্ন ফুলেল নকশায় শোভিত। মসজিদ স্থাপত্যের প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের স্থলে একটি করে ক্ষুদ্রাকার কুলঙ্গি সংস্থাপিত। তা ছাড়া সম্মুখ দিকের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব বিদ্যমান। পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও অনেকটা প্যানেল আকৃতির, অথচ কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং নামাজগৃহের আচ্ছাদন হিসেবে প্রতিটি 'বে'-র

ওপর একটি করে গম্বুজ সন্নিবেশিত ছিল যেগুলো বর্তমানে ধ্বংসযজ্ঞে নিপতিত। তা ছাড়া কোণসমূহ ভরাটের জন্য বাংলা পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহারের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের কার্নিস সমসাময়িক কালে নির্মিত মসজিদগুলোর ন্যায় ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হলেও এর কোণস্থিত বুরুজ অনুপস্থিত। এ ধরনের কোণস্থিত বুরুজবিহীন মসজিদের উদাহরণ হলো রংপুর জেলার বড় জামালপুর মসজিদ (অষ্টাদশ শতক)।[১১] জনশ্রুতি অনুসারে আলোচ্য মসজিদটি স্থানীয় কোনো ভূস্বামী কর্তৃক অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া নির্মাণ শৈলীগত দিক থেকে রংপুর জেলার বড় জামালপুর মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় এটিও যে অষ্টাদশ শতকের কোনো এক সময় নির্মিত তা সহজেই অনুমেয়।

সেনরা মসজিদ (আলোকচিত্র-১৪)

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলাধীন সেনরা গ্রামে অবস্থিত এ মসজিদটি অনেকটা ভগ্নদশা অবস্থায় দণ্ডায়মান। আয়তাকার পরিসরে নির্মিত (৭.৯৫ মি. × ২.৮৫ মি. এবং ৭.০৫ মি. × ১.৫৩ মি.) এ মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সংযোজিত গোলাকৃতির কোণস্থিত বুরুজের নমুনা থেকে ধারণা করা যায় যে, এর উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণেও অনুরূপ গোলাকার কোণস্থিত বুরুজ ছিল। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে' একটি করে উল্টানো চাঁড়ির ন্যায় গম্বুজ দ্বারা ছিল পরিবৃত। গম্বুজের নিম্নের ফাঁকা স্থান কৌণিকভাবে সজ্জিত ইটের বাংলা পান্দানতিফ রীতিতে ভরাটকৃত যার নমুনা অদ্যাবধি দক্ষিণ দিকের গম্বুজের নিম্নাংশে লক্ষ্য করা যায়। নামাজগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য সম্মুখ দেয়ালে চতুষ্কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা সামান্য বড় ও সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত। উল্লেখ্য যে, মসজিদটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের স্থলে কেবলমাত্র দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যভাগে একটি মাত্র কুলঙ্গি বিদ্যমান। চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান বিশিষ্ট এ প্রবেশপথগুলো আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সন্নিবেশিত। উক্ত ফ্রেমের উপরিভাগে একসারি বদ্ধমার্লন নকশা বিদ্যমান এবং এর উভয় পার্শ্বে ফুলেল নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগে পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর একটি মাত্র আয়তাকৃতির মিহরাব সন্নিবেশিত। মিহরাবটি পশ্চাৎ দিকে কিছুটা বর্ধিত এবং এ বর্ধিত অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি গোলাকার বুরুজ সংযোজিত যার একটি অদ্যাবধি অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। মসজিদের কার্নিস সমান্তরাল যার উপভিগের আনুভূমিক ক্ষেত্র বিদ্যমান।

আলোচ্য মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে (৪.৮০ মি. × ২.৮০ মি.) একটি দোচালা ইমারত অবস্থিত (আলোকচিত্র-১৫)। ইমারতটির পূর্ব দেয়ালে খিলানযুক্ত একটি প্রবেশপথ বিদ্যমান (০.৮০ মি. × ২.১০ মি.) এবং খিলানটি দুটি কোণ দণ্ড থেকে উত্থিত। এর উভয় পার্শ্বে বদ্ধ প্যানেল নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ প্যানেলগুলোর অভ্যন্তরে ফুল, লতা-পাতার নকশা খোদিত। এ প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি নকশা সন্নিবেশিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কুলঙ্গিগুলো আবার আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে সংস্থাপিত। বক্রাকার কার্নিসের ওপর দিয়ে এক সারি অলঙ্কৃত ঠেস শোভা বর্ধন করছে। ঠিক এর নীচ দিয়ে একটি অলঙ্কৃত ছাঁচে তৈরি ব্যান্ড নকশা নিয়মিত ছেদসহ কার্নিসের উভয় প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত যা লজেন্স মোটিফ-এ অলঙ্কৃত। ভূমি পরিকল্পনা ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ওপরে বর্ণিত ফুলহার (অষ্টাদশ শতক) ও কামদিয়া মসজিদের (অষ্টাদশ শতক) সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় আলোচ্য মসজিদটিও একই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

কুমেদপুর জামি মসজিদ (ভূমি-নকশা-৮, আলোকচিত্র-১৬)

পলেস্তারায় আচ্ছাদিত আয়তাকৃতির (১৩.৫০ মি. × ৫.২০ মি. এবং ১১.১০ মি. × ২.৮০ মি.) এ মসজিদটি রংপুর জেলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ৭ কি.মি. পশ্চিমে কুমেদপুর গ্রামের চৌধুরী বাজার নামক স্থানে অবস্থিত। মসজিদের চার কোণায় চারটি গোলাকার বুরুজ সংযোজিত যেগুলো জমির ওপরে উত্থিত ও কিউপোলা দ্বারা মণ্ডিত। প্রতিটি কিউপোলার শীর্ষবিন্দুতে আবার পদ্ম ও কলসাকৃতির শিরোচূড়া বিদ্যমান। নামাজগৃহের পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ বর্তমানে জানালা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্ব দিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত ও সম্মুখদিকে প্রসারিত। এ পরিকল্পনা উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথেও দেখা যায়। বর্ধিত অংশের উভয় পার্শ্বে আবার গোলাকৃতির সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজিত যেগুলো ভূমি ছেড়ে ওপরে উত্থিত ও কিউপোলাতে সমাপ্ত। তা ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের বহির্গাত্রে পলেস্তারায় সৃষ্ট আয়তাকার প্যানেল নকশায় অলঙ্কৃত। পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আয়তাকৃতির এবং পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির। কেন্দ্রীয় মিহরাবটিও পশ্চাৎ দিকে কিছুটা প্রসারিত এবং প্রসারিত অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি গোলাকার সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজিত। নামাজগৃহের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় মিহরাব সংলগ্ন উত্তর দিকে তিন ধাপ বিশিষ্ট একটি প্রস্তর মিম্বর সংস্থাপিত। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-র ছাদ হিসেবে

অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর তিনটি গম্বুজ সন্নিবেশিত। পিপার নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থানসমূহ ত্রিভুজাকৃতির বাংলা পান্দানতিফ পদ্ধতিতে আচ্ছাদিত। গম্বুজের বহির্ভাগের গোড়াতে বদ্ধ মার্লন পদ্ধতির অলঙ্করণ দৃশ্যমান। তা ছাড়া গম্বুজের শীর্ষবিন্দুতে পদ্ম ও কলস শিরোচূড়া বিদ্যমান। মসজিদের ছাদের উপরিভাগের চতুর্দিকে একটি অনুচ্চ ভূমি প্রসারিত এবং কার্নিস ভূমির সঙ্গে সামান্তরাল। ভূমিবিন্যাস ও গঠনশৈলীর দিক থেকে আলোচ্য মসজিদটি লালমনিরহাট জেলার নয়ারহাট মসজিদের (১৭৬২-৬৩) সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।[১২] সুতরাং, নির্মাণ শৈলীগত সাদৃশ্যের কারণেই ধারণা করা যায় যে, আলোচ্য মসজিদটি হয়তবা অষ্টাদশ শতকের কোনো এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

হলিগনা ঈদগাহ মসজিদ (ভূমি-নকশা-৯, আলোকচিত্র-১৭)

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ১৩ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মৃত প্রায় করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে মসজিদটি অবস্থিত। আয়তাকৃতির (৯.৮৫ মি. × ৩.৮০ মি. এবং ৮.৩০ মি. × ২.৩৫ মি.) তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি পোড়ামাটির ফলক সমৃদ্ধ মোগল-বাংলার এক অনন্য উদাহরণ। আলোচ্য মসজিদের নামাজগৃহের পূর্ব দেয়ালে তিনটি বহু খাঁজ খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ বিদ্যমান থাকলেও উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশপথ অনুপস্থিত। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের স্থলে বহির্গাত্রে বৃহদাকৃতির প্যানেল সদৃশ কুলঙ্গি সন্নিবেশিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী দুটি প্রবেশপথ অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ এবং সম্মুখ দিকে বর্ধিত। এ বর্ধিতাংশের উভয় পার্শ্বে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজনের চিহ্ন বিশেষভাবে শনাক্ত করা যায়। মসজিদের চার কোণায় সংযোজিত চারটি গোলাকৃতির বুরুজ সমান্তরাল কার্নিস থেকে কিছু দূরে উপরে উত্থিত এবং এদের শিরোভাগ নি ি দ্র কিউপোলাতে সমাপ্ত। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-র ওপর একটি করে গম্বুজ অষ্টভুজাকৃতি পিপার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পিপার নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানসমূহ ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। গম্বুজ শীর্ষবিন্দুতে পদ্ম-পাপড়ি থেকে উত্থিত কলস শিরোচূড়া বিদ্যমান। মসজিদ স্থাপত্যের চিরাচরিত রীতি অনুসারে পূর্ব দেয়ালের তিনটি খিলানপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি অবতল মিহরাব সন্নিবেশিত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী দুটি মিহরাব অপেক্ষা সামান্য বড়। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আবার কেন্দ্রীয় খিলানপথের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে কিছুটা বর্ধিত এবং এ বর্ধিত অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য মসজিদের সম্মুখভাগের বহির্গাত্রে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য মসজিদটির অপর তিন দিকের দেয়ালগাত্র পলেস্তারায় আচ্ছাদিত। এ-সব পোড়ামাটির অলঙ্করণে বিষয়বস্তু হিসেবে ফুলেল নকশা, গোলাপসদৃশ নকশা, বৃক্ষলতানো চারা গাছের নকশা প্রভৃতি দৃশ্যমান (আলোকচিত্র-

১৮)। আলোচ্য মসজিদের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন– দুটি খিলান দ্বারা বিভক্ত এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহ, কেন্দ্রীয় মিহরাব ও কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজন, গোলাকার কোণস্থিত বুরুজ, সরল রৈখিক কার্নিস, পলেস্তারার ব্যবহার, চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণে অনুমান করা যায় যে, আলোচ্য মসজিদটি অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

পর্যালোচনাঃ সরকার ঘোড়াঘাট অঞ্চলের উপরোক্ত বিদ্যমান মসজিদসমূহের নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। এ-সব মসজিদের এক কক্ষ বিশিষ্ট নামাজগৃহ তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে' আবার একটি করে গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। অর্থাৎ উল্লিখিত মসজিদসমূহ সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির মোগল-আদর্শ মসজিদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার স্থাপত্যে পাবনার চাটমোহর মসজিদ (১৫৮১) এবং বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২) তিন গম্বুজ রীতির মোগল-আদর্শ নকশা মসজিদের প্রথম জ্ঞাত উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।[১৩] মোগল-বাংলার আলোচ্য নির্মাণ রীতিটির আদি উৎস উত্তর ভারতে অর্থাৎ তিন গম্বুজ মোগল-আদর্শ নকশার মসজিদ নির্মাণের এ রীতিটি ভারতীয়দের আবিষ্কার। প্রসঙ্গত বলা যায় দিল্লীর মতি মসজিদ (১৬৬২) ও সুনেহরি মসজিদ (১৭২১) *রিওয়াক* বা বারান্দাবিহীন তিন গম্বুজ রীতির মোগল-আদর্শ নকশার মসজিদের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আবৃত মসজিদ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম লোদী আমলে নির্মিত হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ দিল্লীর বড় গুম্বাদ মসজিদ (১৪৯৪) ও মথ্-কি- মসজিদ (১৫০৫) এবং পরবর্তীকালে সুর আমলে নির্মিত বিহারের রোটাসগড় মসজিদ (১৫৪৩) ও হাবাস খান মসজিদের (১৫৭৮) নামোল্লেখ করা যেতে পারে।[১৪] ভারতীয় তিন গম্বুজ মসজিদ নির্মাণের এ রীতিটি তুর্কী বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের সংক্ষিপ্তকরণ অথবা পারস্যের *ইওয়ান-ই-কারখা* রীতির বর্ধিতায়ন বলেই মনে হয়, যে *ইওয়ান-ই-কারখা* রীতির ইমারত কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও উভয় পার্শ্বস্থিত নলাকৃতির খিলান ছাদের সমন্বয়ে গঠিত।[১৫] সুতরাং বলা যায় যে, বাংলার স্থাপত্যে তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ নির্মাণের যে ধারার সূচনা হয়েছিল তা ভারতীয় তিন গম্বুজ রীতিরই অনুকরণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেন্দ্রীয় মিহরাব ও কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের বর্ধিত অংশের বহিস্থঃ কোণে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজন রীতিটি বাংলার স্থাপত্যে সর্বপ্রথম মোগল আমলে অনুসৃত হয়। এ রীতির প্রথম জ্ঞাত উদাহরণ সম্ভবত বগুড়া জেলার খোন্দকার তোলা মসজিদ (১৬৩২)।[১৬] উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের প্রক্ষিপ্ততা এবং উভয় কোণে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজনের রীতিটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে মালদহ জামি মসজিদে (১৫৯৫) সর্বপ্রথম দেখা যায়।[১৭] কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজনের এ রীতিকে সেলযুক-পারস্য এবং আনাতোলিয়ার স্থাপত্য রীতির অনুকরণ বলেই মনে হয়।[১৮] ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে উক্ত

রীতির প্রথম জ্ঞাত উদাহরণ হলো দিল্লীর আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ (১১৯৯) যা পরবর্তীকালে দিল্লীর মথ-কি-মসজিদ (ষোড়শ শতক) ও কিলা-ই-কুহনা মসজিদেও (১৫৪১) অনুসৃত হতে দেখা যায়।[১৯] আলোচ্য রীতিটি আরো সুচারুরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল দিল্লীর প্রাদেশিক মুসলিম স্থাপত্যে (গুজরাট স্থাপত্যে) যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো আহমদাবাদ জামি সমজিদ (১৪২৪)।[২০] অবশ্য এটি পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপে ভারতীয় মোগল স্থাপত্যে উৎকর্ষতা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ ফতেপুর সিক্রি জামে মসজিদ (১৫৭৫), দিল্লি জামি মসজিদ (১৬৫০-৫৬) ও লাহোরের বাদশাহী মসজিদের (১৬৭৩-৭৪) নামোল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত মোগল নির্মাণ শৈলীটি পারসিক স্থাপত্য রীতি থেকে অনুসৃত বলেই ধারণা করা হয়। যাহোক ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের এ নির্মাণ রীতিটি পরবর্তীকালে বাংলার স্থাপত্যে বিশেষ করে মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে যার অনন্য উদাহরণ হলো সরকার ঘোড়াঘাটের আলোচ্য মসজিদসমূহ।

এতদাঞ্চলের বিদ্যমান ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ ও সাহেরদিঘি মসজিদে অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব পরিদৃষ্ট হলেও অপরাপর মসজিদে আয়তাকার ও অর্ধ-বৃত্তাকৃতির অবতল মিহরাব লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতি মিহরাবের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যে সর্বপ্রথম মোগল আমলেই পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার ধানমণ্ডিস্থ ঈদগাহের (১৬৪০) নামোল্লেখ করা যেতে পারে।[২১] প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বাংলার স্থাপত্যে এ ধরনের অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতি মিহরাবের আরো উদাহরণ পাওয়া যাবে কাজী সদর উদ্দীন মসজিদ ও ভাঙ্গনী মসজিদে। বলা বাহুল্য এ ধরনের অর্ধ-অষ্টাভুজাকৃতির মিহরাব নির্মাণের পরিকল্পনা উত্তর ভারতীয় মোগলদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত যার অন্যতম উদাহরণ হলো দিল্লি জামি মসজিদ ও লাহোরের বাদশাহী মসজিদ। উত্তর ভারতীয় এ নির্মাণ পরিকল্পনা পরবর্তীকালে বাংলার স্থাপত্যে অনুসৃত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। তা ছাড়া মুসলিম স্থাপত্যে অর্ধ-বৃত্তাকার অবতল মিহরাব নির্মাণের ধারণা সম্ভবত প্রাক-মুসলিম সিরীয় গীর্জার এ্যাপস হতে অনুসৃত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।[২২] সমগ্র মুসলিম স্থাপত্যে এ ধরনের অবতলাকার মিহরাবের ব্যবহার প্রথম লক্ষ্য করা যায় দামেস্ক জামি মসজিদে (৭০৫-১৫) যা টেমিনসের অভ্যন্তরে অবস্থিত গির্জার এ্যাপসের অনুকরণ বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের ঐতিহ্যবাহী এ রীতিটি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যেও অনুসৃত হয়েছিল এবং এর অসংখ্য উদাহরণও রয়েছে। যেমন– দরসবাড়ী মসজিদ (১৪৭৯), ছোটসোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯), তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০), ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৭৯) প্রভৃতি।

মোগল বাংলার স্থাপত্যে সাধারণত দু-ধরনের মসজিদ নির্মিত হতে দেখা যায়— একটি হলো আবৃত মসজিদ (covered type) এবং অপরটি প্রাচীরঘেরা খোলা চত্বরবিশিষ্ট

মসজিদ। আলোচ্য অঞ্চলের বিদ্যমান ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ ও মাঝোপাড়া মসজিদে বারান্দাবিহীন খোলা চত্বরের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। বারান্দাবিহীন প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত অঙ্গনের প্রচলন বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে কোনো নতুন উদাহরণ নয় বরং এর উৎসস্থল ছিল ভারতে যার উদাহরণ হলো নাগাউরের শাম্‌স্‌ মসজিদ (১২১১-৩৬)।[২৩] বারান্দাবিহীন উন্মুক্ত অঙ্গনের ব্যবহার উক্ত মসজিদটি স্পেনে প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক নির্মিত কর্দোভা মসজিদ (৭৮৫-৮৭) এবং ৮৩৬ সনে জিয়াদত আল্লাহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত কায়রাওয়ান মসজিদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[২৪] বাংলার স্থাপত্যে এ ধরনের আরো কিছু মসজিদ নির্মাণের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন– গৌড়ের শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ (১৬৩৯-৪০), দিনাজপুরের কাজী সদর উদ্দীন মসজিদ, বগুড়ার মাঝোপাড়া মসজিদ প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, এসব মসজিদের সম্মুখে প্রাচীর ঘেরা খোলাচত্বর থাকলেও প্রাচীরে কোনো *রিওয়াক* বা বারান্দার ব্যবস্থা ছিল না। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই সর্বযুগে তুলনামূলকভাবে মসজিদই অধিক সংখ্যক নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম স্থাপত্যের প্রাণরূপী প্রধান অঙ্গ মসজিদের সংখ্যা সর্বাধিক। বাংলার স্থাপত্যেও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। আর মসজিদের মুখ্য উপাদান হলো *জুল্লাহ* বা নামাজঘর (sanctuary)। তা ছাড়া সময়ের বিবর্তনে ও যুগের প্রয়োজনে *সাহন* বা খোলা চত্বর (courtyard), রিওয়াক বা বারান্দা, মিম্বর, মিহরাব, মিনার এবং ওজুখানা মসজিদ স্থাপত্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু বাংলার স্থাপত্যে অধিকাংশ মসজিদই রিওয়াক ও *সাহন* ব্যতিরেকে আবৃত নকশায় নির্মিত। অর্থাৎ বাংলার স্থাপত্যে কেবল *জুল্লাহ* বা নামাজঘর-কেন্দ্রিক মসজিদ স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে যেগুলোকে আবৃত মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আর এ ধরনের মসজিদ নির্মাণের পিছনে বাংলার প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত কারণই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুমান করা যায়। এরূপ বৈরী আবহাওয়ার কারণে সম্ভবত গ্রাম-বাংলার বাড়ি-ঘরগুলো আবৃত (ঘর ও বারান্দাসহ) পরিকল্পনায় নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং এ ধরণের ঘর ও বারান্দার সমন্বয়ে নির্মিত গ্রাম-বাংলার আবৃত ঘর-বাড়ির পরিকল্পনা পরবর্তীকালে ইট নির্মিত আবৃত মসজিদ নির্মাণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

সরকার ঘোড়াঘাট অঞ্চলের বিদ্যমান ফুলহার ও সেনরা মসজিদ সংলগ্ন দোচালা ইমারতসমূহ যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে। সেনরা মসজিদ সংলগ্ন দোচালা ইমারতটির অভ্যন্তরীণ ভাগ যথেষ্ট সংকীর্ণ যা বসবাসের অনুপযোগী। এটি পাঠাগার হিসেবেও ব্যবহারের কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। স্থানীয়ভাবে এটি দরগাহ নামে পরিচিত। যদিও এর অভ্যন্তরে কবরের চিহ্নমাত্র নেই। রাজশাহী জেলার কিসমত মারিয়া মসজিদ সংলগ্ন এ ধরনের দোচালা ইমারত দৃশ্যমান যাকে জনাব সোহরাব উদ্দীন আহম্মেদ দরগাহ্‌ বা সমাধি

হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২৫] আবার ফুলহার মসজিদ সংলগ্ন দোচালা ইমারতের অভ্যন্তরের অনুচ্চ একটি মঞ্চের অবস্থান থেকে ধারণা করা যায় যে, ইমারতটি ছাত্রদের পাঠদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খনন আবিষ্কারের ফলে সুলতানি আমলে নির্মিত মহাস্থানগড় মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম আইলের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দেয়াল সংলগ্ন দুটি অনুচ্চ মঞ্চের ভিত উন্মোচিত হয়েছে যার সম্পর্কে গবেষক মহলের ধারণা উক্ত মঞ্চ দুটি নামাজান্তে ছাত্রদের পাঠদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকের বসার আসন হিসেবে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।[২৬] এ ধরনের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য হয়তো পারস্য দেশীয় মসজিদ-পরিকল্পনা থেকে গৃহীত। পারস্যের প্রায় প্রতিটি মসজিদের স্তম্ভের গোড়াতে সংযোজিত মঞ্চ ছাত্রদের পাঠদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের বসার আসন হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[২৭] অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পশ্চিম ভারতীয় মসজিদ স্থাপত্যেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ আহমদাবাদের আহমদ শাহ মসজিদ (১৪১৪), পাটন আনহিলওয়াড়ে গুমাদা মসজিদ এবং শেখ যোদওয়ালীর মসজিদের নামোল্লেখ করা যেতে পারে।[২৮] সুতরাং মসজিদ-কেন্দ্রিক মক্তব পরিচালনার লক্ষ্যে মহাস্থানগড় মসজিদের ন্যায় অভ্যন্তরে শিক্ষকের বসার প্রয়োজনীয় উপকরণের সংযোজন না ঘটিয়ে, বরং আলোচ্য মসজিদ সংলগ্ন কোনো স্বতন্ত্র ইমারত নির্মাণের মাধ্যমে মক্তব চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। অনুরূপভাবে সুলতানি বাংলার মসজিদসমূহে দেশজ উপাদান হিসেবে যেমন চৌচালা খিলান ছাদের সংযোজন ঘটেছে তেমনি মোগল আমলে নির্মিত ফুলহার মসজিদ সংলগ্ন একটি ইমারতে ও সেনরা মসজিদ সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে দোচালা ধাঁচের ছাদ (রেখাচিত্র-১) দৃশ্যমান যার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল মোগল আমলে নির্মিত ফতেহ খানের সমাধিতে (১৬৬০)। এ ধরনের নির্মাণ রীতিকে অবিকল এদেশেরই বাঁশ-খড়ে নির্মিত দোচালা কুঁড়েঘরের ইটের নির্মিত অনুকরণ বললেও মোটেই অত্যুক্তি হবে না। তা ছাড়া সরকার ঘোড়াঘাটের বিদ্যমান ফুলহার মসজিদ সংলগ্ন একটি চৌচালা ইমারতের সন্ধান পাওয়া যায় যা বাংলার স্থাপত্যে এক অনন্য সংযোজন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে স্থপতিগণ মসজিদের শীর্ষভাগে ইসলামি স্থাপত্যের চিরাচরিত প্রথা গম্বুজের প্রাধান্য অব্যাহত রেখে গম্বুজের পাশাপাশি এ দেশীয় চৌচালা কুঁড়েঘরের ছাদের ন্যায় চৌচালা খিলান ছাদেরও ব্যবহার করতে থাকে (রেখাচিত্র-২) যা বাংলার স্থানীয় কুঁড়েঘরের চৌচালা ছাদেরই সার্থক রূপায়ণ।

আলোচ্য অঞ্চলের বিদ্যমান মসজিদসমূহের ভূমি-নকশা ও নির্মাণশৈলী বা অবকাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এগুলো সাধারণভাবে মোগল আমলে নির্মিত। মোগল-বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার (রেখাচিত্র-৩)। এটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের কোনো নিজস্ব রীতি নয় বরং এর উৎসস্থল আরো কোনো

দূরবর্তী সময়ে অন্যত্র অনুসন্ধান করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ৭৭২ সনে নির্মিত রাক্কা শহরের বিদ্যমান বাগদাদ তোরণে ব্যবহৃত চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান সম্ভবত মুসলিম স্থাপত্যের প্রথম জ্ঞাত নিদর্শন।[২৯] পরবর্তীকালে এ রীতিটি পারস্যের সেলযুক এবং মিশরের ফাতেমীয় স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সর্বজনীন উপাদানে পরিণত হয়। ভারত উপমাহদেশে তুগলক স্থাপত্যে সর্বপ্রথম চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় গিয়াস উদ্দীন তুগলকের সমাধিতে (১৩২৫)।[৩০] তবে এর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল দিল্লীর মোগল স্থাপত্যে। যেমন, দিল্লীর হুমায়ূনের সমাধি (১৫৫৬), আগ্রার ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধি (১৬২৮), লাহোরের ওয়াজির খান মসজিদ (১৬৩৪), বাদশাহী মসজিদ (১৬৭৩-৭৪) প্রভৃতি ইমারতে চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার বাংলার অপরাপর মোগল ইমারতসমূহেও দৃশ্যমান যা ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য তথা বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য রীতি থেকে অনুসৃত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্গ থেকে গম্বুজের বৃত্তাকার নিম্নভাগে পৌঁছানোর জন্য অবস্থান্তর পর্যায় কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘোড়াঘাট অঞ্চলের বিদ্যমান মসজিদসমূহের উক্ত পর্যায়ে পান্দানতিফ পদ্ধতির[৩১] ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (রেখাচিত্র-৪)। উল্লেখ্য যে, পান্দানতিফ বাইজান্টাইন শিল্পীদের উদ্ভাবিত একটি রীতি কৌশল। বাইজান্টাইন স্থাপত্যের গৌরব ইস্তাম্বুলের হাজিয়া সুফিয়া গীর্জায় (ষষ্ঠ শতক) ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মিত হতে দেখা যায়।[৩২] মুসলিম স্থাপত্যে অষ্টম শতকে নির্মিত কুসাইর আমরা প্রাসাদে সর্বপ্রথম গোলাকার ত্রিকোণ বিশিষ্ট পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।[৩৩] পরবর্তীসময়ে আব্বাসীয় স্থাপত্যের পাশাপাশি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যেও এ রীতির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ আহমদাবাদের দরিয়া খানের সমাধি (১৪৫৩) ও দিল্লীর শেরশাহের মসজিদের (১৫৪১) নামোল্লেখ করা যেতে পারে।[৩৪] অনুরূপভাবে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে নির্মিত বাংলার মসজিদ স্থাপত্যেও পান্দানতিফের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। উল্লেখ্য, বাংলার স্থাপত্যের পান্দানতিফ ছিল কিছুটা ভিন্নধর্মী। আনুভূমিক সমতল স্তর এবং কোণ বিশিষ্ট ধারা বা কোণা একটু বের করে এ দু-শ্রেণীতে ইটগুলো পালাক্রমে সজ্জিতকরণের মাধ্যমে এক নতুন কলা-কৌশলিক পদ্ধতিসহ কর্বেল পান্দানতিফের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ অনুভূমিক শ্রেণীবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার জন্যই হয়তোবা একে যথার্থভাবে 'বাঙ্গালী পান্দানতিফ' (Bengali pendentive) নামে অভিহিত করা যায়, ঠিক যেমনিভাবে উসমানীয় তুর্কি স্থাপত্যে উল্লম্ব পান্দানতিফকে 'তুর্কি পান্দানতিফ' (Turkish triangle) বলে সনাক্ত করা হয়।[৩৫] অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত পান্দানতিফ বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের এক জনুপ্রিয় অনুকরণ।

আলোচ্য মসজিদসমূহের আচ্ছাদন ব্যবস্থা হিসেবে নামাজগৃহের গম্বুজগুলো কখনো সরাসরি ছাদের ওপর আবার কখনো পিপার ওপর সংস্থাপিত। যেমন– সেনরা মসজিদের নামাজগৃহের গম্বুজসমূহ সুলতানি বাংলার মসজিদসমূহের গম্বুজগুলোর (বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, গৌড়ের বড়সোনা ও ছোটোসোনা মসজিদ, বারোবাজারের জোড়বাংলা ও গলাকাটা মসজিদসহ আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে) ন্যায় সরাসরি ছাদের ওপর উল্টানো বাটির আকারে নির্মিত। এ ধরনের গম্বুজ প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ স্তূপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, "Buddhist votive stones and the solid dome canopy over the standing Buddha figures in the *Ajanta Caves* no doubt betray earliest forms of domical construction"।[৩৬] আবার ঘোড়াঘাটের অপরাপর মসজিদমসূহের (যেমন– ফুলহার মসজিদ, কামদিয়া মসজিদ, মাস্তা মসজিদ, কুমেদপুর মসজিদ, হলিগনা ঈদগাহ মসজিদ প্রভৃতি) গম্বুজগুলো অষ্টভুজি পিপার উপর স্থাপিত। উল্লেখ্য, পিপার ওপর গম্বুজ নির্মাণের এ রীতিটি রোমান বৈশিষ্ট্য হলেও ষষ্ঠ শতক হতে উক্ত রীতি যে সিরীয় স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে তা বসরার গীর্জা হতে অনুধাবন করা যায়।[৩৭] মুসলিম স্থাপত্যে এর প্রাচীনতম উদাহরণ হলো জেরুজালেমের কুব্বাত-আস-সাখরা (৬৯১)।[৩৮] আলোচ্য রীতিটি পরবর্তীকালে পারসিক স্থাপত্যের পাশাপাশি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যেও অনুপ্রবেশ করে যার অন্যতম উদাহরণ হলো গিয়াস উদ্দীন তুগলকের সমাধি (১৩২৫)।[৩৯] অতঃপর এ নির্মাণশৈলীটি সৈয়দ ও লোদী স্থাপত্যে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় যা ভারতীয় মোগল স্থাপত্যে অত্যন্ত সুচারু রূপে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ দিল্লীর হুমায়ূনের সমাধি (১৫৬৯-৭০) ও আগ্রার তাজমহলের (১৬৩২-৫৩) কথা বলা যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে, এগুলোর মাধ্যমেই এ নির্মাণ ধারাটি মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করেছিল যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ওপরে উল্লিখিত বিদ্যমান মসজিদসমূহ।

ঘোড়াঘাট অঞ্চলের আলোচ্য মসজিদসমূহের অপর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গম্বুজ শীর্ষে পদ্ম ও কলস শিরোচূড়ার ব্যবহার। এটি বাংলার স্থাপত্যের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এটি ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য রীতি থেকে গৃহীত। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে সর্বপ্রথম আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদের (১১৯৯) গম্বুজের ওপর শীর্ষদণ্ডের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যা আলাই দরজাতে (১২৯৬-১৩১৬) পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৪০] হিন্দু স্থাপত্য থেকে অনুসৃত হওয়ায় অনেকেই এ ধরনের ফলককে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর প্রিয় ফুল নীল পদ্মের প্রতীক বলে মনে করেন।[৪১] আবার শীর্ষদণ্ড হিসেবে কলসের ব্যবহার ভারতীয় মন্দিরের চূড়াতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে কাঞ্চিপুরামের কৈলাসনাথ মন্দির (আনু. ৭০০) ও খাজুরাহের মন্দিরের (আনু. ১০০০) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শীর্ষদণ্ড হিসেবে হিন্দু

সম্প্রদায়ের মন্দির স্থাপত্যে কলসকে দেবতার পানীয় রসের পাত্রেরই প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪২] ভারত উপমহাদেশে মুসলিম ইমারতের গম্বুজের চূড়ায় এরূপ পদ্ম ও কলস সংবলিত শীর্ষদণ্ড ব্যাপক সংযোজন পরিদৃষ্ট হয়। তবে সৌন্দর্যের খাতিরে এ ধরনের প্রতীক সম্বলিত শীর্ষদণ্ড হিন্দু-মন্দির হতে অনুকৃত হলেও এতে হিন্দু ধর্মের প্রতীকী ব্যঞ্জনার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। কেবলমাত্র আলঙ্কারিক উপকরণ হিসেবে বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে এর সংযোজন ঘটেছিল বলে অনুমিত হয়।

এতদঞ্চলের মসজিদসমূহের অপরাপর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার অন্যতম। বলা হয়ে থাকে এ ধরনের কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার এ দেশের গ্রামাঞ্চলের বাঁশ, খড় বা ছনে নির্মিত কুঁড়েঘরের চারকোণে স্থাপিত চারটি বাঁশের খুঁটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। দোচালা কিংবা চৌচালা কুঁড়েঘরের অবকাঠামো মূলত চার কোণার চারটি খুঁটি চতুর্ভুজাকারে সংযুক্ত বাঁশের কাঠামোর ওপর দণ্ডায়মান থাকে। বাংলার কুঁড়েঘর নির্মাণের এ রীতিটি মুসলিম স্থাপত্যে চারকোণের চারটি বুরুজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে আব্বাসীয় আমলে নির্মিত বহু ইমারতে এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের তুগলক স্থাপত্যে ইমারত সুদৃঢ়করণে বুরুজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তথাপি ঐ সব বুরুজের চেয়ে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের চারকোণায় ব্যবহৃত বুরুজ ভিন্নতর ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য, ঘোড়াঘাট অঞ্চলের আলোচ্য মসজিদসমূহের কোণস্থিত বুরুজগুলো কখনো গোলাকার আবার কখনো অষ্টভুজাকারে বা বহুভুজাকারে বিভিন্ন স্তরে (বাঁশের গিটের ন্যায়) নির্মিত। এতদ্‌ঞ্চলের সেনরা মসজিদ, কুমেদপুর মসজিদ ও হলিগনা ঈদগাহ মসজিদে গোলাকার কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের গোলাকার কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার সম্ভবত তুগলক স্থাপত্যের জনপ্রিয় অনুকরণ বলেই মনে হয়, যদিও ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে এ ধরনের বুরুজ নির্মাণের ধারা সূচিত হয়েছিল মামলুক আমলে নির্মিত সুলতান ঘোরির সমাধিতে (১২৩১)।[৪৩] আবার ঘোড়াঘাট অঞ্চলের উপরোক্ত মোগল মসজিদসমূহে বন্ধনী দ্বারা (Band) বিভক্ত অষ্টভুজাকৃতির বুরুজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা উত্তর ভারতীয় মোগল মসজিদের অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজের ধারণা থেকে অনুসৃত বলেই মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ দিল্লী জামি মসজিদ ও লাহোরের বাদশাহী মসজিদের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। লক্ষণীয় যে, সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে কোণস্থিত বুরুজগুলোর উচ্চতা ছাদের ওপরে বর্ধিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ ঘোড়াঘাটের সুরা মসজিদসহ সুলতানি বাংলার অন্যান্য মসজিদের কথা বলা যেতে পারে। অথচ মোগল আমলে নির্মিত (প্রাথমিক যুগের কতিপয় মোগল মসজিদের উদাহরণ ব্যতীত) ইমারতসমূহের কোণস্থিত বুরুজগুলো ভূমিকে অতিক্রম করে আরো ওপরে উঠে কখনো স্তম্ভযুক্ত ছত্রি অথবা নি ি দ্র কিউপোলাতে সমাপ্ত হতে দেখা যায়। উসমানীয় তুর্কি স্থাপত্যেও

সুউচ্চ মিনার আকৃতির কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৪৩৫ সনে নির্মিত ইলদ্রিনের ইউসি সেরিফলি জামি মসজিদ ও ১৪৬৯-৭০ সনে নির্মিত সেলিমিয়া মসজিদের কথা বলা যেতে পারে।[৪৪] তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো তুর্কি স্থাপত্যের মিনার আকৃতির কোণস্থিত বুরুজের শিরোভাগ তীক্ষ্ণ পেন্সিল আকৃতির, অথচ ভারত উপমাহাদেশের মোগল ইমারতগুলোর কোণস্থিত বুরুজ সুউচ্চভাবে নির্মিত হলেও শিরোভাগ ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত এবং শীর্ষবিন্দু শীর্ষদণ্ডে (Finial) শোভিত। কোণস্থিত বুরুজের শিরোভাগে এ ধরনের ছত্রির সংযোজন বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে নতুন উদাহরণ নয় বরং এটি হিন্দু স্থাপত্য রীতি থেকে উৎসারিত।[৪৫] ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে সৈয়দ ও লোদী আমলে ব্যাপকভাবে এ ধরণের ছত্রির ব্যবহার দেখা যায় এবং এর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল ভারতীয় মোগল স্থাপত্যে। সুতরাং বলা যায় যে, মোগল বাংলার মসজিদসমূহের কোণস্থিত বুরুজের ওপর ছত্রির সংযোজন ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের যথার্থ অনুকরণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে উল্লেখ্য যে, বাংলার স্থাপত্যে কেবলমাত্র কোণস্থিত বুরুজের ওপর ছত্রির ব্যবহার দেখা যায় এবং এগুলো নিরেট পলেস্তারায় নির্মিত (soild plastered type)। কিন্তু ভারতীয় মোগল স্থাপত্যের ছত্রিসমূহ সাধারণত উন্মুক্ত প্যাভিলিয়ন আকৃতির (open pavilion type) যেগুলো কোণস্থিত বুরুজের পাশাপাশি মসজিদের ছাদের ওপরে সম্মুখ সারিতে দৃশ্যমান।

সুলতানি আমলে নির্মিত কোনো কোনো ইমারতে পলেস্তারার অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হলেও মূলত মোগল আমলেই পলেস্তারার অলঙ্করণ সার্বিকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং ঘোড়াঘাটের বিদ্যমান মোগল মসজিদসমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলিম স্থাপত্যে পলেস্তারার ব্যবহার এসেছে মূলত বাইজান্টাইন, সাসানীয় ও মধ্য এশীয় স্থাপত্য থেকে।[৪৬] অবশ্য এস. কে. সরস্বতী মনে করেন যে, গুপ্ত আমল থেকেই বাংলাতে পলেস্তারার প্রচলন ছিল।[৪৭] যাহোক, উমাইয়া প্রাসাদ কাসর আল-হাইর আল-গারবীর (৭২৪-২৭) পলেস্তারার কার্য মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলেই অনুমিত হয়।[৪৮] পরবর্তীসময়ে এ রীতি পারসিক স্থাপত্যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে যার অনন্য উদাহরণ হলো নিশাপুর জামি মসজিদ (অষ্টম শতক), কাযভিন জামি মসজিদ (নবম শতক), নায়িন জামি মসজিদ (দশম শতক), মসজিদ-ই-ভারামিন (১৩২২), ইয়াজদ জামি মসজিদ (চতুর্দশ শতক) ইত্যাদি।[৪৯] পারসিক স্থাপত্যের এ জনপ্রিয় রীতি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে তুগলক আমলে অনুসৃত হয়েছিল যাদের মাধ্যমে উক্ত রীতিটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যেও অনুপ্রবেশ করেছিল বলে ধারণা করা যায়। সুলতানি আমলে নির্মিত কোনো কোনো মসজিদ যেমন– গৌড়ের গুনমান্ত মসজিদ (১৪৮৪) ও জাহানিয়া মসজিদে (১৫১৫) পলেস্তারার অলঙ্করণ পরিদৃষ্ট হয়।[৫০] তবে এ যুগে প্রধানত পোড়ামাটির অলঙ্করণের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু মোগলবাংলার

স্থাপত্যে ইমারত গাত্রালঙ্কারে পোড়ামাটির ফলকের পরিবর্তে পলেস্তারার অলঙ্করণ সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অসংখ্য উদাহরণও পাওয়া যায়।

সরকার ঘোড়াঘাটের বিদ্যমান হলিগনা ঈদগাহ মসজিদে পলেস্তারার অলঙ্করণের পাশাপাশি পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার দৃশ্যমান যা সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এটি বাংলার একান্তই নিজস্ব সম্পদ। সুলতানি আমলে নির্মিত প্রায় প্রতিটি মসজিদেই এ ধরনের অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়। পোড়ামাটির অলঙ্করণ সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও মোগল আমলে নির্মিত কোনো কোনো মসজিদে যেমন– পাবনার চাটমোহর মসজিদ (১৫৮১), বগুড়ার খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২), টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ (১৬০৯), এগারসিন্ধুর সাদীর মসজিদ (১৬৫২), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল মসজিদ (১৬৫২), দিনাজপুরের নবগ্রাম মসজিদ (১৭৫৯-৮৮) প্রভৃতির গাত্রালঙ্কারে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।[৫১] ইমারতের গাত্রালঙ্কার হিসেবে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার এ দেশে বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি ও নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বিহারের পোড়ামাটির ফলক-অলঙ্করণের কথা বলা যায়।[৫২] কিন্তু এসব স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে মুখ্যত প্রতিমা, বিগ্রহ, বিভিন্ন জীবজন্তু এবং গৌণত গাছ-পালা, লতা-গুল্ম ও বস্তুনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ মুসলিম কারিগরগণ আলঙ্কারিক বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এনে জীবন্ত প্রতীক ও ভাস্কর্যের স্থলে বিমূর্ত প্রতীক যথা পেঁচানো লতা-পাতা, আরবী লিপি ও জ্যামিতিক নকশার প্রচলন করে। তা ছাড়া মুসলিম কারিগরদের হাতে এদেশের সনাতন পোড়ামাটির ফলক নকশার আড়ষ্টতা দূরীভূত হয়ে বিশেষ সূক্ষ্মতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের ধারাবাহিকতায় এতদঞ্চলের মসজিদসমূহের অপরাপর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো খাঁজ খিলান নকশার ব্যবহার। যেমন– ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথে, সাহেরদিঘি ও দরিয়াপুর মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবে, মহিতলা পুকুর মসজিদের প্রবেশপথে খাঁজ খিলান নকশা শোভা বর্ধন করে আছে। ইমারতের অলঙ্করণে ব্যবহৃত এ ধরনের নকশা বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে নতুন কোনো উদাহরণ নয়। বরং এটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের ত্রি-খাঁজ খিলান থেকে উদ্ভূত বলেই অনুমেয়।[৫৩] আবার ধারণা করা হয় যে, রোমান স্থাপত্যের শঙ্খ খোসা অলঙ্করণের শিরালো খাঁজ নকশা থেকে এর উৎপত্তি যা পারস্যের সাসানীয় আমলে নির্মিত *তাক-ই-কিসরা* প্রাসাদের প্রধান ফটকের খিলানের সম্মুখস্থ খাঁজ সারি থেকে অনুসৃত হয়েছে।[৫৪] এ ধরনের খাঁজ খিলান নকশা উত্তর আফ্রিকার কায়রাওয়ান মসজিদ থেকে আরম্ভ করে ফাতেমীয় আমলের অনেক ইমারতেই পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে খাঁজ খিলান নকশা আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদের

(১১৯৯) খিলান পর্দার কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পার্শ্বস্থ দুটি করে খিলানে প্রথম লক্ষ্য করা যায়।[৫৫] পরবর্তীকালে উক্ত রীতি মোগল স্থাপত্যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে যার অনন্য উদাহরণ হলো দিল্লীর লাল কেল্লায় অবস্থিত *দিওয়ান-ই-আম* ও *রংমহল।*

পরিশেষে উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এ ধারণাটি সুস্পষ্ট যে, এতদঞ্চলের বিদ্যমান সম-আকৃতি তিন গম্বুজ মসজিদের নির্মাণ শৈলীতে একদিকে যেমন মোগল নির্মাণ রীতির প্রতিফলন ঘটেছে অন্যদিকে তেমনি প্রাক-মোগল নির্মাণ ঐতিহ্যও অনুসৃত হয়েছে। বাংলার মোগল মসজিদ স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শিরোচূড়াযুক্ত কন্দাকৃতির গম্বুজ, পিপার ওপর গম্বুজ স্থাপন, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের প্রক্ষিপ্ততা ও সরু ক্ষুদ্র বুরুজ সংযোজন, ভূমি থেকে ওপরে উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানপথ, অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব, পলেস্তারার ব্যবহার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে গম্বুজ নির্মাণে পিপার অনুপস্থিতি, অবতলাকার মিহরাব, গোলাকার কোণস্থিত বুরুজ, পোড়ামাটির অলঙ্করণ প্রভৃতি সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য যে, বাংলার প্রাথমিক মোগল ইমারতসমূহে সুলতানি বাংলার স্থাপত্য ধারার যে প্রাধান্য দৃশ্যমান, ইসলাম খান (১৬৩৫-১৬৩৯) কর্তৃক বাংলায় স্থায়ীভাবে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা কিছুটা হ্রাস পায়, শুরু হয় উত্তর ভারতীয় মোগল স্থাপত্য ধারার অনুকরণ। ফলে এ যুগের স্থাপত্যকর্মে, বিশেষ করে মসজিদ স্থাপত্য ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর এ পরিবর্তন ভূমি-নকশা ও নির্মাণশৈলী বা অবকাঠামোর পাশাপাশি অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। বলা যায় যে, উন্নত মোগল রীতির মসজিদসমূহ উত্তর ভারতীয় মোগল রাজকীয় রীতিরই প্রাদেশিক সংস্করণ যা উল্লিখিত মোগল মসজিদসমূহের ভূমি-নকশা ও গঠনশৈলীর পর্যালোচনা থেকে অনুধাবন করা যায়।

মানচিত্র - ১

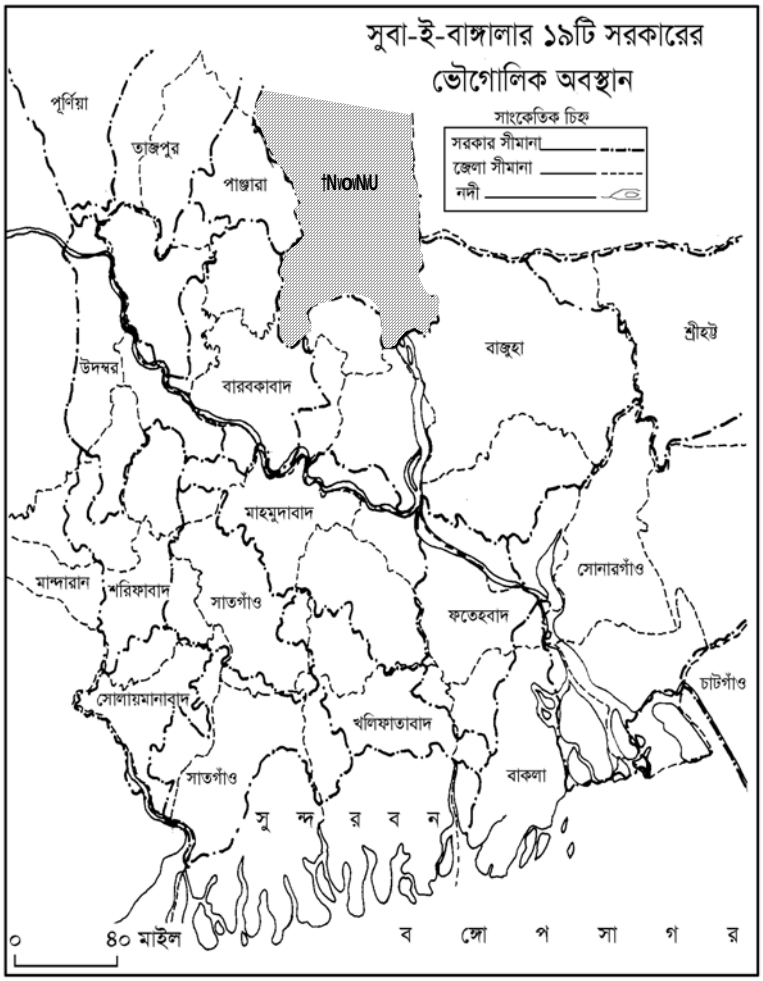

[উদ্ধৃত: জন বিম্‌স্, "Notes on Akbar Shuba with reference to the Ain-i-Akbari", *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal,* No. 4, London, 1896]

মানচিত্র - ২

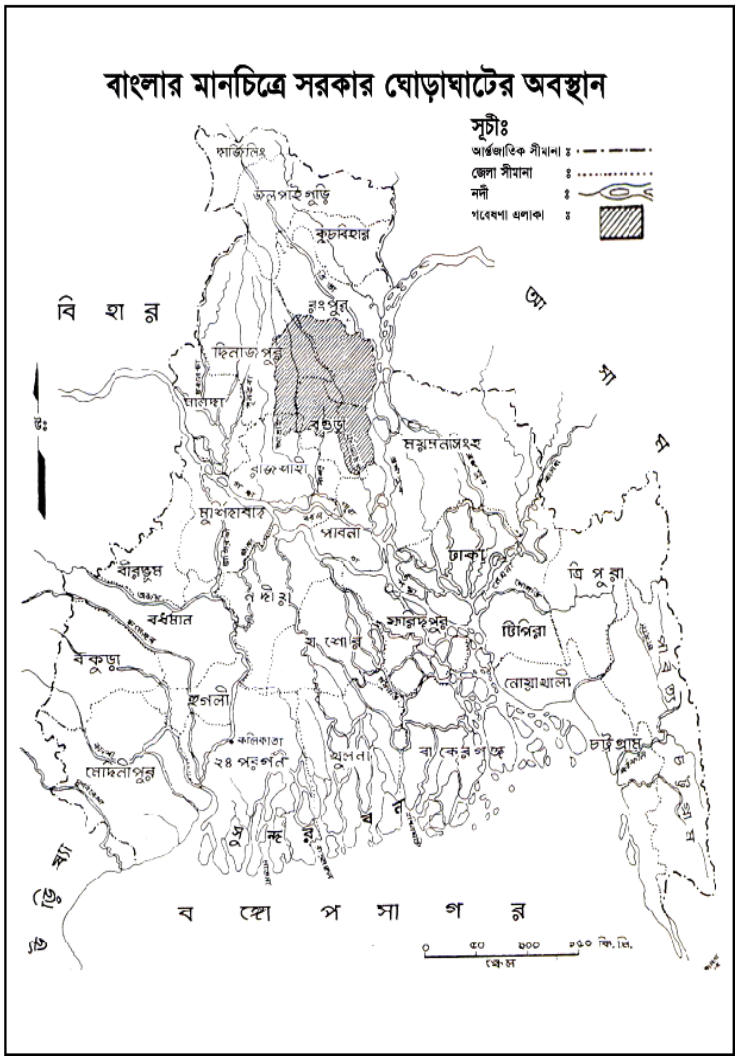

[উদ্ধৃত: জন মিচেল (সম্পা.), *The Islamic Heritage of Bengal,* Paris, Unesco, 1984]

মানচিত্র - ৩

সরকার ঘোড়াঘাটের অবস্থান (বাংলাদেশের মানচিত্রে)
বদরগঞ্জ
মিঠাপুকুর
সুন্দরগঞ্জ
ফুলবাড়ী
নবাবগঞ্জ
পীরগঞ্জ
বিরামপুর
হাকিমপুর
ঘোড়াঘাট
পলাশবাড়ী
গাইবান্ধা
সাদুল্লাপুর
পাচবিবি
জয়পুরহাট
কালাই
গোবিন্দগঞ্জ
সাঘাটা
ফুলছড়ি
ধামুইরহাট
ক্ষেতলাল
আক্কেলপুর
শিবগঞ্জ
সোনাতলা
বাদলগাছি
ভা র ত
ন ও গাঁ
সাংকেতিক চিহ্ন
গবেষনা এলাকা সীমানা
আন্তর্জাতিক সীমানা
জেলা সীমানা
উপজেলা সীমানা
ইউনিয়ন সীমানা
রাস্তা
রেলপথ
জেলা সদর দপ্তর
উপজেলা সদর দপ্তর
নদী
০ ৩ ৬ ৯ ১২ কিলোমিটার

ভূমি-নকশা

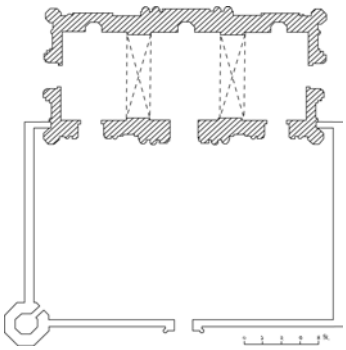

ভূমি-নকশা-১: ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ

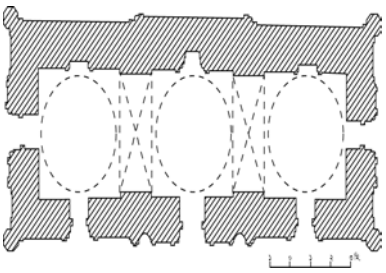

ভূমি-নকশা-২: ফুলহার মসজিদ

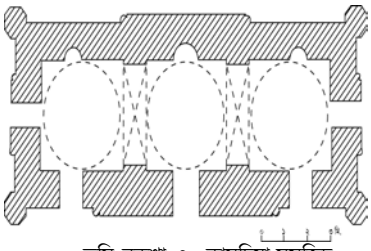

ভূমি-নকশা-৩: কামদিয়া মসজিদ

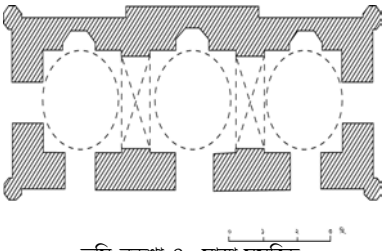

ভূমি-নকশা-৪: মাস্তা মসজিদ

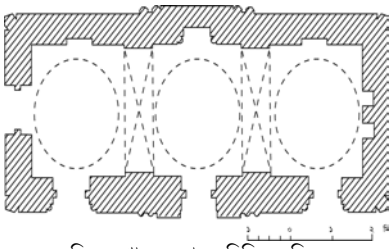

ভূমি-নকশা-৫: সাহেরদিঘি মসজিদ

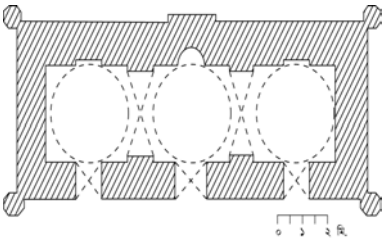

ভূমি-নকশা-৬: বারিয়া মসজিদ

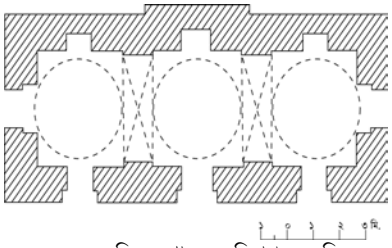

ভূমি-নকশা-৭: দরিয়াপুর মসজিদ

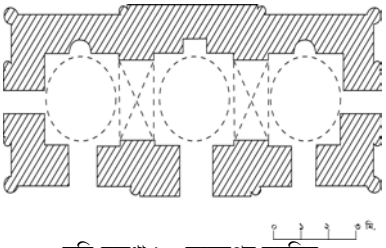

ভূমি-নকশা-৮: কুমেদপুর মসজিদ

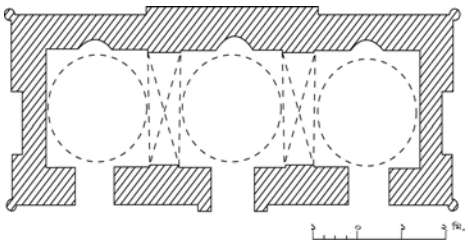

ভূমি-নকশা-৯: হলিগনা ঈদগাহ মসজিদ

আলোকচিত্র

আলোকচিত্র-১: ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-২: ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদের উন্মুক্ত অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ

আলোকচিত্র-৩: ফুলহার মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-৪: ফুলহার মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত দোচালা ইমারত

আলোকচিত্র-৫: ফুলহার মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত চৌচালা ইমারত

আলোকচিত্র-৬: কামদিয়া মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-৭: মাস্তা মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-৮: সাহেরদিঘি মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-৯: সাহেরদিঘি মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবে পলেস্তারায় রচিত ফুলেল নকশা

আলোকচিত্র-১০: বারিয়া মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-১১: দরিয়াপুর মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-১২: মহিতলা পুকুর মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

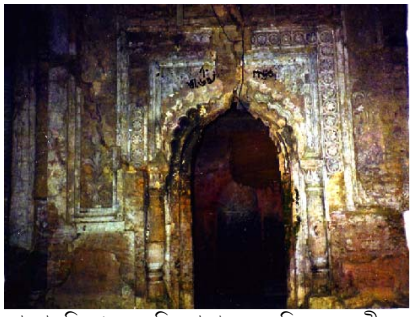

আলোকচিত্র-১৩: মহিতলা পুকুর মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের খাঁজ খিলান ও পলেস্তারায় রচিত ফুলেল নকসা

আলোকচিত্র-১৪: সেনরা মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-১৫: সেনরা মসজিদ সংলগ্ন দোচালা ইমারত

আলোকচিত্র-১৬: কুমেদপুর জামি মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-১৭: হলিগনা ঈদগাহ মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-১৮: হলিগনা ঈদগাহ মসজিদের পোড়ামাটির অলঙ্করণ

রেখাচিত্র

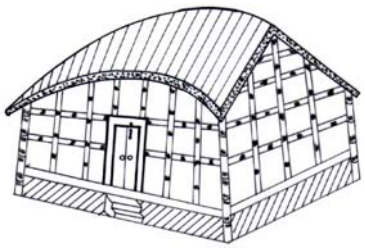

রেখাচিত্র-১: দোচালা ছাদ বিশিষ্ট কুঁড়েঘর

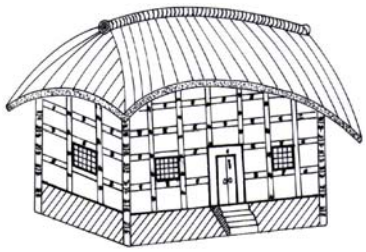

রেখাচিত্র-২: কুঁড়েঘরের চৌচালা ছাদ

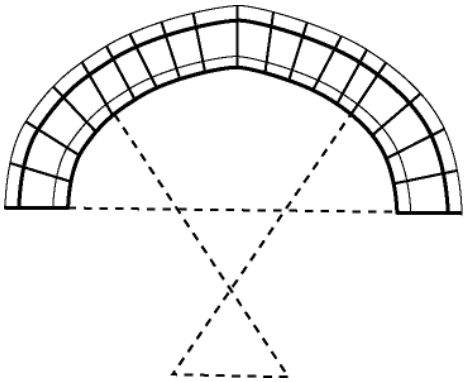

রেখাচিত্র-৩: চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান।

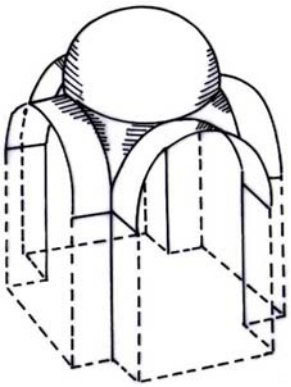

রেখাচিত্র-৪: গম্বুজ নির্মাণে পান্দাতিফের ব্যবহার

(বি. দ্র. প্রবন্ধের ভূমি-নকশা ও আলোকচিত্র এবং রেখাচিত্রসমূহ লেখকের নিজস্ব)

তথ্যনির্দেশ

১. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন* (বাংলা অনূদিত), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৩৫৫-৩৫৮; Abul Fazal, *Ain-i-Akbari* (Eng. Trans. by H. S. Jarret), Vol. II (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1891), pp. 142-155

২. মেহরাব আলী, "মোগল আমলে দিনাজপুর", *দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৬), পৃ. ৭৫-৭৬; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, দশম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬), পৃ. ৬৪২; *বাংলাপিডিয়া*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৫৩

৩. Abul Fazal, *Ain-i-Akbari, op. cit.*; গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন, পূর্বোক্ত*; Henry Blockmann, *Contributions to the Geography and History of Bengal* (Calcutta: Asiatic Society, 1968); John Bims, "Notes on Akbar Shuba with reference to the Ain-i-Akbari", *Journal of the Royal Asiatic Society,* London, 1896; Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire* (New Delhi: Oxford University Press 1982).

৪. এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২৩২

৫. M. A. Bari, *Mughal Mosques Types in Bangladesh : Origin and Development*, an unpublished Ph. D. Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1989, p. 155; এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), স্থাপত্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮২

৬. এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৮১; এ টি এম রফিকুল ইসলাম, *ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব*, অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ. ১১৬

৭. M. A. Bari, *Mughal Mosques, op. cit.*, pp. 161-64 & 164-65; এ টি এম রফিকুল ইসলাম, *ঘোড়াঘাট*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬-১৭

৮. মাস্তা মসজিদ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন- এ টি এম রফিকুল ইসলাম, *ঘোড়াঘাট*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮-১৯

৯. M. A. Bari, *Mughal Mosques, op. cit.*, pp. 161-164; Sultan Ahmad, "Two Unpublished Mughal Mosque in Rangpur District", *Bangladesh Lalitakala,* Vol. 2, 1984, p. 50

১০. দরিয়াপুর মসজিদের নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে দেখুন A. B. M. Husain, "Two Late Mughal Inscription", *Journal of the Varendra Research Museum,* Vol. 2, Rajshahi, 1973, pp. 71-72

১১. Sultan Ahmad, "Two Unpublished Mughal Mosque in Rangpur District", *op. cit*, p. 52

১২. এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮২

১৩. M. A. Bari, *Mughal Mosques, op. cit,* p. 129; এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬২

১৪. S. Grover, *The Architecture of India : Islamic (727-1707),* (New Delhi: Vikas Publishing House, 1981), pp. 145-47, Fig. 6.08 & 6.09; R. Nath, *History of Sultanate Architecture* (New Delhi: Abhinav Publications, 1978), pp. 108-11, pl. 137 & 143; M. H. Quraishi, *List of Ancient Monuments Protected under Act-7 of 1904 in the Province of Bihar and Orissa* (Calcutta, 1913), pp. 181-82; এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৬৮ ও ২৬৩

১৫. A. Godard, *The Art of Iran* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1965), p. 285; A. B. M. Husain, "Mosque Plan - An Outline History", *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. VI, Rajshahi University, 1982-83, p. 11; এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৮

১৬. R. E. M. Weheeler, *Five Thousand Years of Pakistan* (London: Royal India and Pakistan Society, 1950), p. 127; S. M. Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987), p. 29. উল্লেখ্য যে, মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

১৭. G. Michell (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal* (Paris: UNESCO, 1984), p. 13; A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), pl. 55

১৮. J. D. Haig, *Islamic Architecture* (New York, 1977), p. 288; মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৬), পৃ. ২৭।

১৯. R. Nath, *Sultanate Architecture, op. cit,* p. 17; P. Brown, *Indian Architecture* (Islamic Period), 1975, pl. 6, fig-1

২০. G. Michell (ed.), *Architecture of the Islamic World* (London: Thames & Hudson, 1978), p. 266; সুলতান আহমদ, *ভারতে মুসলিম স্থাপত্য*, ২০০৩, পৃ. ১৮৮-১৮৯, আলোকচিত্র- ৫৩

২১. A. H. Dani, *MAB, op. cit*, p. 20; এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০২

২২. এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯), পৃ. ২৭; M. A. Bari, *Mughal Mosques, op. cit.*, p. 59

২৩. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০-৩১

২৪. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১২

২৫. Sohrab Uddin Ahmad, "The Mosque at Kismat Maria - A Study on Late Mughal Architecture", *Journal of the Varendra Research Museum,* Vol. 6, Rajshahi, 1982, pp. 115-20

২৬. Sultan Ahmad, *Archaeological Survey in the Northern Districts of Bangladesh : Unprotected Sites and Monuments,* an unpublished Project Report, Rajshahi University, p. 69; A. K. M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra* (Rajshahi: M. Sajjadur Rahim, 1998), p. 303; এ. কে. এম. আজমাদ হোসেন, "মহাস্থানগড়ের একটি বিধস্ত জামি মসজিদ", *মাহে নাও,* ঢাকা, ১৩৭৩ বা.সা. পৃ. ৩১

২৭. A. U. Pope, *A Survey of Persian Art,* vol.-II (London: Oxford University Press, 1939), p. 956-57

২৮. Sultan Ahmad, *Archaeology of the Muslim Towns of Gujrat with Special Referance to their Monuments,* an unpublished Ph.D. Thesis, Boroda, India, 1982, p. 127; Sultan Ahmad, *The Muslim Monuments of Patan : North Gujrat,* Pertial Fulfilment Thesis for M. A. Degree, Boroda, India, 1980, pp. 53 & 58

২৯. এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

৩০. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১২৩

৩১. Pendentive is a concave spandrel leading from the angle of two walls to the base of a circular dome. It is one of the menas by which a circular dome is supported over a square or polygongal compartment, দেখুন: John Fleming & others, *The Penguin Dictionary of Architecture* (New York: Penguin Books, 1966), p. 168

৩২. *Encyclopaedia Britannica,* vol. 2 (London: William Benton Publisher, 1973), p. 320, fig. 11.

৩৩. এ. বি. এম. হোসেন, *আবর স্থাপত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৯৪

৩৪. S. M. Hasan, *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal*, 1979, p. 176

৩৫. এ. বি. এম. হোসেন "সুলতানী বাংলার স্থাপত্য শিল্প ঃ একটি পর্যলোচনা", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা,* ১৩৮৩, পৃ. ৩০; O. Aslanapa, *Turkish Art and Architecture* (London: Faber & Faber Ltd., 1971), p.189; D. Hill & O. Graber, *Islamic Architecture and its Decoration A. D. 800-1500* (London: Faber & Faber Ltd., 1964), p. 16; A. Kuran, *The Mosque in Early Ottoman Architecture* (Chicago: University Press, 1968), pp. 30-31

৩৬. এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৯৭; S. M. Hasan, *Mosque Architecture, op. cit*, p. 174

৩৭. এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৪

৩৮. *তদেব*, পৃ. ৪১

৩৯. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২।

৪০. R. Nath, *Sultanate Architecture, op. cit.*, p. 48

৪১. E. B. Havell, *Inidan Architecture through Ages* (Delhi: Asian Publishing Service, 1978), p. 8; মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩, পাদটীকা-৬ক

৪২. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০, পাদটীকা-৭৯

৪৩. তুগলক স্থাপত্যের বুরুজগুলো ছিল গোলাকৃতির ও অবনমন সম্বলিত, দেখুন- S. Grover, *The Architecture of India, op. cit*, p. 43, fig. 2.18. আর খান জাহান আলী রীতির বুরুজগুলো গোলাকার হলেও অবনমন ছিল না এবং এগুলো ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত হতে দেখা যায়, দেখুন- A. H. Dani, *MAB, op. cit,* p. 76, fig- 59 & 63. আবার ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে মামলুক আমলে নির্মিত সুলতান ঘোরির সমাধিতে (১২৩১) সর্বপ্রথম গোলাকৃতি কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, দেখুন: মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪

৪৪. G. Goodwin, *A History of Ottoman Architecture* (London: Thames & Hudson, 1971), p. 101, pl. 96 & 3

৪৫. R. E. M. Weheeler, *Five Thousand Years of Pakistan, op. cit*, p. 72

৪৬. M. Hafizullah Khan, *Terracotta ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988), p. 25

৪৭. *Ibid*, p. 30

৪৮. K. A. C. Creswell, *Early Muslim Architecture,* Vol. I, part- II (Oxford: Clarendon Press, 1968), p. 511

৪৯. A. U. Pope, *Persian Architecture* (New York: George Braziller, 1965), pp. 147-65

৫০. M. Hafizullah Khan, *op. cit,* p. 30

৫১. G. Michell (ed.), *op. cit*, p. 40; A. H. Dani, "A Mughal Mosque at Egarosindhur", *Varendra Research Society Museum,* No. 8, Rajshahi, 1950, pp. 34-35; M. A. Bari, *Mughal Mosques, op. cit*, pp. 133, 123 & 244

৫২. Terracotta art is very old in Bengal and appears to have been begun from the 4th century B. C., দেখুন- M. A. Bari, *Khalifatabad : A Study of Its History and Monuments,* an unpublished M. Phil. Thesis, Rajshahi University, 1980, p. 78, fn-2; নাজিমুদ্দীন আহমেদ, *মহাস্থান ময়নামতি* পাহাড়পুর (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ১৯৯৭), পৃ. ৪৪, ৭৬ ও ১১০

৫৩. এম. আর. তরফদার, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অলংকরণ প্রসঙ্গ", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা,* ১ম-২য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৯৪, পৃ. ৮৫

৫৪. এ. বি. এম. হোসেন, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় অলংকরণ ঃ উৎস ও ক্রমবিকাশ", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৯৯১), পৃ. ২৫৫

৫৫. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ.২৮, আলোকচিত্র-১০